# রাজা রামকৃষ্ণ।

[ উপন্যাস। ]

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী
প্রণীত।

[ দ্বিতীয় সংস্করণ। ]

প্রকাশক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,
"পৃথিবীর ইতিহাস"-কার্য্যালয়,
হাওড়া।

মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

1949

কর্ম্মযোগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৪নং তেলকল ঘাট রোড, কর্ম্মযোগ প্রেস
হইতে
শ্রীযুগলকিশোর সিংহ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# ভূমিকা

[ প্রথম সংস্করণের। ]

"রাজা রামকৃষ্ণ" উপন্যাস প্রকাশিত হইল। প্রায় দুই মাসের মধ্যে এই উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ—একরূপ অসমসাহসিক কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই গ্রন্থ সাধারণের কিরূপ প্রীতিপদ হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়! ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে—"Fools rush in where a gels fear to tread," অর্থাৎ—জ্ঞানী ব্যক্তি যে পথে পদ-রে সঙ্কুচিত হন, নির্ব্বোধগণ দ্রুতপদে সেই পথে অগ্রসর । দুই মাসে এত বড় উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ—আমার ও সেইরূপ। সুতরাং এ গ্রন্থ উপন্যাসও নহে, ইতিহাসও ;—আমার নির্ব্বুদ্ধিতারই এক পরিচয়-চিহ্ন।

তবে একটা কথা ;—"রাণী ভবানী" উপন্যাস প্রণয়ন-কালে উপন্যাসের উপকরণ-সমূহ অনেকই আমি সংগ্রহ করিতে র্থ হইয়াছিলাম ; সুতরাং ক্ষিপ্রগতিতে এই উপন্যাস-রচনায় মায় তাদৃশ আয়াস-স্বীকার করিতে হয় নাই। আরও এক

কথা ;—যে সাধু মহাপুরুষের আখ্যায়িকা অবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাঁহার মাহাত্ম্য-গুণেও এ গ্রন্থ ক্ষিপ্রগতিতে সম্পন্ন হইয়াছে,—আমি বিশ্বাস করি। আমার অস্ফুট লেখনী আমার অপরিস্ফুট কল্পনা, আমার অসংবা... অক্ষমতা প্রভৃতির বিষয় আমি সম্পূর্ণরূপ অবগত আছি। তথাপি যে এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহসী হইয়াছি, তাহার কারণ,—আমার বিশ্বাস,—সাধকপ্রবর মহারাজ রামকৃষ্ণের নামের আকর্ষণেই এ গ্রন্থ সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

এত শীঘ্র এ গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার আর এক কারণ, শ্রীমান্ প্রমথনাথ সান্যালের উৎসাহ-সহায়তা। এই গ্রন্থ প্রণয়নে, ইহার শৃঙ্খলা-সাধনে, তাঁহার সাহায্য এই গ্রন্থের সহিত ওতঃপ্রোত বিজড়িত। এই গ্রন্থ রচনায় অনেক স্থানে তাঁহার ভাব, তাঁহার ভাষা, তাঁহার কল্পনা পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থের সহিত তাঁহার নাম চিরসম্বদ্ধ রহিল। ইতি—

হাওড়া<br>২৪শে আষাঢ়, ১৩১৭ সাল,<br>শুক্রবার।

নিবেদক,<br>শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

# ভূমিকা।
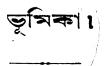
## [ দ্বিতীয় সংস্করণের। ]

"রাজা রামকৃষ্ণ" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটী নূতন পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণের আকার কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথম সংস্করণে কোনরূপ চিত্র বা দলিল-পত্র ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য বহু ব্যয়ে 'হাফ্‌টোন্‌' চিত্রগুলি প্রস্তুত করান হইল, এবং মহারাজ রামকৃষ্ণের ও রুদ্রনারায়ণ ( রুদ্রানন্দ ) ঠাকুরের স্বাক্ষর প্রভৃতি বহু চেষ্টায় সংগৃহীত হইল।

কয়েকখানি চিত্রের এবং দলিল-পত্রের সংগ্রহ-বিষয়ে মহারাণী ভবানীর গুরুবংশীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন মহাশয় এবং তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ-চন্দ্র ঠাকুর মহাশয় আমাদের যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অপরাপর চিত্রগুলি কল্পিত; কারণ, যে সময়ের ঘটনা, তখন 'ফটোগ্রাফের' বা আলোক-চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত ছিল না।

যাহা হউক, নানাপ্রকারে গ্রন্থের সৌষ্ঠব-বৃদ্ধির জন্য এই সংস্করণের প্রকাশে প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় পড়িয়া গেল। সুতরাং এই সংস্করণের মূল্যও কিছু বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

এখন, সাধারণে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইলেই আমাদের সকল ব্যয় ও পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়,
হাওড়া।
৪ঠা শ্রাবণ, সন ১৩১৮ সাল।

নিবেদক,
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

# চিত্রসূচী।

রাজসাহী প্রদেশ।

[ রাজা রামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। ]

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## প্রথম খণ্ড।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"যে পুরুষ-প্রবর যাবতীয় কাম্য বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহা-রহিত, অহঙ্কার-পরিশূন্য এবং মমতা-বিহীন হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই কৈবল্য-রূপ পরম ধনের অধিকারী হন।"

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### বন্ধন-মোচন।

"বালো যুবা চ বৃদ্ধশ্চ যঃ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি॥"

—ব্যাস-বাক্য।

"আহা! বেঁধ' না বেঁধ' না! ছেড়ে দেও—ছেড়ে দেও!"

"আমি পুষ্‌ব যে!"

"বন্ধনে বড় কষ্ট! বন্ধন মুক্ত ক'রে দেও! দেখ্‌ছ না—পাখী কাঁদ্‌ছে কত!"

"আমি একে যত্ন ক'র্‌ব—খাঁচায় রাখ্‌ব! ফড়িং ধ'রে এনে দেব—ছাতু খেতে দেব—কত ভালবাস্‌ব!"

"অবোধ বালক! পাখী অনন্ত-আকাশের উন্মুক্ত বায়ু-ক্রোড়ে বিচরণ করে; বন্ধনে তার কি কষ্ট—তুমি কি বুঝ্‌বে? ছেড়ে দেও—ছেড়ে দেও।"

"ছেড়ে দেব কেন?—আমি যে পাখীটিকে কিনেছি! কষ্ট দেব কেন?—আমি যে ওর জন্য সুন্দর পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়েছি! সেই পিঞ্জরে ওকে রাখ্‌ব, প্রত্যহ ক্ষীর-সর-ননী

খেতে দেব। কত যত্নে—কত আদরে লালন-পালন ক'র্‌ব! ওর কোনই কষ্ট হবে না।"

"পাখী তোমার যে যত্ন চায় না। তাই দেখ ঐ—পাখী পালাবার জন্য কত আকুলি-ব্যাকুলি ক'র্‌ছে! তুমি একবার ওকে ছেড়ে দেও দেখি! ও এখনি উধাও হ'য়ে উড়ে যাবে!"

"তুই এক দিন আমার যত্ন পেলেই পাখী পোষ মান্‌বে!"

এই বলিয়া, বালক, অনন্যমনা হইয়া, পাখীর পায়ে দড়ি বাঁধিতে লাগিল।

বালকের নাম—গোপাল। গোপাল কেবল নামে গোপাল নহে;—রূপ-মাধুর্য্যেও যেন সাক্ষাৎ গোপাল-মূর্ত্তি! সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আকর্ণ-বিস্তৃত বিস্ফারিত নয়ন-দ্বয়—সেই সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। গোপালের পরিধানে পট্ট-বস্ত্র; গোপাল মালকোঁচা বাঁধিয়া পরিয়া আছে। গোপালের পায়ে মল, হাতে বালা, কোমরে গোট। মস্তকে ঘন-কৃষ্ণ কেশরাশি বেণীবদ্ধ হইয়া দোদুল্যমান। গোপালের অধরোষ্ঠ, হস্তপদতল—অলক্তক-রঞ্জিত। ললাট, বক্ষ,—সকলই সুলক্ষণাক্রান্ত।

এই সুলক্ষণাক্রান্ত বালক কেন পাখীটিকে ধরিয়া কষ্ট দিতেছে!

একজন সন্ন্যাসী সেই পথে যাইতেছিলেন। বালক এক-মনে পাখীটিকে বাঁধিতেছে দেখিয়া, তিনি একটু বিচলিত হইলেন। তাই তিনি বালককে বুঝাইয়া পাখীটিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

গোপাল সন্ন্যাসীর অনুরোধ শুনিল না। সে এক মনে

পাখীটিকে বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। পাখী ছটফট করিয়া চীৎকার করিতে লাগল।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন,—"তুমি আমার কথা শোন! পাখীটি ছেড়ে দেও। আহা! দেখ দেখি—পাখী কত ছটফট কর্‌ছে।"

পাখীটিকে বাঁধিতে যাইয়া, সন্ন্যাসীর কথায় গোপাল এক-এক বার অন্যমনস্ক হইতেছে; সুতরাং তাহার বন্ধন-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিতেছে। এবার তাই সে একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,— "কেন টিক্‌টিক্ কর্‌ছেন? খাঁচায় নিয়ে গিয়ে রাখ্‌লেই পাখী শান্ত হবে,—পাখীর ধড়ফড়ানি আর থাক্‌বে না।"

সন্ন্যাসী।—"তাও কি কখন সম্ভবপর! মনে কর দেখি,— তোমায় যদি কেহ এইরূপ-ভাবে বেঁধে নিয়ে যায়,—তোমার পিতামাতার কাছে আর আস্‌তে না দেয়,—খাঁচার মধ্যে পূরে রাখে,—তোমার তখন কি কষ্ট হয়? বন্ধনে পাখীরও সেই কষ্ট!— বেশী বই কম নয়। তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে, লোকালয়ে— মানুষের কাছে—মানুষের ঘর-বাড়ী-সংসারের ভিতরে— রাখ্‌লেও তোমার প্রাণটা কত ব্যাকুল হয়—ভাব দেখি! কিন্তু পাখীকে উন্মুক্ত আকাশ-রূপ তাহার বিচরণ-স্থান পরিত্যাগ ক'রে ক্ষুদ্র পিঞ্জরে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী মানুষের কাছে থাক্‌তে হ'বে। তার কষ্ট কত অধিক—অনুভব কর্‌তে পার কি?"

গোপাল একটু বিচলিত হইল; কিন্তু পাখীটিকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"ভাল—তোমার পাখীটি আমি বেঁধে দিচ্ছি। কিন্তু তোমায় আমি ধ'রে নিয়ে যাব। পিতা-

মাতা আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে আমাদের নিকট থাক্‌তে যদি তোমার কষ্ট-বোধ না হয়, এই পাখীটিকে আর তোমায় ছেড়ে দিতে ব'লব না।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গোপালকে ধরিয়া লইয়া যাইবার ভাব প্রকাশ করিলেন।

গোপাল কহিল,—"আপনার সঙ্গে আমি যা'ব কেন?"

সন্ন্যাসী।—"পাখীই বা তোমার সঙ্গে যাবে কেন?"

গোপাল।—"আমি কিনেছি:—সুন্দর খাঁচা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি! কত আদর ক'রে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াব!"

সন্ন্যাসী।—"আমিও তোমাকে আদর ক'র্‌ব—আমিও তোমাকে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াব। তবে তুমি আমার সঙ্গে যেতে স্বীকার কর্‌ছ না কেন!"

গোপাল।—"আমার নিজের দেশ, নিজের গ্রাম, নিজের পিতামাতা,—এ সব পরিত্যাগ ক'রে আমি কেমন ক'রে পরের সঙ্গে যেতে পারি? আমার এ স্বাধীনতা পরিত্যাগ ক'রে, আমি কেন পরের নিকট বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে যাব?"

সন্ন্যাসী।—"পাখীরও নিজের দেশ, নিজের পিতা-মাতা নিজের স্বাধীনতা আছে। সে সুখ পরিত্যাগ ক'রে, সেই বা কেমন ক'রে তোমার বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে যাবে? সে যে উন্মুক্ত-গগন-বিহারী বিহঙ্গম! তার স্বাভাবিক গতি তাকে আপনিই অনন্ত-গগন-পথে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যাবে! তুমি তাকে স্বর্ণ-পিঞ্জরে রেখেছ, কি লৌহ-পিঞ্জরে রেখেছ, সে একবারও তা ভেবে দেখ্‌বে না;—তোমার ক্ষীর-সর-নবনী খাদ্য-দ্রব্যের প্রলোভনেও সে কদাচ প্রলুব্ধ হবে না!

তুমি কি দেখ-নি—কত যত্ন, কত আদরের পরও, একবার পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত পেলে, বিহঙ্গম কেমন উধাও হ'য়ে উড়ে পালায়!"

গোপাল সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। সেই প্রশান্ত-গম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলের প্রতি যতই তাহার দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সে যেন ততই আত্মহারা হইয়া পড়িল। গোপালের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। এক এক বার তাহার মনে হইতে লাগিল,—"সত্যই তো! স্বাধীন গতি রোধ করিতে যাওয়া—বন্ধন করিতে চেষ্টা পাওয়া—পাখী কেন, সকল প্রাণীর পক্ষেই তো দারুণ কষ্টদায়ক! আমাকে যদি কেহ বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয় না কি?

চিন্তার স্রোতে ভাসমান হইয়া, গোপাল মনে মনে বলিল, —"না—না! আমি এমন কাজ আর করিব না। আমি পাখীটিকে ছাড়িয়া দিই!"

সন্ন্যাসী গোপালকে নীরব দেখিয়া পুনরপি কহিলেন,— "কি বালক! তবে কি তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

গোপাল উত্তর দিল,—"না—আমি যাব না! আমি পাখীর বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্ছি। বুঝেছি—বন্ধনই কষ্টের মূল! বুঝেছি—বন্ধন-মোচনই পরম সুখ! আমি অবশ্যই বন্ধন-মোচন ক'রব।"

এই বলিয়া গোপাল পাখীটিকে উড়াইয়া দিল। যেন মৃতপ্রাণে নব-জীবন লাভ করিয়া, পাখী গগন-মার্গে উড্ডীন হইল।

কি জানি কেন, সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন।

'বন্ধনই কষ্টের মূল! বন্ধন-মোচনই পরম সুখ!' বালক এ কি কথা বলিল!

আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে গোপালকে সম্বোধন করিয়া সন্ন্যাসী গম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—"বালক! তুমি সত্যই বলিয়াছ,—"বন্ধনই কষ্টের মূল, বন্ধন-মোচনই পরম সুখ।"

সন্ন্যাসী আবার কহিলেন,—"দেখ—দেখ, বন্ধন-মোচনে পাখীর কত আনন্দ। যত যত্নই কর না কেন, পিঞ্জরে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে কি ওর এত আনন্দ হ'ত! ওকে পুষ্‌লে—তুমিই যে আনন্দ লাভ ক'র্‌তে পার্‌তে, তাও আমার মনে হয় না। তাতে কত বাধা-বিঘ্ন ছিল;—কত বিপদ-আপদ ঘট্‌তে পার্‌ত! হয় তো পাখীটিকে কোন্ দিন কিসে মেরে ফেল্‌ত;—হয় তো দিনে দিনে ক্ষয় হ'য়ে পাখী কোন্ দিন আপনা-আপনিই ম'রে যেত; তাতে তোমার মনে কত কষ্ট হ'ত, ভাব দেখি!

গোপাল উত্তর দিল,—"পিঞ্জরে না রাখ্‌লে তো আর পাখী পোষা হয় না! আমার যে পাখী পুষ্‌তে বড় সাধ ছিল!"

সন্ন্যাসী।—"পিঞ্জরে না রাখ্‌লে কি আর পোষা হয় না! মনে কর না কেন,—ঐ যে বৃক্ষের উপরে, ঐ যে আকাশের গায়ে, অগণিত বিহঙ্গম বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, ঐগুলি সবই তোমার পোষা পাখী! তুমি খাঁচায় পূরে রেখে একটি পাখীকে আপনার ব'লে মনে কর্‌ছ; আর তাতেই তোমার আনন্দ হ'চ্ছে! কিন্তু ঐ পাখীগুলিকে আপনার ব'লে মনে ক'র্‌লে, তোমার কত পাখী হয়, আর তাতে কত আনন্দ হয়—ভাব দেখি! তুমি ভাবনা কেন,—অনন্ত-গগন-বিহারী বিহঙ্গমগুলি সকলই তোমার! সামান্য লৌহ-পিঞ্জরে একটী পাখীকে আবদ্ধ করে

সন্ন্যাসী ও গোপাল।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

রেখে কতটুকু আনন্দ! কিন্তু ঐ অনন্ত উন্মুক্ত আকাশের অসংখ্য পাখীকে আপনার ব'লে মনে করায় যে আনন্দ, সে আনন্দের কি শেষ আছে?"

গোপাল পলকহীন-নেত্রে সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী আরও বলিলেন,—"বন্ধন! বন্ধনে পাখীটীরে আবদ্ধ ক'রে, তুমিও যে অধিকতর বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে!—সে কথা কি একবারও ভেবে দেখেছ? পাখীটিরে সময়ে আহার দিতে হ'ত;—সর্ব্বদা সাবধানে রাখ্‌তে হ'ত;—এইরূপ কত বন্ধনেই তোমাকে আবদ্ধ হ'তে হ'ত! তুমিই ব'লেছ,—'বন্ধনই কষ্টের মূল, বন্ধন-মোচনই পরম সুখ!' তবে কেন আপনার বন্ধন আপনি দৃঢ় ক'র্‌তে যাচ্ছিলে!"

গোপালের হৃদয়-তন্ত্রী সেই স্বরে বাজিয়া উঠিল। গোপালের হৃদয়ে হৃদয়ে সেই মন্ত্র প্রবিষ্ট হইল। গোপাল মনে মনে বলিল, —"বন্ধনই কষ্টের মূল;—বন্ধন-মোচনই পরম সুখ! আমি বন্ধন-মোচনেরই চেষ্টা করিব।"

*

* *

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### পরিচয়।

"No sceptre greets me—no vain shadow this."

—Wordsworth.

সে প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইল। রাজসাহীর অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রামে গোপালের সহিত সন্ন্যাসীর এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতেছিল।

গ্রামের নাম—আটগ্রাম। কিংবদন্তী এইরূপ—ঐ গ্রাম পূর্ব্বে গোপালপুর নামে পরিচিত ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, গ্রামখানি তখন কোন্ নামে অভিহিত হইত, পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ বলেন,—গোপালের বয়ঃক্রম যখন নবম বর্ষ উত্তীর্ণ প্রায়, ঐ গ্রাম সেই সময়ে 'আটগ্রাম' নাম প্রাপ্ত হয়; কেহ আবার বলেন,—'না—না, তা নয়, আবহমান-কাল হইতেই গ্রামখানি আটগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ।' যাহা হউক, গ্রামখানি যে নামেই তখন পরিচিত থাকুক না কেন, আমরা কিন্তু আটগ্রাম বলিয়াই উহাকে অভিহিত করিলাম।

এখন যেখানে নাটোর মহকুমা, পূর্ব্বে যেখানে অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর রাজধানী ছিল, তাহার প্রায় বার ক্রোশ উত্তরে, একটী বিস্তৃত বিলের ধারে আটগ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রাম—আমরুল পরগণার অন্তর্গত। আটগ্রাম—মহারাণী ভবানীর

জমদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহারাণী, হরিদেব রায়কে সেই সম্পত্তি পুরষ্কার-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। সে অবশ্য পরবর্ত্তি-কালের ঘটনা; সে পরিচয় যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

জমীদারী মহারাণীর হইলেও, হরিদেব রায়—আটগ্রামের এক জন গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন। যে বংশ নাটোর-রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন, হরিদেব রায় সেই বংশের অন্যতম বংশধর। নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের পিতা কামদেব রায় এবং হরিদেব রায়ের প্রপিতামহ অভিরাম রায়, উভয়ে সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। ঐ বংশের আদি পুরুষ মথুরানাথের তিন পুত্র—রতিরাম, কামদেব এবং অভিরাম; রতিরাম জ্যেষ্ঠ, কামদেব মধ্যম, অভিরাম কনিষ্ঠ। কামদেবের সন্তানগণ সৌভাগ্যক্রমে নাটোর রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন।

অভিরামের দুই বিবাহ;—তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ত্তজাত সন্তানেরা মাধনগরে বসতি করিয়া 'মাধনগরের রায়' আখ্যা প্রাপ্ত হন; আর তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ত্তজাত সন্তানেরা আটগ্রামে বসতি করেন। অভিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামনারায়ণ হইতে মাধনগরের রায়-বংশের এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মহাদেব রায় হইতে আটগ্রামের রায়-বংশের উৎপত্তি।

হরিদেব—মহাদেবের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময় হইতে আটগ্রাম রায়বংশের জমীদারী মধ্যে পরিগণিত হয়। তিনি আটগ্রামের বহু উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র। আমাদের এই প্রসঙ্গোক্ত গোপাল—তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। গোপালের ন্যায় রূপ-সম্পন্ন বলিয়াই, কনিষ্ঠ পুত্রকে তিনি গোপাল বলিয়া আদর

করিতেন। সেইজন্য সকলেই তাহাকে গোপাল বলিয়া সম্বোধন করিত। আমরাও তাই বালককে গোপাল বলিয়া পরিচিত করিলাম।

হরিদেব রায়ের বসত-বাটীর পশ্চিমাংশে একটা বৃহৎ বাগান ছিল। বাগান—আম, জাম, নারিকেল, গুবাক প্রভৃতি নানা বৃক্ষে পরিপূর্ণ। যখনই যিনি সেই বাগানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তখনই তিনি দেখিতে পাইতেন, কোন-না-কোনও বৃক্ষে কোন-না-কোনও রূপ ফল ফলিয়া আছে। বাগানের উত্তর পার্শ্বে—সড়ক। সড়কের উত্তরে বিল।

বিলের ধারে, সড়কের উপর, আম্রবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া, গোপাল পাখীর পায়ে দড়ি বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। একজন বেদিয়া সেইদিন প্রাতঃকালে পাখী বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। সেই বেদিয়ার নিকট হইতে গোপাল এবং রাখাল দুই জনে দুইটী পাখী ক্রয় করিয়াছিল।

রাখাল—গোপালের খেলার সাথী। উভয়ের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব। গোপাল পাখী কিনিল দেখিয়া, রাখালও পাখী কিনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। গোপাল তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে পাখীর মূল্য আনিয়া দিয়া, পাখীটিকে গ্রহণ করিবামাত্র, রাখাল বেদিয়াকে আপন বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যায়।

গোপালের হাতে পখীটি সমর্পণ করিয়া বেদিয়া চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই সন্ন্যাসী আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হন।

সন্ন্যাসীর নাম—শ্রীজী। শ্রীজী—অনুপম শ্রী-সম্পন্ন। যেমন গঠন, তেমনই রং। যদি তিনি সন্ন্যাসী-বেশে উপস্থিত

না হইতেন, তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার বিস্তৃত ললাট, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল। আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন-প্রান্তে ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূ-যুগল—সেই মুখমণ্ডলের কি অপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদন করিয়াছে! তাঁহার চম্পক-বিনিন্দিত গৌরবর্ণে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রকে—সে শোভা আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-লেপনে—দেহজ্যোতিঃ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রতীত হইতেছে। পাটলবর্ণ জটারাশি কুণ্ডলাকারে বিন্যস্ত হইয়া মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই প্রশান্ত-মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর মুখে যেন চির-আনন্দ বিরাজমান।

সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক বসন। এক হস্তে কমণ্ডলু, অপর হস্তে ত্রিশূল। সন্ন্যাসী যুবাপুরুষ।

এ কন্দর্পকান্তি যুবাপুরুষ কেন সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিলেন?—সন্ন্যাসীকে দেখিলে, দর্শকের মনে স্বতঃই সেই চিন্তার উন্মেষ হয়।

এই সন্ন্যাসী আর কখনও আটগ্রামে আসিয়াছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে অবশ্য মতবিরোধ আছে। প্রাচীনেরা,—যাঁহারা এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন—সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে বলা-বলি করিতে লাগিলেন,—"ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একজন সন্ন্যাসী একবার আটগ্রামে আসিয়াছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর সহিত এই সন্ন্যাসীর কি যেন এক অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আছে।" তাঁহাদের অনেকেরই মনে সংশয় হইয়াছিল,—'ইনিই কি তবে তিনি? কিন্তু ত্রিশ বৎসরেও চেহারার তো কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই?' যাহা হউক, ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের কম বয়স্ক কোনও

ব্যক্তিই সে বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারে না। তাহারা কখনও এ সন্ন্যাসীকে দেখে নাই।

দেখা দূরে থাকুক, গোপাল কখনও এ সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত শুনে নাই! তবে কেন তাহার মনে হইতে লাগিল,—"ইনি কে? আমি কি পূর্ব্বে ইহাঁকে কখনও দেখিয়াছি?"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে, বৃক্ষমূলে ছায়াতলে বসিয়া, গোপাল একমনে সেই ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িল।

গোপাল বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় রাখাল ফিরিয়া আসিল। বেদিয়ার নিকট হইতে পাখী কিনিয়া, পাখীটিকে খাঁচায় পূরিয়া, গোপালের সন্ধানে প্রথমে সে গোপালের বাড়ী গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে গিয়া তাহাকে দেখিতে পায় নাই; তাই সে গোপালকে খুঁজিতে বিলের ধারে সড়কের উপর আসিয়াছে। রাখালের হাতে খাঁচা; খাঁচার মধ্যে পূরিয়া সে তাহার সেই কেনা পাখীটিও সঙ্গে আনিয়াছে।

রাখাল—গোপালের প্রতিবাসী। তাহার পিতার নাম—হলধর মৈত্র। মৈত্র মহাশয় গোপালের পিতার ন্যায় সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু তথাপি তিনি পুত্রের সাধ-পূরণে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। রাখাল তাঁহার একমাত্র পুত্র। সুতরাং রাখাল যখনই যাহা আব্‌দার করিত, তিনি তাহা পূরণ করিতে চেষ্টা পাইতেন।

গোপালের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন না হইলেও, রাখাল দেখিতে মন্দ ছিল না। গোপালের অপেক্ষা তাহার রং একটু কাল ছিল বটে; কিন্তু মৈত্র মহাশয় বেশ-ভূষায় তাহাকে গোপালের মত করিয়াই সাজাইয়া রাখিতেন। গোপালের ন্যায় রাখালেরও

তিনি অলঙ্কারাদি গড়াইয়া দিয়াছিলেন। গোপালের ন্যায় রাখালেরও পায়ে মল, হাতে বালা, কোমরে গোট ছিল। অধিকন্তু তিনি রাখালের গলায় একটী হাঁসুলি গড়াইয়া দিয়াছিলেন।

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল,—গোপালের হাতে পাখী নাই। গোপাল একমনে বসিয়া কি ভাবিতেছে! দেখিয়া, রাখাল আশ্চর্য্যান্বিত হইল; কৌতুহল-বশে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ ভাই! তোর পাখী কি হ'ল?"

গোপাল শুনিয়াও যেন শুনিতে পাইল না। রাখাল নিকটে গিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর পাখীটা কি উড়ে গেল? তাই তুই অমনি ক'রে ব'সে আছিস্? তুই বড় অসাবধান ভাই!"

গোপাল উত্তর দিল—"পাখী উড়ে যায়-নি, আমিই তাকে উড়িয়ে দিয়েছি!"

রাখালের যেন বিশ্বাস হইল না। রাখাল বলিল,—"তা গিয়েছে—গিয়েছে; তার আর কি হবে? মঙ্গলবার দিন আবার বেদে আস্‌বে; তুই আর একটা পাখী কিনে নিস্। সেদিন কিনে একেবারেই খাঁচায় পুরে রাখিস্।"

গোপাল।—"যদি কিনি, আমি সে পাখীকেও উড়িয়ে দেব। তোর পাখীটাকেও উড়িয়ে দেনা—ভাই?"

রাখাল চমকিয়া উঠিল; বলিল,—"সে কি বলিস্? আমি দাম দিয়ে পাখী কিনেছি, আমি ছেড়ে দেব কেন? আমি ওকে পুষ্‌ব যে!"

গোপাল—"ওর কত কষ্ট হ'চ্ছে, বুঝ্‌তে পারছিস্-নে?"

এই বলিয়া, আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, গোপাল কহিল,

—"ঐ দেখ্ দেখি—আকাশের পানে চেয়ে! ঐ পাখীগুলি কত আনন্দ ক'রে বেড়াচ্ছে। ওদের বেড়াবার স্থান অনন্ত আকাশ; এই ক্ষুদ্র পিঞ্জরে ওদের কি আবদ্ধ ক'রে রাখা উচিত! দে—দে-ভাই!—পাখীটিকে ছেড়ে দে!"

গোপাল রাখালের খাঁচার দিকে হাত বাড়াইল; বলিল,—"খাঁচার দরজা খুলে দিতে তোর কষ্ট বোধ হয়, আয়—আমি খুলে দিচ্ছি!"

গোপাল খাঁচার দরজা খুলিয়া দিতে গেল। রাখাল বেগতিক বুঝিয়া খাঁচা লইয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"তোর মাকে আমি ব'লে দিচ্ছি। দেখ্‌বি এখনি—কি হয়।"

রাখাল চলিয়া গেল। গোপাল আবার সেই সন্ন্যাসীর ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—সে যেন সন্ন্যাসীকে কত বার দেখিয়াছে! তাহার স্মরণ হইতে লাগিল,—পূর্ব্বে ঐ সন্ন্যাসীর সহিত তাহার যেন কত পরিচয় ছিল!

কিন্তু কোথায়—কত কাল পূর্ব্বে—স্মরণ করিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

* *
*

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## ভাবান্তর।

"I, with my fate contented, will plod on,
And hope for higher raptures, when life's day is done"

—*Wordsworth.*

অনেকক্ষণ হইল, গোপাল খেলা করিতে গিয়াছে। বেলা দেড় প্রহর অতীত হইতে চলিল; অথচ, গোপাল বাড়ী ফিরিল না! গোপালের মা বড়ই চিন্তান্বিতা হইলেন।

গোপালকে খুঁজিতে গিয়া রাখালও আর ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, তিনি বিশেষ একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। পদ্মমণিকে ডাকিয়া গোপালের অনুসন্ধান করিতে কহিলেন।

পদ্মমণি—রায়-পরিবারে দাসীবৃত্তি করে।

পদ্মমণি—আট গ্রামেরই এক সদ্গোপের কন্যা। আকৃতি—নাতি-স্থূল, নাতি-দীর্ঘ; বর্ণ—ঘনকৃষ্ণ; দাঁত প্রায়ই পড়িয়া গিয়াছে; চুলগুলি কতক পাকিয়াছে, কতক পাক ধরিয়াছে। বয়স—পঞ্চাশ উত্তীর্ণপ্রায়। দেখিলে, বয়স আরও বেশী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পদ্মমণি তত বয়সের কথা স্বীকার করে না। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কত কথাই বলে! বলে,—"আমার আর কিসের বয়েস? অদেষ্ট মন্দ, তাই আমায় এ বয়সে দাসীবৃত্তি কর্‌তে হ'চ্ছে। নইলে তাঁর কি এখন ম'রবার সময় হয়েছিল?"

পাঁচ বৎসর হইল, পদ্মমণির স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু পদ্মমণি মনে করে—'সে যেন বাল-বিধবা, সে অতি নিষ্ঠাবতী, তার মত সাধ্বী-সতী—বামুনের ঘরে মেলাও সুকঠিন। কঠোরতা-পালনে ব্রাহ্মণ-বিধবাও তাহার সমকক্ষ নহে।'

যতটা মনে করে, ততটা না হউক, পদ্মমণি অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মণ-বিধবারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে। বার-ব্রত পালন, পূজা-উপবাস প্রভৃতিতে তাহার উৎকট আগ্রহ। তাহাতে সময়ে সময়ে সে মনিবের আদেশ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়া বসে। কিন্তু তাহার নানা গুণের কথা স্মরণ করিয়া, রায়-পরিবারের কেহই পদ্মমণির প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হন না। পদ্মমণি কত সময় মনিবের মুখের উপর উত্তর দেয়, কত সময় কত কাজ 'পারিব না' বলিয়া অগ্রাহ্য করে; তথাপি তাহার প্রতি মনিব বিরূপ নহেন। পদ্মমণির একটী গুণ—মিষ্ট মুখে বলিলে পদ্মমণি বাঘের মুখে যাইতে পারে। কিন্তু মুখ বাঁকাইয়া তাহাকে কেহ যদি সন্দেশ খাইতে বলেন, পদ্মমণি তাহা স্পর্শও করে না।

গোপালের মা বলিলেন,—"যা না, পদ্ম! একবার দেখে আয় না—গোপাল আমার কোথায় গেল?"

পদ্মমণি প্রথম বার যেন শুনিতেই পাইল না! দ্বিতীয় বারে উত্তর দিল,—"কোথায় আর যাবে বাছা! পাড়ার মধ্যেই খেলা ক'র্‌ছে; এখনই ফিরে আস্‌বে।"

এই বলিয়া উত্তর দিয়া পদ্মমণি গোয়াল-ঘরে প্রবেশ করিল।

গোপালের মা একবারের অধিক দুইবার প্রায়ই কাহাকেও কোনও কথা বলেন না। একবারও যাহা বলেন, তাহাও অতি মিষ্ট

স্বরে। তাঁহার নাম—শান্তি। তিনি যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি; তাঁহার কথাবার্ত্তাও শান্তি-পূর্ণ। আজ যে তিনি দুই বার পদ্মমণিকে অনুরোধ করিলেন, তাহার কারণ—গোপালের সম্বন্ধে মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল। কিন্তু দুই বার বলায়ও পদ্মমণি যখন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখন তিনি কুমুদিনী দেব্যার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই কুমুদিনী দেব্যা স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কুমুদিনী দেব্যা—হরিদেব রায়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। খাজুরা গ্রামে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পতির মৃত্যুর পর, তিনি এখন ভ্রাতার সংসারে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই এখন সে সংসারের কর্ত্রী-স্বরূপিণী।

কুমুদিনীকে স্নান করিয়া ফিরিতে দেখিয়া, গোপালের মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর-ঝি! গোপালকে রাস্তায় দেখ্‌লে কি? গোপাল যে অনেকক্ষণ বাড়ী আসে-নি।"

কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেই গিয়েছে, এখনও ফেরে-নি? তা যাক্ না—পদ্ম গিয়ে একবার খুঁজে নিয়ে আসুক না!"

গোপালের মা।—"আমিও তাই বল্‌ছিলাম।"

গোয়াল-ঘর হইতে একটা ঝুড়ি হাতে করিয়া পদ্মমণি বাহিরে আসিল। সে গোয়াল-ঘরে ছাই ছড়াইয়া দিতে গিয়াছিল।

কুমুদিনী পদ্মমণিকে বলিলেন,—"যা না, পদ্ম! দেখেই আয় না একবার!"

পদ্মমণি উত্তর দিল,—"তোমাদের বাছা, সদাই হারাই

হারাই! গোপাল খেলা ক'র্‌তে গিয়েছে, এখনই বাড়ী আস্‌বে। তার জন্যে আর এত ভাবনা কেন? আমি কাজ-কর্ম্ম আগে সেরে নিই। তখনও না আসে; তার পর গিয়ে ডেকে নিয়ে আস্‌ব।"

বলিতে বলিতে অকস্মাৎ গোপাল আসিয়া গৃহে উপস্থিত হইল। সঙ্গে গোপালের পিতা হরিদেব রায়। তিনি গোপালের হাত ধরিয়া গোপালকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরিদেব রায়ের হস্তধারণ করিয়া গোপালকে বাড়ী আসিতে দেখিয়া, পদ্মমণি টিট্‌কারী দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল,—"গোপাল—গোপাল—গোপাল! ঐ গোপাল এয়েছে। তোমাদের যেমন বাছা সদাই হারাই হারাই! ঐ দেখ! বাবার সঙ্গে গোপাল আস্‌ছে।"

তিন দিন হইল, হরিদেব রায় চৌগ্রামের চৌধুরী বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। গোপালের অগ্রজ দুই জন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। তাহাদের নাম—ভবানীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ। হরিদেব রায় ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ভবানী-প্রসাদ ও রামপ্রসাদ ফিরিয়া আসিল না। কুমুদিনী দেব্যা তাই কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁরে হরি! ভবানী আর রাম এল না কেন?"

হরিদেব।—"তারা সেখান থেকে মামার বাড়ী গেল। তাদেরও আগ্রহ, চৌধুরী মহাশয়ও ছাড়লেন না। আমাকেও বড়ই অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কার্য্যের জন্য আমার যাওয়া হ'ল না। গোপালকে সঙ্গে ক'রে কাল আমার নাটোর যাবার প্রয়োজন আছে।"

গোপালকে সঙ্গে লইয়া নাটোর যাওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া, শান্তিদেবীর প্রাণে যেন কি এক দুর্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমুদিনী দেব্যার সম্মুখে তিনি স্বামীর সহিত কথা কহিতেন না; সেকালে সেরূপ প্রথাও ছিল না; সুতরাং গোপালকে সঙ্গে করিয়া হঠাৎ নাটোর যাইবার কারণ কি—তাহা জানিবার জন্য একান্ত আগ্রহ হইলেও প্রকাশ্যে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কুমুদিনী দেব্যাও তাড়াতাড়িতে সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলেন না।

হরিদেব রায় বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। ভৃত্য শ্যামচাঁদ তাঁহার ধূম-পানের আয়োজন করিতে লাগিল। পদ্মমণি পদ-প্রক্ষালনের জল দিয়া আসিল।

এই সময় রাখাল, আপনার পাখীটিকে বাড়ীতে রাখিয়া, গোপালের পাখীর কথা গোপালের মাতাকে বলিতে আসিয়াছিল। অবসর বুঝিয়া, শান্তিদেবীকে লক্ষ্য করিয়া, রাখাল বলিয়া উঠিল,—"শুনেছ কাকি-মা! পয়সা দিয়ে পাখী কিনে গোপাল সেই পাখীটিকে উড়িয়ে দিয়েছে!"

পদ্মমণি আগবাড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁরে গোপাল! সত্যি নাকি?"

কুমুদিনী দেব্যা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সকালে যে তোকে পয়সা দিয়েছিলেম, সে পয়সা কি ক'র্‌লি?"

গোপাল কোনই উত্তর দিল না; অধোবদনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। গোপালকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইয়া শান্তিদেবী কহিলেন,—"সত্যি নাকি গোপাল! পয়সাটা নষ্ট ক'রেছিস্?"

জননীর মুখপানে চাহিয়া গোপাল উত্তর করিল,—"মা—মা! আমি তো পয়সা নষ্ট করি-নি!"

রাখাল বাধা দিয়া কহিল,—"না—তুই পয়সা নষ্ট করিস্-নি? আমি দেখ্‌লাম—তুই পয়সা দিয়ে পাখী কিন্‌লি! তোর সে পাখী গেল কোথায়?"

পদ্মমণি বলিল,—"রাখাল কি তবে মিছে কথা ব'ল্‌ছে!"

এই বলিয়া পদ্মমণি পুনরায় গোয়াল-ঘরের দিকে গমন করিল। "ছেলে বড় বদ্ হ'য়েছে"—এই কথা বলিয়া কুমুদিনী দেব্যাও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

শান্তিদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা গোপাল! কি হ'য়েছিল, বল দেখি? পয়সা নষ্ট করিস্-নি—বল্‌ছিস্; আবার দেখ্‌ছি—তোর কাছে পয়সাও নেই! তবে সে পয়সা তুই কি ক'র্‌লি?"

গোপাল ধীরে ধীরে উত্তর দিল,—"পয়সা নষ্ট করি-নি—মা! পয়সায় একটী প্রাণীর বন্ধন মুক্ত করেছি!"

জননী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না! 'একটী প্রাণীর বন্ধন মুক্ত ক'রেছি,—গোপাল এ কি বলে?' জননী কহিলেন,—"বুঝেছি, পাখীটা তোর হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছে।"

গোপাল।—"না—মা! পাখী তো পালিয়ে যায়-নি? আমিই পাখীটাকে উড়িয়ে দিয়েছি। পাখী ব্যাধের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল; আমি তাকে মুক্ত ক'রেছি!"

শান্তি।—"তুই এ কি ব'ল্‌ছিস্? এ কথা তোকে কে শিখিয়ে দিলে?"

গোপাল।—"শিখিয়েছেন সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর। তিনি

বলেন,—যারা অনন্ত আকাশের উন্মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করে, তাদের ক্ষুদ্র পিঞ্জরে বদ্ধ ক'রে রাখা—মহাপাপ। আমি তাই পাখীটার বন্ধন মোচন ক'রেছি। মা! তিনি বলেছেন,—বন্ধনই সর্ব্ব-দুঃখের মূল, বন্ধন-মোচনই পরম সুখ!"

গোপাল তোতা পাখীর ন্যায় কথাগুলি বলিয়া গেল। কিন্তু মায়ের প্রাণে কথাগুলি বিষবৎ বিদ্ধ হইল। শান্তিদেবী গোপালের মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"যা হ'য়েছে—হ'য়েছে। তা—অমন ক'রে আর পয়সা নষ্ট ক'র না—বাবা!"

প্রকাশ্যে তিনি এই কথাই বলিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে এক দারুণ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"বন্ধন-মোচন! জানি না—গোপালের মনে কি আছে!" তিনি করযোড়ে ভগবানকে ডাকিলেন,—"ভগবান! তুমি গোপালের সুমতি দিও। গোপাল তোমারই পদাশ্রিত!"

জননীর কথায় গোপাল কোনও উত্তর দিল না; কিন্তু মনে মনে বলিল,—"যদি পয়সা কখনও পাই, বন্ধন-মোচনই আমার লক্ষ্য থাকিবে।"

* *
*

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

---

### স্বামিসকাশে।

"But had no hearts to break his purposes."

—*Tennyson.*

দিন কাটিল। রাত্রি আসিল। পতি-পত্নীতে সাক্ষাৎ হইল।

শান্তি-দেবীর প্রাণ উদ্বেগ-পূর্ণ। গোপালকে সঙ্গে লইয়া রজনী প্রভাতে স্বামী নাটোর-যাত্রা করিবেন শুনিয়া অবধি তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এ দিকে আবার, সন্ন্যাসীর সহিত গোপালের সাক্ষাৎকারের সমাচারে এবং গোপালের মুখে 'বন্ধন-মোচনই পরম সুখ' এবম্বিধ ঔদাসীন্য-ব্যঞ্জক উক্তি শ্রবণ করায়, তাঁহার চঞ্চল চিত্তের চিন্তা-বহ্নিতে যেন ইন্ধন সংযুক্ত হইয়াছিল।

পতিকে প্রকোষ্ঠে পাইয়া, তাই প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গোপালের কথা সব শুনেছেন কি ?

হরিদেব রায় উত্তর দিলেন,—"পাগল ছেলের পাগলামির কথা আর কি শুনব ?"

শান্তিদেবী।—"সন্ন্যাসীর সহিত গোপালের সাক্ষাৎ হওয়া অবধি গোপালকে কেমন যেন আমি আন্‌মনা দেখ্‌ছি। আমার মনে কত যেন কি আশঙ্কার কথা উদয় হ'চ্ছে! কপালে কি আছে, কে ব'ল্‌তে পারে!"

হরিদেব।—"সামান্যতেই তুমি বিচলিত হও। ছেলে মানুষের সব কথা কি ধ'র্‌তে আছে ?"

শান্তিদেবী।—"কথাটা শুনেই প্রাণটা কেমন চম্‌কে উঠ্‌ল, তাই বল্‌ছিলাম !"

এই বলিয়া শান্তিদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, কাল আপনি গোপালকে নিয়ে নাটোরে যাবেন—বল্‌ছিলেন না ?—কেন ?"

হরিদেব রায় উত্তর করিলেন,—"তুমি শোন-নি কি—মহারাণী ভবানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ ক'র্‌বেন ? তাঁর দেওয়ান দয়ারাম রায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। তিনি গোপালকে নিয়ে আমায় নাটোরে যেতে ব'লেছেন। এদিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ উপলক্ষে নাটোর রাজবাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ-পত্রও এসেছে।"

শান্তিদেবী।—"নিমন্ত্রণ রক্ষে কর্‌তে আপনি যাবেন ; তা গোপালের যাওয়ার আবশ্যক কি ? দেওয়ানই বা গোপালকে নিয়ে যেতে ব'ল্‌লেন কেন ?"

হরিদেব।—"বিশেষ একটু উদ্দেশ্য আছে। মহারাণী ভবানীর যদি নজরে লাগে, তা হ'লে গোপাল আমার অৰ্দ্ধ-বঙ্গেশ্বর হ'তে পার্‌বে।"

কথাটা শুনিয়া, শান্তিদেবীর প্রাণটা যেন কেমন-কেমন করিয়া উঠিল। শান্তিদেবী কহিলেন,—"আপনি কি ব'ল্‌ছেন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে !"

হরিদেব রায় কহিলেন,—"আমার গোপাল যেরূপ সুলক্ষণা-ক্রান্ত, গোপালকে দে'খে নিশ্চয়ই মহারাণীর পছন্দ হবে।"

শান্তিদেবী।—"নাটোর যাবেন ব'লেই বুঝি, ভবানীপ্রসাদ

ও রামপ্রসাদের সঙ্গে আমার পিত্রালয়ে না গিয়ে, আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছেন ?”

হরিদেব।—“হাঁ, তাই বটে ! গোপাল আমার সঙ্গে থাক্‌লে আমি ঐ পথেই নাটোর রওনা হ'তাম। দিন সংক্ষেপ ; তাই কালই আমায় রওনা হ'তে হবে। গোপালকে নেবার জন্যই আমি বাড়ী এসেছি !”

শান্তিদেবী।—“আপনি কি তবে মনে ক'রেছেন, গোপালকে আপনি দত্তক পুত্র দিবেন ? আমার প্রাণ থাক্‌তে আমি তা দিতে পার্‌ব না।”

হরিদেব।—“তুমি বুঝ্‌ছ না! গোপাল রাজা হ'বে ; আমরা অতুল সম্পত্তির অধিকারী হ'ব। একি অল্প সৌভাগ্যের কথা! ভগবান যদি মুখ তুলে চান, তবেই সে সৌভাগ্যের দিন আস্‌তে পারে।”

শান্তিদেবী।—“তেমন সৌভাগ্য আমি চাই না ! গোপালকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পার্‌ব না। আপনি যাই বলুন, গোপালের নাটোর যাওয়া হ'বে না।”

হরিদেব।—“সে কি বল ? আমি যে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত ক'রেছি! সকালে পাল্কী আস্‌বে ; আমি গোপালকে নিয়ে নাটোর যা'ব !”

শান্তিদেবী।—“আপনি যাবেন—যান ; গোপালকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না !”

হরিদেব রায় একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া স্ত্রীকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বুঝাইলেন,—নাটোরের ঐশ্বর্য্যের কথা ; বুঝাইলেন,—গোপাল

পোষ্যপুত্র মনোনীত হইলে, গোপাল সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে ; বুঝাইলেন,—গোপাল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলে, তাঁহাদের দিন ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু শান্তিদেবীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। ভবিষ্যতের কি যেন অমঙ্গল-রাশি ঘনীভূত হইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তিনি বলিলেন,—"আপনি যতই প্রবোধ দেন, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানছে না!"

হরিদেব রায় পুনরপি কহিলেন,—"গোপালকে যে আমি সেখানে রেখে আস্‌তেই নিয়ে যাচ্ছি, তা তুমি মনে ক'র না। গোপালের ন্যায় শত শত বালক সেখানে উপস্থিত হবে। তাদের মধ্যে যে বালক মহারাণীর নজরে পড়্‌বে, মহারাণী তা'কেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ ক'র্‌বেন। শত শত বালকের মধ্যে গোপালকে যে তিনি পছন্দ ক'র্‌বেন, সে আশা দুরাশা মাত্র!"

শান্তিদেবী সুযোগ পাইলেন। মনে মনে বলিলেন,—"ভগবান করুন, সে আশা দুরাশাই হউক!" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"তবে আর আপনি গোপালকে নিয়ে যা'বার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌ছেন কেন?"

হরিদেব।—"তার কারণ অন্যরূপ। মহারাণী ঘোষণা ক'রেছেন, যাঁ'র পুত্র মনোনীত নাও হ'বে, পুত্র সহ রাজধানীতে গমন ক'র্‌লে, তিনিও যথেষ্ট বিদায়-সম্মান প্রাপ্ত হ'বেন। এমন কি, তৎসূত্রে একটা বিষয়-সম্পত্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। তার পর, আমাদের ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, গোপালকেই যদি মহারাণী পছন্দ করেন, তা'হলে তো আর কথাই নেই!"

শান্তিদেবী।—"তেমন ভাগ্য-প্রসন্ন হওয়ার আমার দরকার নেই;—তেমন বিষয়েও আমি আকাঙ্ক্ষা করি-নে।"

হরিদেব।—"ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের তিনটী পুত্র-সন্তান। তার একটীকে দত্তক দিয়ে আমরা যদি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারি, সে কি বাঞ্ছনীয় নয়?"

কথাটা শান্তিদেবীর প্রাণের ভিতর শেল-সম বিদ্ধ হইল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"না—না! কখনই বাঞ্ছনীয় নয়! যার দু'টী চক্ষু আছে, সে কি একটী চক্ষু উৎপাটন ক'রে দিতে পারে। যার দুই খানি হাত, সে কি এক খানি হাত কেটে দিতে সম্মত হয়? আপনি আমায় এ কি প্রলোভন দেখাচ্ছেন! পুত্রের বিনিময়ে সম্পত্তি-লাভ! তেমন সম্পত্তিতে আমার কাজ নেই! ঈশ্বর না করুন, যদি তেমন দুর্দ্দশার দিনই আসে, না হয়—স্বামী-স্ত্রীতে দু'জনে ভিক্ষে ক'রে নিয়ে এসে সন্তান তিনটীকে পালন ক'র্‌ব; কিন্তু পরের হাতে কোন মতেই সমর্পণ ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

শান্তিদেবীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

পত্নী অতিমাত্র বিচলিত হইয়াছেন বুঝিয়া, হরিদেব রায় ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আচ্ছা, আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, আমি গোপালকে সেখানে রেখে আস্‌ব না। মহারাণী যদিও গোপালকে পছন্দ করেন, আমি তবু গোপালকে বাড়ী ফিরে নিয়ে আস্‌ব। বাড়ী ফিরে নিয়ে এলে, তার পর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, গোপালকে পাঠিয়ে দিও; না হয়, না পাঠিও।"

শান্তিদেবী অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"তবে নিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন?"

হরিদেব।—"আমি যে কথা দিয়েছি! একবার না নিয়ে গেলে আমার যে কথার খেলাপ হ'বে!"

শান্তিদেবী বিবেচনা করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি উদ্বেগ-বশে বলিয়া উঠিলেন,—"হয়—হবে!"

হরিদেব।—"কথার খেলাপ হ'লে, ইহলোকে ও পরলোকে কষ্ট পেতে হ'বে। তুমি ধর্ম্মপরায়ণা, তুমি বুদ্ধিমতী; সহধর্ম্মিণী হ'য়ে, তুমি কি আমায় পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হ'তে পরামর্শ দেও!"

শান্তিদেবী সঙ্কুচিতা হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—তিনি যেন কত অপরাধই করিয়া বসিয়াছেন! তখন কত কথাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। পতির কথায় প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণে ব্যথা দিয়াছেন,—তজ্জন্য কতই অনুতাপ হইল। একে পুত্রত্যাগের আশঙ্কা, তাহার উপর পতির অসন্তোষ-উৎপাদন-জনিত অনুতাপ,—এতদুভয়ে তাঁহার হৃদয় অভিভূত করিয়া ফেলিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর চরণ-প্রান্তে নিপতিত হইয়া শান্তি-দেবী কহিলেন,—"আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই ক'রুন। তবে আমার একটী অনুরোধ—আমার গোপালকে আপনি কোনমতেই সেখানে রেখে আসবেন না!"

* *
*

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## লোভ।

"লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণম্॥"

—হিতোপদেশ।

মহারাণী ভবানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন,—এই সংবাদে কেবল যে হরিদেব রায়ের সংসার উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে; বাঙ্গালার আরও বহু গৃহ এই আন্দোলনে আন্দোলিত।

কৃষ্ণনাথ রায়ের দুই পুত্র। অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল নহে; সুতরাং তিনি একটী পুত্রকে নাটোর-রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। পত্নী মহামায়ার সহিত কয় দিন ধরিয়া সেই সম্বন্ধেই পরামর্শ চলিতেছে।

কৃষ্ণনাথ বলিতেছেন,—"অনেক লোকে অনেক ছেলে-পিলে নিয়ে যাবে; কত লোকের কত রকম সুপারিশ পড়্‌বে; আমরা এমন কি অদৃষ্ট ক'রেছি যে, রঘুনাথের প্রতিই মহারাণীর নজর পড়্‌বে!"

মহামায়া।—"তাইতেই তো আমি দু'দিন আগে নিয়ে যেতে ব'ল্‌ছি। প্রথমে যদি একবার নজরে পড়ে যায়, মহারাণীর নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। আমি বলি, তুমি কালই নাটোর রওনা হও!"

কৃষ্ণনাথ।—"আগে কি তিনি দেখ্‌বেন? আমি শুনেছি, যত দেশ থেকে যত ছেলে যাবে, সবগুলিকে এক সঙ্গে বসিয়ে রেখে, মহারাণী তারই মধ্যের একজনকে পোষ্যপুত্র মনোনয়ন করবেন।"

মহামায়া।—"আগে নিয়ে গিয়ে কোনরকমে তাঁকে একবার দেখাতে পার্‌বে না? রাজবাড়ীর মধ্যে তুমি নিজে না যেতে পা'র, রাজবাড়ীর ঝি-চাকরের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রেও তো রঘুনাথকে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পার! এর জন্যে তাদের কিছু দিতে হয়, সেও ভাল। আমার রঘুনাথ দেখ্‌তে যেরূপ সুন্দর, তাকে দেখ্‌লে মহারাণী কখনই অপছন্দ কর্‌বেন না। যেমন ক'রেই হ'ক, তুমি রঘুনাথকে নিয়ে গিয়ে মহারাণীর সামনে একবার উপস্থিত কর্‌বার ব্যবস্থা ক'রো। দিন থাক্‌তে যাও; বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই কর্‌তে পার্‌বে।"

কৃষ্ণনাথ।—"চেষ্টার ত্রুটি ক'র্‌ব না। রঘুনাথকে যাতে রেখে আস্‌তে পারি, তাই ক'র্‌ব। ভাল, কালই আমি রওনা হব।"

মহামায়া ভাবিতে লাগিলেন,—'রঘুনাথ রাজা হবে; আমাদের সকল দুঃখ দূরে যাবে; আমরা রাজ্যৈশ্বর্য্যের অধিকারী হব,—এর বাড়া আহ্লাদের কথা আর কি হ'তে পারে?' প্রকাশ্যে কহিলেন,—"যেমন ক'রে হ'ক, তুমি রঘুনাথকে নজরে লাগাবার চেষ্টা ক'রো।"

তাহাই স্থির হইল। পরদিন প্রত্যূষে, রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া, কৃষ্ণনাথ নাটোর যাত্রা করিবেন, বন্দোবস্ত হইয়া গেল। পিতামাতা উভয়েরই মনে কত আশা, কত ভরসা—রঘুনাথকে

পোষ্যপুত্ররূপে প্রদান করিয়া আপনাদের অবস্থা ফিরাইয়া লইবেন।

কৃষ্ণনাথ মনে মনে কহিলেন,—'অর্থ! তুমিই সার। অর্থে সকলই হয়!'

মহামায়ার হৃদয়েও প্রতিধ্বনি উঠিল,—'অর্থ! অর্থই সার! অর্থে সকলই হইতে পারে।'

পতিপত্নী উভয়েই অর্থলালসায় ব্যাকুল হইয়া প্রাণপ্রিয় পুত্র রঘুনাথকে বিদায় দিতে প্রস্তুত হইলেন।

* * *

পরদিন প্রভাতে নাটোর-যাত্রার সময় রঘুনাথ কাঁদিয়া উঠিল। পিতা বুঝাইতেছেন,—'নাটোরে নিমন্ত্রণে যাইবে।' মাতা বুঝাইতেছেন,—'কত ভাল ভাল খাবার পাবে, কত ভাল পোষাক পাবে, কত টাকাকড়ি পাবে; যাও বাবা—যাও।'

কিন্তু বালক যাইতে চাহে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে,—"না—মা, আমি যাব না। না—বাবা, আমি যাব না। আমি খাবার চাই না, আমি পোষাক চাই না, আমি টাকা-কড়িও চাই না।"

কৃষ্ণনাথ ও মহামায়া সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা একবার বা তিরস্কার-ছলে, একবার বা প্রবোধ বাক্যে, রঘুনাথকে নাটোর-যাত্রায় উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন।

* * *

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## বাঙ্গালার অবস্থা।

"Let the dead Past bury its dead".

—Longfellow.

আমরা যে সময়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, বাঙ্গালার অবস্থা তখন বড়ই বিপ্লবময়। বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগন তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন। লোকপ্রিয় নবাব আলীবর্দ্দি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার আদর-প্রাপ্ত দৌহিত্র যুবক সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গের মসনদ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বঙ্গ-সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সর্পপ্রকৃতি কুচক্রিগণ বিষ-জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছে।

দেশ অরাজক। রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা পদে পদে প্রত্যক্ষীভূত। দিকে দিকে অশান্তি-অনল প্রজ্বলিত। পরদার, পরস্বাপহরণ, দস্যুভীতি প্রভৃতিতে প্রজাবর্গ বিষম বিব্রত। দেশে হা-হুতাশ হাহাকার রাজত্ব করিতেছে। পূর্ব্বে দেখ, পশ্চিমে দেখ, উত্তরে দেখ, দক্ষিণে দেখ,—যে দিকে দেখিবে,—সেই দিকেই বিপ্লবের বিষম বিভীষিকা!

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের উপর দিয়া কি বিষম অশান্তি-প্রবাহই প্রবাহিত হইয়াছিল। এক দিকে ইংরেজ, এক দিকে ফরাসী,—এক দিকে মোগল, এক দিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ,—

এক দিকে নবাব, এক দিকে তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতক পারিষদবর্গ,—আমিষলোভী মার্জ্জারের ন্যায় বঙ্গের প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া ছিলেন। বঙ্গ-লক্ষ্মী কোন্ দিন কোন ভাগ্যবানের গৃহ পবিত্র করিবেন,—কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। কেহ মনে করিতেছিলেন,—"নবাবের প্রবল প্রতাপ—বিপুল বাহিনী। যিনিই সম্মুখীন হইবেন, স্রোতে তৃণকণার ন্যায় ভাসিয়া যাইবেন।" কেহ মনে করিতেছিলেন,—"বিশ্বাস-ঘাতকদিগের ষড়যন্ত্র-রূপ প্রস্তর-স্তূপ সম্মুখে পড়িলে, সে স্রোতোবেগ আপনিই মন্দীভূত হইয়া আসিবে।" কেহ মনে করিতেছিলেন,—"আওরঙ্গজেব-কথিত সেই 'পার্ব্বত্য মূষিক' মহারাষ্ট্রগণই কালে ভারতের একছত্র আধিপত্য লাভ করিবে।" কেহ মনে করিতে-ছিলেন,—"দিন দিন অভ্যুত্থানশীল ফরাসী-জাতিই ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।" কেহ বা মনে করিতেছিলেন,—"দাক্ষিণাত্যে ক্লাইবের আর্কট অবরোধে সকলের সকল আশাই দূরীভূত হইয়াছে। এখন ইংরেজের ললাট লিপিতেই ভারত-সাম্রাজ্য-লাভের পরিচয়-চিহ্ন পরিদৃশ্যমান্!"

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশী-প্রাঙ্গণে অদৃষ্ট-পরীক্ষার শেষ দিন। নবাবের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, সৌভাগ্যলক্ষ্মী সেই দিন ইংরেজের গৃহ পবিত্র করেন। ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় ঘটনা।

পলাশীর আম্রকাননে সামান্য কয়েক জন সৈন্য-সহ ক্লাইবের সমরায়োজন,—অগণিত সৈন্য লইয়াও মীরজাফর প্রমুখ প্রধান সেনাপতিগণের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সিরাজের

পরাজয়,—নবাবের পলায়ন ও তাঁহার নৃশংস হত্যাকাণ্ড,—জয়োল্লাসে ক্লাইবের মুর্শিদাবাদ প্রবেশ,—মীরজাফরের মসনদ-প্রাপ্তি,—সকলেরই স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল হইয়া আছে। ইতিহাস-পাঠক—সকলেই সে সমাচার অবগত আছেন। বাহুল্য-ভয়ে সে প্রসঙ্গ এখানে আর উত্থাপন করিলাম না।

শুনিয়াছি, এই পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে নাটোর-রাজধানীতে মহারাণী ভবানীর পোষ্য-পুত্র-গ্রহণের উদ্যোগ হইয়াছিল। শুনিয়াছি, এই পলাশী-যুদ্ধের পরই মহারাণী ভবানীর পোষ্য-পুত্র-গ্রহণের উৎসব-সমারোহে নাটোর-রাজধানী মুখরিত হইয়াছিল। [illegible] কয়েক দিন পূর্ব্বেই হউক, আর কয়েক দিন পরেই হউক, মহারাণী ভবানী যখন দত্তক গ্রহণ করেন;—বঙ্গদেশ তখন যে নানারূপে সঙ্কট-সমাকুল ছিল, তাহার প্রমাণাভাব নাই। ভাগীরথীর পূর্ব্ব উপকূল এবং পশ্চিম উপকূল—উভয় কূলেই তখন নানা উচ্ছৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল,—তখনও মানুষ-চুরীর আতঙ্ক তিরোহিত হয় নাই,—তখনও ধর্ম্মনাশের বিভীষিকা দূরীভূত হয় নাই,—তখনও দস্যুতার সমাচার সর্ব্বদাই শ্রুতি-গোচর হইত। মহারাণী ভবানী আপন রাজ্য-মধ্যে শান্তি-স্থাপনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন বটে; কিন্তু পারিপার্শ্বিক উপদ্রবে তিনিও যে সময়ে সময়ে বিব্রত হইতেছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহারা রক্ষক, সে সময়ে তাহারাই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### বিষম বিপদ!

"——সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।"

—মেঘনাদ-বধ।

রূপ-নগরের প্রান্তভাগে কালাদীঘি নামে একটি জলাশয় ছিল।

কালাদীঘির কাল-জলে তীরস্থিত তাল-তমাল তরুরাজির ছায়া, সুনীল গগনপ্রান্তে কৃষ্ণ-কাদম্বিনী-সম প্রকটিত হইতেছিল। বৈকালে, মৃদুল-হিল্লোলে, সেই কৃষ্ণ-স্বচ্ছ সলিল-রাশি—নাচিতেছিল, দুলিতেছিল, খেলিতেছিল। ক্বচিৎ বৃক্ষান্তরাল-প্রবিষ্ট আলোক-রশ্মি—সলিল-বক্ষে চকিত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল; ক্বচিৎ দলবদ্ধ উড্ডীয়মান্ বিহঙ্গমের চঞ্চল-ছায়ায়—জলরাশির প্রশান্ত-বক্ষে কৃষ্ণ-রেখার সঞ্চার হইতেছিল; ক্বচিৎ দিবাবসানাশঙ্কায়, কুলায় অন্বেষণে, পক্ষিগণ কল-নিনাদে তীরভূমি ধ্বনিত করিতেছিল; ক্বচিৎ অদূরাগত সুন্দরীগণের কঙ্কণ-নিক্বণে মোহনে-মধুরে মিশিতেছিল।

দুইটী যুবতী সেই অপরাহ্নে কালাদীঘিতে গা ধুইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যপ্রভায় কালাদীঘির কাল-জল যেন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। সুনীল গগনে নক্ষত্র-পুষ্পের

শোভন-সদৃশ কিংবা সরোবর-প্রস্ফুটিত কমলদলের ন্যায়, আবক্ষ-নিমগ্ন সেই সুন্দরীদ্বয়ের কমনীয় কান্তি সলিল-বক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছিল। যুবতীদ্বয়, গাত্র-প্রক্ষালন-কালে কথোপকথনে গাঢ়-নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহাদের হস্তস্থিত কলসী, তরঙ্গ-ভঙ্গে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। উন্মোচিত অবগুণ্ঠন বায়ুভরে সলিল-বক্ষে ক্রীড়া করিতেছিল; তরঙ্গ-বিচালিত জল-রাশি, বক্ষ উল্লঙ্ঘন করিয়া, কখনও গোলাপ-সন্নিভ সুকোমল গণ্ড-দেশে, কখনও বা বেণীবদ্ধ কৃষ্ণ-কুন্তল-পাশে আসিয়া আঘাত করিতেছিল।

যুবতীদ্বয়ের একটীর নাম—তারা; অপরটী—শ্যামা।

অপরাহ্নে কালাদীঘিতে গা ধুইতে আসিয়া, নির্জ্জনতা পাইয়া, তাহারা দুই একটী প্রাণের কথা কহিতেছিল। কথায় কথায় তারা কহিল,—"তোর দাদা যখন গিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌বেন!"

শ্যামা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। শ্যামা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর দিল,—"বউ! তেমন কপাল কি আমি ক'রেছি? তা'হলে এমন সংবাদ আস্‌বে কেন?"

তারা।—"আমার কিন্তু ঠাকুর-ঝি! এ সংবাদে মোটেই বিশ্বাস হয় না।"

শ্যামা।—"আমার অদৃষ্টে বউ, সব ঘট্‌তে পারে! নইলে, শ্বশুর মহাশয় বিরূপ হবেন কেন?"

তারা।—"তালুই মশায় টাকার লোভে ঢ'লে পড়েছেন।"

শ্যামা।—"তিনিই বা আস্‌বেন ব'লে গেলেন, আর এলেন না কেন?"

তারা।—"হয় তো কোনও ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে গিয়েছেন। আমার মনে হয়, তিনি শীঘ্রই আস্‌বেন। আমি যতদূর জানি, ঠাকুর-জামাই সে রকমের লোক নন।"

শ্যামা।—"তুমি তো বউ, আমার শ্বশুরকে জান না! তিনি একরোখা লোক;—যা ধ'র্‌বেন, তাই ক'র্‌বেন!"

তারা।—"ঠাকুর্-জামাই তাঁর মত ফেরাতে পার্‌বেন না!"

শ্যামা।—"সাধ্য কি! বাপের নিকট মুখ তুলে কথাটি কইবারও তাঁর সামর্থ্য নেই!"

তারা।—"আচ্ছা, তোমায় যে নিয়ে যাবার কথা হ'য়েছিল, তারই বা কি হ'ল?"

শ্যামা।—"আর নিয়ে গিয়েছেন! এবার তিনি নূতন-বৌ নিয়ে ঘর ক'র্‌বেন। ভাই! সে বাড়ীতে আমার আর ঠাঁই নাই।"

শ্যামা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

তারার হাসি পাইল। সে হাসি চাপিয়া, তারা বলিল,—"তাই যদি হয়, তা তুই ভাব্‌ছিস্ কেন? ঠাকুর-জামাই যদি বিয়ে করে, তবে আমরাও আবার তোর বিয়ে দেব।"

শ্যামার একটু রাগ হইল। শ্যামা বলিল,—"সকল তাতেই তোর ঠাট্টা!"

তারা।—"তুই বুঝি মনে ক'র্‌লি, আমি ঠাট্টা কর্‌ছি! কেন, পুরুষেরই কি দু'দশবার বিয়ে কর্‌তে আছে, আর মেয়েদের বেলাতেই যত দোষ! আমি সত্যি ব'ল্‌ছি, ঠাকুর-জামাই যদি বিয়ে করে, তোর দাদাকে ব'লে, তোর জন্যে আমি কার্ত্তিকের মতন নূতন ঠাকুর-জামাই এনে দেব। কেমন—এখন ভাবনা দূর হ'ল তো?"

শ্যামা।—"তুই কি ভাই আর ঠাট্টার সময় পেলি-নে? তাঁরা কুলীন; কুলীনে দু'শো একশো বিয়ে করে। শ্বশুর মহাশয় তাঁর ছেলের এক বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন কি করে ভাই! এতদিন যে দু'দশটা বিয়ে দেন-নি, তাই আমার ভাগ্য বলে মান্‌তে হয়।"

তারা।—"তুই রামও গা'স্‌, আবার রহিমও গা'স্‌। তবে করুন না কেন ঠাকুর-জামাই—আরও দু'দশটা বিয়ে! তার জন্যে তোর আর এত ভাবনা কেন?"

আপনি বলিলে শোভা পায়; কিন্তু পরে বলিলে সহ্য হয় না;—মানুষের ইহাই প্রকৃতি। তারার কথায় শ্যামার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। শ্যামা উত্তর দিয়া এবার আর জিতিতে পারিল না। তাই সেই কাকচক্ষু-সন্নিভ কালাদীঘির কাল জলে শ্যামার দুই বিন্দু অশ্রুজল পতিত হইল।

শ্যামার নয়নাশ্রু-সম্পাতে তারার হৃদয় সহানুভূতিতে গলিয়া গেল। তারা সান্ত্বনাব্যঞ্জক স্বরে কহিল,—"ঠাকুর-ঝি! তুই ক্ষেপেছিস্‌ নাকি? ঠাকুর-জামাই যে প্রকৃতির লোক, তিনি কি সহজে আর একটা বিয়ে ক'র্‌তে রাজি হ'বেন? তুই নিশ্চয় জানিস্‌, তিনি কখনই তো ক'র্‌বেন না।"

শ্যামা।—"সত্য ব'ল্‌তে কি বউ, সেই সাহসই আমার সাহস। তাঁর সেই সরল মুখখানি মনে প'ড়লে, একবারও মনে হয় না—তিনি কখনও আমায় ত্যাগ ক'র্‌তে পারেন।"

বলিতে বলিতে শ্যামার নয়ন-কমল পুনরায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

শ্যামার মনের আবেগ উপলব্ধি করিয়া, তারা পুনরায় সান্ত্বনা-

বাক্যে কহিল,—"ঠাকুর-ঝি! কেন তুই বৃথা ভাবনায় ব্যাকুল হ'স! দাদা যখন গিয়েছেন, নিশ্চয়ই সে বিয়ে ভাঙ্গিয়ে আস্‌বেন। তুই দেখিস্—ঠাকুর-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শীঘ্রই এখানে এসে পৌঁছিবেন! তুই একটুও ভাবিস্ না!"

শ্যামা।—"বউ, তাই হোক—তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! যদি একবার তাঁর দেখা পাই, তাঁরে মিনতি ক'রে ব'লব—"

শ্যামা আর বলিতে পারিল না। শ্যামার বক্ষ বহিয়া অনুরাগের অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। তারা নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু শ্যামার উদ্বেগ-আতঙ্কপূর্ণ প্রাণ প্রবোধ মানিল না।

কথায় কথায় অনেক সময় কাটিয়া গেল। সম-বয়সী সাথী না হইলে, সকলের তো আর সে কথায় যোগ দেওয়া শোভা পায় না! সুতরাং শ্যামা ও তারার কথায়, শ্যামা ও তারাই বিভোর হইয়া রহিল। আর আর যাহারা ঘাটে গা ধুইতে আসিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল।

শ্যামার আশঙ্কা দূর হইল না। তারা বুঝাইয়া বুঝাইয়া শ্যামার আতঙ্ক দূর করিতে পারিল না। সন্ধ্যার পদ-বিক্ষেপে পৃথিবীতে আঁধার-ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, নব নব আশঙ্কায়, শ্যামার প্রাণ ক্রমে নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে লাগিল।

এদিকে গোধূলি অপগমে সন্ধ্যার সমাগম প্রত্যক্ষ করিয়া, তারা শ্যামাকে কহিল,—"সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আয় ভাই—বাড়ী যাওয়া যাক্!"

প্রকৃতি নিস্তব্ধ। কালাদীঘি নিস্তব্ধ। তীরস্থিত তরুরাজি নিস্তব্ধ। কচিৎ বৃক্ষান্তরালে দুই একটী পাখীর কিচিমিচি শুনা

কালাদীঘিতে—তারা ও শ্যামা।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

যাইতেছে। কচিৎ দুই একটী নিশাচর পক্ষী বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। কচিৎ ঝিল্লীরবে এক এক প্রান্ত মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

তারার কথায় শ্যামার যেন চৈতন্যোদয় হইল। ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া, উভয়েই মনে মনে ভয় পাইল। তখন আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে বুঝিয়া, উভয়েই গৃহ-গমনে প্রস্তুত হইল;—ঘাট হইতে উঠিয়া, দীঘির পশ্চিম-পাড়ের পথ ধরিয়া, ধীরে ধীরে কলসী-কক্ষে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

কালাদীঘির সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। সেই প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, গ্রামের মধ্যে পৌঁছান যায়। কিন্তু ঘাট হইতে উঠিয়া পথে পদার্পণ করিতেই —এ কি বিঘ্ন!

দুই জন সৈনিক-পুরুষ সেই পথ দিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, প্রান্তরের মধ্যে, কালাদীঘির কাল-জলে প্রস্ফুট-কমল-সদৃশ যুবতীদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া, তাহারা অশ্বের গতি সংযত করিল।

সহসা সম্মুখে দুই জন অশ্বারোহী সৈনিক-পুরুষ আসিয়া পথ অবরুদ্ধ করায়, যুবতীদ্বয় চমকিয়া উঠিল। প্রথমে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া ঘাটের দিকে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু যখন দেখিল, অশ্বারোহী সৈনিক-পুরুষদ্বয় তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে,—তাহাদিগের গতিরোধে চেষ্টা পাইতেছে; তখন আর তাহাদের আতঙ্কের অবধি রহিল না, তখন আর তাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন আর তাহাদের চরণ চলিতে চাহিল না। কক্ষের কলসী

কক্ষভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল। শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল।

সৈনিক-পুরুষদ্বয় মুসলমান। দুই জনেরই বেশ-ভূষা এক-রূপ। দুই জনেই একই প্রকার অশ্বে আরোহণ করিয়া ছিল। তাহারা নবাবের অনুচর। এক জনের নাম—আলিজান; অন্য জনের নাম—মহম্মদীবেগ।

যুবতীদ্বয়কে সঙ্কুচিত দেখিয়া, মহম্মদীবেগ বলিয়া উঠিল,—"তোমাদের ভয় নেই! আমাদের দ্বারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হ'বে না।"

আলিজান বলিল,—"তোমাদের সৌভাগ্য, তাই আমাদের নজরে প'ড়ে গিয়েছ! খোদা এবার তোমাদের দুঃখ দূর ক'র্‌বেন।'

এই বলিয়া, সৈনিক-পুরুষদ্বয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। দীঘির পাড়ে, একটী বৃক্ষের শাখায়, অশ্বদ্বয়কে বাঁধিয়া রাখিল। তার পর দুই জনে যুবতীদ্বয়কে ধরিতে গেল। বলিল,—"এস বিবিরা—এস! এস—বিনা আপত্তিতে আমাদের সঙ্গে এস। নবাবের বেগম্‌ ক'রে দেব।"

যুবতীদ্বয় ঘাটের দিকে আরও একটু সরিয়া গেল। অব-গুণ্ঠন আরও একটু বাড়াইয়া দিল। কিন্তু সৈনিক-পুরুষদ্বয় নিরস্ত হইল না। যুবতীদ্বয় যতই পশ্চাতে হটিতে লাগিল, তাহারাও ততই অগ্রসর হইয়া যুবতীদ্বয়কে ধরিবার চেষ্টা পাইল। তাহারা কখনও বা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল; কখনও বা প্রলোভনে ভুলাইবার প্রয়াস পাইল। একবার বা বলিল,—"এস—আমাদের সঙ্গে এস; কত আদর পাবে; এমন

ক'রে ঘাটে মাঠে ঘুরে বেড়াতে হবে না।" একবার বা বলিল,—"যদি সহজে না এস, জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাব। কেউ আট্‌কাতে পার্‌বে না।"

আলিজান ও মহম্মদীবেগ পরস্পর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল,—তাহাদের এক-এক জনের ঘোড়ার উপর এক-একটী যুবতীকে উঠাইয়া লইয়া ঘোড়া হাঁকাইয়া দিবে।

আলিজান কহিল,—"ঘোড়ায় পার্‌বে তো?"

মহম্মদীবেগ উত্তর দিল,—"কয় কোশই বা পথ! অনায়াসেই যাওয়া যাবে।"

আলিজান সংশয়-প্রশ্ন তুলিল,—"পথে যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, বাধা দিতে পারে।"

মহম্মদীবেগ উত্তর দিল,—"সন্ধ্যার আঁধার একটু পরেই ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌বে; পথে লোক-চলাচল বন্ধ হবে। যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, বাধা দিতে সাহস ক'র্‌বে না।"

আলিজান।—"তবে এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। এঘাটে সর্ব্বদাই লোকজন জল নিতে আসে। হঠাৎ কেউ যদি এসে পড়ে!"

মহম্মদীবেগ।—"এখন আর এখানে লোকজন আসার সম্ভাবনা নাই। তবে এখানে আর দেরী ক'র্‌তেও আমি ইচ্ছা করি না। এখানকার পথ-ঘাট খারাপ চাঁদের আলো থাক্‌তে থাক্‌তে রওনা হওয়াই শ্রেয়ঃ। আবশ্যক বুঝি, পথে কোথাও অপেক্ষা করা যাবে। এস, ওদের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে, তাড়াতাড়ি ঘোড়া হাঁকিয়ে দিই।"

এইবার তারা ও শ্যামাকে লক্ষ্য করিয়া আলিজান কহিল,—

"তবে কি তোমরা শুন্‌বে না? তবে কি জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে ঘোড়ায় চড়াতে হবে?"

তারা ও শ্যামা দুই জনেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; দুই জনেই মনে মনে দুর্গা-নাম জপ করিতেছিল; দুইজনেই মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা জানাইতেছিল, —"হে কাঙ্গালের হরি, বিপদ-ভঞ্জন, অনাথনাথ! অভাগিনীদের এ বিপদে উদ্ধার কর!"

সহসা আলিজানের কর্কশ-স্বর কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাহারা কাঁপিয়া উঠিল।

কি কুক্ষণেই আজ তাহারা কালাদীঘিতে গা ধুইতে আসিয়াছিল! যদি আসিয়াছিল, তবে কথায় কথায় এত দেরী করিয়া ফেলিল কেন? তাহারা যখন গা ধুইতে আসে, তখন গ্রামের আরও কত মহিলাকে ঘাটে দেখিতে পাইয়াছিল। সকলেই আসিয়া, আপন-আপন কাজ সারিয়া, চলিয়া গিয়াছে; তাহারাই বা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল কেন? অন্য অন্য দিন প্রায়ই তো তাহারা কোনও-না-কোনও বর্ষীয়সীর সঙ্গে আসে, আর তাঁহাদের সঙ্গেই চলিয়া যায়! কিন্তু আজ তাহাদের এ দুর্ম্মতি কেন হইল? যদি আসিয়াছিল, তবে অন্যান্য সকলের সঙ্গে সঙ্গেই বা চলিয়া গেল না কেন? যে সুখ-দুঃখের আলোচনায় এই বিলম্ব ঘটিল, সে আলোচনা বাড়ীতে বসিয়াও তো চলিতে পারিত!

দেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয়—দেশব্যাপী অরাজকতার কথা— কাহারও তো এখন অপরিজ্ঞাত নাই! বর্গীর বিভীষিকা —এখনও তো দেশ হইতে একেবারে দূর হয় নাই! 'বর্গী

আসিতেছে' শুনিলে এখনও অনেক গ্রামে হাহাকার পড়িয়া যায়,—গ্রামবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে পলায়ন করে! এখনও পাঠান-মোগলের ফৌজের অত্যাচার— অনেক স্থলেই পরিদৃশ্যমান! ফৌজ-পল্টন আসিতেছে শুনিলে, এখনও অনেক গ্রামের সুন্দরী রমণীরা পোড়া হাঁড়ীতে মস্তক ঢাকিয়া জলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে! ধর্ম্ম-রক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য, সুন্দরীগণকে এখনও শরীরের ও মুখমণ্ডলের বিকৃতি-সম্পাদন করিতে দেখা যায়।

দেশের এই বিষম সঙ্কট-সমস্যার সময়, তারা আর শ্যামা, কোন্ সাহসে, সন্ধ্যার পরও গ্রাম-প্রান্তস্থিত কালাদীঘিতে অপেক্ষা করিতেছিল?

মহম্মদীবেগ ও আলিজান, কখনও বা মিষ্টবাক্যে কখনও বা ভীতিপ্রদর্শনে, তারা ও শ্যামাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল ফলিল না। তখন তাহারা দুই জনে, হাত বাড়াইয়া, তারা ও শ্যামাকে ধরিতে গেল।

"ছুঁয়ো না!—ছুঁয়ো না!"

তারা ও শ্যামা, দুই জনেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, —"ছুঁয়ো না!—ছুঁয়ো না!"

সৈনিকদ্বয় যতই অগ্রসর হয়, তারা ও শ্যামা, ততই পিছাইয়া যায়।

ইচ্ছা করিলে, সৈনিকদ্বয় জোর করিয়া এতক্ষণ তারা ও শ্যামার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের অভিপ্রায়,—কতকটা ভয় দেখাইয়া, কতকটা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া, সম্মতি-সহকারে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবে।

তাহারা বুঝিয়াছিল,—তাহারা যত বড় বলশালী হউক না কেন, জোর-জবরদস্তী করিয়া, দুই জনে দুই জনকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া যাওয়া—বড় সহজ ব্যাপার নহে! যদি তাহারা ঘোড়ার উপর সহজে না উঠে, ঘোড়ায় উঠান' কত কষ্টকর! যদি তাহারা পথে যাইতে যাইতে চীৎকার করে, বিপদের কত সম্ভাবনা! সুতরাং প্রথমে বল-প্রকাশে সৈনিকদ্বয়ের মনে আপনা-আপনিই 'ইতস্তত' হইতেছিল।

কিন্তু যখন তাহারা বুঝিল, সহজে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না, তখন অগত্যা বল-প্রকাশে প্রস্তুত হইল।

তৃতীয়ার চাঁদ এখন একটু একটু জ্যোস্না ছড়াইতেছিলেন; আর সেই জ্যোস্নালোকে সুন্দরীদ্বয়ের মুখ-জ্যোতিঃ বিকশিত হইতেছিল। সুতরাং সৈনিকদ্বয় কোনক্রমেই প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিল না!

মহম্মদী বেগ, আলিজানকে বলিল,—"দেখ্ আলি। সহজে কিছু হবে না! আয় আগে স্পর্শ করি, মুখে থুথু দিই, জাত-ধর্ম্ম নষ্ট হ'ক;—তখন আপনি বশ হয়ে আস্‌বে। আমি অমন অনেক দেখেছি; অনেক হিঁদুর মেয়ে ধ'রে নিয়ে এসেছি। তারা প্রথমে কিছুতেই আস্‌তে চায় না। কিন্তু শেষে যখন ধ'রে ফেলি, মুখে থুথু দিই, জাত নষ্ট হ'ল বলি, তখন সুর সুর ক'রে সঙ্গে আসে। হিঁদুর মেয়েদের জব্দ করার এর চেয়ে সহজ উপায় কিছুই নেই। আয়, দু'জনে দু'টোকে আগে ধ'রে ফেলি;—আয়, দু'জনে দু'টোর মুখে আগে থুথু দিই। তা হ'লে ঠিক সোজা হ'য়ে আস্‌বে,—সঙ্গে আস্‌তে আর আপত্তি থাক্‌বে না!"

আলিজান্।—"ঠিক ব'লেছিস্ ভাই, ঠিক্ ব'লেছিস্। আয় তবে তাই করি।"

এই বলিয়া, দুই জনে দুই জনের প্রতি ধাবমান হইল।

তারা ও শ্যামা প্রথমে মনে করিয়াছিল—মিনতি করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিবে; বলিবে—'তোমরা আমাদের ধর্ম্ম-বাপ, তোমরা আমাদের রক্ষা কর।' কিন্তু যখন তাহাদের শেষ কু-অভিসন্ধির কথা শুনিল; শুনিল—তাহারা জোর করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; আর বুঝিল—তাহারা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; তখন, দুই জনে কাণে কাণে কি বলাবলি করিল,—দুই জনের হৃদয়ে হৃদয়ে কি-যেন-কি তাড়িৎ-শক্তি সঞ্চালিত হইল,—দুই জনে সমস্বরে শাসাইয়া বলিল,—"খবরদার! আমাদের স্পর্শ করিস্ না।"

শ্যামা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল,—"পাপমতি পিশাচ! আর অগ্রসর হ'স্-নে! তোরা নিশ্চয় জানিস্, আমাদের জীবন থাক্তে তোরা কিছুতেই আমাদের স্পর্শ ক'র্তে পার্বি না! তোরা আর একটু অগ্রসর হ'লেই আমরা কালাদীঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ ক'র্ব!"

আলিজান জিজ্ঞাসা করিল,—"মহম্মদী! এরা বলে কি?"

মহম্মদী উত্তর দিল,—"হিঁদুর মেয়েরা প্রথমে ঐ রকমই আস্ফালন করে বটে! কিন্তু শেষে ধরা পড়্লে আপনা-আপনিই পোষ মেনে যায়। আয়, আর দেরি করিস্-নে! এইটেকে আমি ধরি, ঐটেকে তুই ধর!"

এবার উভয়ে যেমন অগ্রসর, অমনি কালাদীঘির জলে ঝম্পঃপ্রদান-শব্দ উত্থিত হইল।

জল কাঁপিয়া উঠিল। তটভূমি কাঁপিয়া উঠিল। তীরস্থিত তরুরাজি কাঁপিয়া উঠিল। বৃক্ষশাখায় আবদ্ধ ঘোটকদ্বয় কাঁপিয়া উঠিল। চমকে উল্লম্ফনে তাহাদের বন্ধন ছিন্ন হইল। শব্দ শুনিয়া, জলের পানে তাকাইয়া, ভীতিবিহ্বল হইয়া, অশ্বদ্বয় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। বৃক্ষশাখে পক্ষি সকল কলরব করিয়া উঠিল। এক সঙ্গে তাহাদের পক্ষ-বিধূনন-শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে, আর বাত্যা-বিতাড়িত বৃক্ষপত্রালোড়ন-শব্দে মিলিত হইয়া, প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিল।

আলিজানের ও মহম্মদীবেগের প্রাণও দুরু-দুরু কাঁপিয়া উঠিল।

ক্ষণপূর্ব্বে যে প্রকৃতি নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিয়া ছিলেন, তিনি যেন অকস্মাৎ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিলেন। নিবাত-নিষ্কম্প বৃক্ষবল্লরী বিষম-বায়ু-প্রবাহে বিচালিত হইতে লাগিল।

এদিকে, তৃতীয়ার চাঁদ সন্ধ্যাসমাগমে জলের উপর যে একটু কিরণচ্ছটা ছড়াইতেছিলেন ;—সেটুকুও সরাইয়া লইলেন।

তখন আর বুদ্‌বুদ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। কালাদীঘির কাল-জলে আর নৈশ অন্ধকারের এক হইয়া গেল।

* * *

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

## রায়-পরিবার।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
সুখং দুঃখং মনুষ্যানাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥"

—ব্যাস-বাক্য।

মুর্শিদাবাদ হইতে হাঁটাপথে রাজসাহী পরগণায় যাইতে হইলে, পথের ধারে রূপনগরের রায়েদের বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। রায়েরা বনিয়াদী-বংশ। এককালে ঐ অঞ্চলে তাঁহারা সম্পত্তি-শালী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বে বর্গীর হাঙ্গামায় একবার তাঁহাদের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠিত হয়। সেই হইতে অবস্থা একেবারে খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। সেই হইতে বাড়ী-ঘরের আর সে শ্রীছাঁদ নাই। সেই হইতে পূজা-পার্ব্বণ বন্ধ হইয়াছে। সেই হইতে সংসারে শোক-তাপ যেন সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে।

কালীনাথ রায়,—রায়-পরিবারের যিনি লক্ষীমন্ত পুরুষ ছিলেন,—সেই হাঙ্গামায় আহত হইয়া, ইহলীলা সম্বরণ করেন। হাঙ্গামার পর দুই দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন; কিন্তু আহত হওয়ার পরই তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তির ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। হাঙ্গামায় বাধা দিতে গিয়া, তাঁহার পাঁজরার উপর তরবারির আঘাত লাগে। সেই আঘাতেই তিনি ধরাশায়ী হন। তিনি ধরাশায়ী হওয়ার পর, লুণ্ঠনকারীরা

তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। লুণ্ঠনাবশেষে তাহারা ঘরগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

কনিষ্ঠ কৃষ্ণনাথ রায় সেদিন বাড়ী ছিলেন না। পুত্র শিবনাথকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ-উপলক্ষে তিনি নাটোর গিয়াছিলেন। হাঙ্গামার দুই দিন পরে তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন—জ্যেষ্ঠ মুমূর্ষ-অবস্থাপন্ন, ঘরগুলি ভস্মসাৎ, পরিবারবর্গ পথে বসিয়া আছে। সে দৃশ্যে কৃষ্ণনাথের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে অবস্থায় মানুষ পাগল হইয়া যায়,—মানুষ আত্ম-সংবরণ করিতে পারে না। কিন্তু পুত্র শিবনাথ সেবার তাঁহার ধৈর্য্যাবলম্বনে সহায় হইয়াছিলেন। শিবনাথ পিতাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন,—"বাবা! আপনি অধৈর্য্য হ'লে আমরা দাঁড়াব কোথায়? মা দাঁড়াবেন কোথায়? জ্যেঠাই-মা দাঁড়াবেন কোথায়? শ্যামা দাঁড়াবে কোথায়? খোকা দাঁড়াবে কোথায়? যা গিয়েছে, তা তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই কি যেতে বলেন?" শিবনাথের সেই প্রবোধ-বাক্যে, পুত্র-পুত্রবধূ-কন্যা প্রভৃতির মুখ চাহিয়া, কৃষ্ণনাথ অনেক কষ্টে সেবার ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ঘরবাড়ীগুলি আবার প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে পোড়া-ঘরে চাল উঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে পোড়া ঘরের চিহ্ন যে একেবারেই লোপ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও ঠাকুর-দালানের কোঠাটিতে চূণকাম করা—তাঁহার সামর্থ্যে কুলায় নাই। সে কোঠার পোড়া কড়ি, পোড়া বরগা—তখনও অতীত-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ছিল।

কিন্তু যাউক্ সে কথা! সে অতীতের আলোচনায় এখন আর কি ফললাভ সম্ভবপর? পূর্ব্বে যে বাড়ীতে প্রত্যহ দু'বেলা এক শত লোকের পাত পড়িত, সে বাড়ীর পোষ্য-সংখ্যা এখন সবে মাত্র পাঁচটীতে দাঁড়াইয়াছে। সে পুরাতন ইতিহাস এখন উপ-কথার মধ্যে পরিগণিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সে পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রদান করিবার প্রয়াস না পাইয়া, এখন যাহা সংসারের অবস্থা, তাহারই একটু আভাস দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছি।

বলিয়াছি তো—কৃষ্ণনাথ রায়ের সংসারে এখন স্ত্রী-পুরুষে পাঁচটী মাত্র প্রাণী বিদ্যমান। স্বর্গীয় কালীনাথ রায়ের কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। সুতরাং তাঁহার পত্নী শিবানী দেব্যা এখন কাশীবাসী হইয়াছেন। কৃষ্ণনাথের স্ত্রীর নাম—মহামায়া। তাঁহার সন্তাম-সন্ততির মধ্যে দুই পুত্র ও এক কন্যা। কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে মহারাণী ভবানীর নিকট পোষ্য-পুত্র-প্রদানের চেষ্টার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম শিবনাথ। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম—তারাসুন্দরী। কৃষ্ণনাথের কন্যাও বিবাহিতা। তাঁহার নাম—শ্যামাসুন্দরী। দুই জন মুসলমান-সৈনিকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কালাদীঘির জলে সেই যে দুইটী যুবতী ঝম্প প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই রায় মহাশয়ের কন্যা ও পুত্রবধূ।

* * *

## নবম পরিচ্ছেদ।

"কোথায় গেল!"

"Where art thou, my beloved son,
Where art thou, worst to me than dead?"

—*Wordsworth.*

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল; কন্যা ও পুত্রবধূ বাড়ী ফিরিয়া আসিল না। মহামায়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পাড়া-প্রতিবাসী যাহারা কালাদীঘিতে গা ধুইতে গিয়াছিল, তাহাদের নিকট সন্ধান লইতে লাগিলেন। সকলেই ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহারা আসিল না কেন?

নিস্তারিণী দেবী সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—তিনি তাহাদিগকে ঘাটে দেখেন নাই। কিন্তু কাদম্বিনী বলিতেছেন,—"আমি সন্ধ্যার পর তাহাদিগকে ঘাটে দেখিয়া আসিয়াছি।" দুই জনে দুই রূপ বলিতেছেন! এও এক প্রহেলিকা বটে! এ সংসারে অনেক সময় অনেক ঘটনা এইরূপ প্রহেলিকাময় হইয়া উঠে।

তারা ও শ্যামা তবে কোথায় গেল? ঘাটে গিয়া কোন-দিন তাহারা তো এত দেরী করে না!

মহামায়া বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইলেন। দেখিলেন,—ঘাট হইতে গ্রামের সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে; কেবল তাহারাই আসে নাই।

তবে কি তাহাদের কোনও অমঙ্গল ঘটিল! তবে কি তাহারা বিপাকে পড়িয়া জলমগ্ন হইল?

কালাদীঘি বিস্তৃত জলাশয়। এ-কূল হইতে ও-কূলে দৃষ্টি চলে না। বর্ষাকালে অনেক সময় বন্যার জলে আর কালাদীঘির জলে এক হইয়া যায়। তখন, সময় সময় দীঘিতে হাঙ্গর-কুম্ভীরেরও উপদ্রব হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ দীঘিতে একটা গরুকে হাঙ্গরে ধরিয়াছিল বলিয়া রাষ্ট আছে।

দীঘির দক্ষিণ পাড়ে যে একটা প্রকাণ্ড বট-গাছ আছে, সকলের বিশ্বাস, সেই বট-গাছে ভূত বাস করে। তিন দিন হইল, ভূতনাথের মা সেই ভূতের দাঁত কয়েকটা দেখিতে পাইয়াছিল। হরমণির বোন-পো যে সে বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছে, হরমণি সে সম্বন্ধে অন্য কথা বিশ্বাস করে না। সে বলে,— 'কালাদীঘির ভূতে তাহার বোন্‌পোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

কালাদীঘির সম্বন্ধে আরও কত কথাই শুনা যায়।

ঐ অঞ্চলে যত বুড়া-বুড়ী আছে, গোবর্দ্ধনের ঠাকুর-মা সকলের অপেক্ষা বয়সে বড়। ঐ অঞ্চলের সকল বুড়া-বুড়ীই সে কথা এক-বাক্যে স্বীকার করে। সেই গোবর্দ্ধনের পিতামহী কালাদীঘির উৎপত্তি সম্বন্ধে সচরাচর যে কথা প্রচার করে, তাহা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সে বলে,—সে তাহার ঠাকুর-দাদার কাছে গল্প শুনিয়াছে,—ঐখানে বিক্রমাদিত্য রাজার রাজধানী ছিল। এক দিন সন্ধ্যার পর দারুণ ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হয়;—সারা-রাত্রি দুর্য্যোগ চলিয়াছিল। প্রাতঃকালে, দুর্য্যোগ থামিলে, রাজধানীতে দরবার করিতে গিয়া, গ্রামস্থ লোকে দেখিল,—সেখানে রাজধানী নাই;—রাজধানীর পরিবর্ত্তে

ঐ কালাদীঘির উৎপত্তি হইয়াছে। শুনিল,—ডাকিনীতে রাজধানী অন্য দেশে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে; রাজধানীর পরিবর্ত্তে কালাদীঘিকে ঐখানে রাখিয়া গিয়াছে।

যে কারণেই হউক, কালাদীঘি সম্বন্ধে লোকের মনে অনেক দিন হইতেই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া আছে।

কন্যা ও পুত্রবধূ এত রাত্রি পর্য্যন্ত প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায়, মহামায়ার হৃদয়ে আতঙ্ক ঘনীভূত হইয়া আসিল। যতই তিনি কন্যা ও পুত্রবধূর ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন, কালাদীঘির অতীত-স্মৃতি ততই তাঁহার মন অধিকার করিয়া বসিল। সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক, প্রতিবেশিনীগণ অনেকেই তাঁহার আতঙ্ক-বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিতে লাগিল। তিনি যে তাহাদের অনুসন্ধানের জন্য দীঘির দিকে কাহাকেও প্রেরণ করিবেন, সে সুবিধাও দেখিতে পাইলেন না।

পুত্র শিবনাথ গৃহে নাই। জামাতার দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের সংবাদ পাইয়া, জামাতাকে আনিবার জন্য, তিনি জামাতৃ-ভবনে গমন করিয়াছেন। পতি কৃষ্ণনাথ, নিমন্ত্রিত হইয়া, কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া, নাটোর-রাজধানীতে রওনা হইয়াছেন। সেখানে মহারাণী ভবানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। যদি রঘুনাথকে মহারাণীর পছন্দ হয়!—অনেকটা সেই উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণনাথ নাটোর গিয়াছেন। সুতরাং তারার ও শ্যামার কে আর সন্ধান লইবে?

হরি সর্দ্দারকে ডাকিয়া, মহামায়া অনেক করিয়া অনুরোধ করিলেন। তাহার সঙ্গে পর্য্যন্ত গমন করিয়া কন্যা ও পুত্রবধূর সন্ধান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

হরি সর্দার নিমরাজী হইয়াছিল। পাঁচু ঘোষকে সঙ্গে লইবার চেষ্টা করিতেছিল। ইতিমধ্যে জামাতৃ-সমভিব্যাহারে পুত্র শিবনাথ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অনেক দিন পরে জামাতা আসিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের সংবাদ শুনিয়া, মহামায়া যখন দারুণ দুশ্চিন্তায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেই অবস্থায় জামাতাকে লইয়া শিবনাথ গৃহে ফিরিয়াছেন। অন্য সময় হইলে, সে আনন্দের অবধি ছিল কি? কিন্তু আজ হরিষে বিষাদ উপস্থিত।

মহামায়ার জামাতা ও পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ আজ কোথায়? যে কন্যার ভাবনায় মহামায়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; জামাতার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সংবাদে যে শ্যামার ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল;—আজ তাঁহার সে শ্যামা কোথায়? তাঁহার পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রফুল্ল-কমল পুত্রবধূই বা কোথায় গেল!

জামাতৃ-সহ পুত্র শিবনাথকে সম্মুখে দেখিয়া, মহামায়ার শোকাবেগ যেন উথলিয়া উঠিল। মহামায়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহামায়ার ক্রন্দনে সকল দুঃসংবাদ জানাইয়া দিল।

শিবনাথ একে একে সকল কথা জানিতে পারিলেন। জামাতা শম্ভুনাথেরও কিছুই জানিতে বাকী রহিল না।

অবিলম্বে অনুসন্ধানের আয়োজন আরম্ভ হইল। শিবনাথ এবং শম্ভুনাথ উভয়ে লোকজন সঙ্গে লইয়া কালাদীঘির দিকে রওনা হইলেন। তারার ও শ্যামার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হইল।

শিবনাথ ও শম্ভুনাথের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামস্থ প্রায় সকলেই

কালাদীঘির দিকে গমন করিল। কাহারও হাতে মশাল, কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে সড়্‌কি; কেহ বা জাল লইল, কেহ বা ভেলার সন্ধান করিতে লাগিল। যাহারা অন্য কিছু না পাইল, তাহারা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উদ্যোগ-আয়োজনে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। কতকটা যোগাড়-যন্ত্র করিতে বিলম্ব হইল; কতকটা বা, কালাদীঘির পাড়ে রাত্রিকালে যাওয়া অবৈধ—কাহারও কাহারও মনে এবম্বিধ ধারণার উদয় হওয়ায়, তাহাদের গড়িমশিতে, সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিল। এইরূপে সকলে গিয়া কালাদীঘির তীরে যখন উপনীত হইলেন, তখন প্রভাত হইতে অতি অল্পক্ষণ বাকী ছিল।

অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। প্রভাত হইল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু কৈ—তাহারা কোথায়? তারা ও শ্যামার কোনও সন্ধানই তো পাওয়া গেল না।

যাহারা বলিল,—"ডুবিয়াছে; চব্বিশ ঘণ্টার পর ভাসিয়া উঠিবে,"—তাহারাও ক্রমশঃ হতাশ হইল। যাহারা ভূতের আশঙ্কা করিত, তাহারা মনে করিয়াছিল,—ভূতে তাহাদিগকে গাছের উপর তুলিয়া লইয়াছে। কিন্তু গাছের পানে তাকাইয়া সে চিহ্ন কেহই কিছু দেখিতে পাইল না।

মহামায়ার ক্রন্দনে গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল— "হায়! তাহারা কোথায় গেল?" শিবনাথ ও শম্ভুনাথের প্রাণের ভিতরও সেই প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল—"হায়! তাহারা কোথায় গেল?"

*

* *

## দশম পরিচ্ছেদ।

### দৈব-দুর্ব্বিপাক।

"Misfortune never comes alone."

—*Proverb.*

কে বলে—হাসির পর কান্না, কান্নার পর হাসি—সুখ-দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে? যদি তাহাই হইবে, তবে কোনও কোনও সংসার কেবলই সুখের উল্লাসে উল্লাসিত থাকিবে কেন?—আর, কোনও কোনও সংসারে কেবলই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল শুনিব কেন? যদি তাহাই হইবে, কাহারও জন্য সুখের উপর সুখের স্তূপ সজ্জিত থাকিবে কেন?—আর, কাহারও পৃষ্ঠে কষাঘাতের উপর কষাঘাত পড়িবে কেন?

কৃষ্ণনাথ রায় বড় আশায় নাটোর গিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন,—পুত্র রঘুনাথকে দত্তক প্রদান করিয়া সংসারের সকল দৈন্য-দারিদ্র্য দূর করিবেন,—আবার রায়-বংশের পূর্ব্ব-গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু বিধাতার কি বিষম চক্র! তাঁহার রঘুনাথ অনিন্দ্য-রূপ-সম্পন্ন হইয়াও মহারাণীর মন আকর্ষণ করিতে পারিল না! তিনি মনে মনে যে সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন, হরিদেব রায়ের পুত্র দত্তক মনোনীত হওয়ায়, তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

বিষণ্ণ-মনে নাটোর পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাথ যেদিন রূপনগরে যাত্রা করিলেন, সেই দিন পথি-মধ্যে হঠাৎ রঘুনাথ পীড়িত হইয়া পড়িল।

নাটোর হইতে রূপনগর দুই দিনের পথ। তাঁহারা রাত্রি

থাকিতে রওনা হইয়াছিলেন; সুতরাং এক প্রহরের মধ্যেই পদ্মার পরপারে উপনীত হইলেন।

বৈশাখ মাস। প্রচণ্ড রৌদ্র। সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। নিকটে গ্রাম-পল্লীর চিহ্ন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। ক্ষণে ক্ষণে ঘুর্ণি-বায়ু-মুখে পদ্মার বালুকা-রাশি উড্ডীন হইতেছে। এক-একবার বায়ুপ্রবাহে আগুনের ঝলক বহিয়া যাইতেছে। সে রৌদ্রে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সকলেই ছায়ার আশ্রয় লইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে। ক্কচিৎ কোথাও দুই একটী কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে লইয়া গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। ক্কচিৎ কোথাও দুই এক টুকুরা খণ্ড-মেঘ আকাশের ক্রোড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্কচিৎ কোথাও দুই একটী বিহঙ্গম গগণ-প্রান্তে উড়িয়া যাইতেছে।

গ্রীষ্মে সকলেই গলদ্‌ঘর্ম্ম। গ্রীষ্মে সকলেই শীতলতা-লাভ-প্রয়াসী। এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে, হঠাৎ কেন রঘুনাথ শীতে কাঁপিয়া উঠিল?

পিতা-পুত্র উভয়ে গো-যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রান্তরস্থিত বটবৃক্ষ-মূলে গো-যান রক্ষা করিয়া, গরু-দুটিকে খুলিয়া লইয়া, শকটবান্ তাহাদিগকে জলপান করাইতেছিল। এদিকে ভৃত্য রামদাস, আহারাদির আয়োজনে ব্যাপৃত ছিল। বৃক্ষ-মূলে রৌদ্র কাটাইয়া, বিশ্রামান্তে, অপরাহ্নে, তাঁহারা রূপ-নগরাভিমুখে রওনা হইবেন,—এইরূপ স্থির হইয়া ছিল। এমন সময় সহসা রঘুনাথ শীতে কাঁপিয়া উঠায়, কৃষ্ণনাথের প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। আহারের আয়োজন করিতে নিষেধ করিয়া, রঘুনাথের নিকটে আসিবার জন্য তিনি রামদাসকে আহ্বান করিলেন। রামদাস নিকটে আসিয়া, রঘুনাথের গায়ে হাত

দিয়া দেখিল,—রঘুনাথের গা দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। সে মনে মনে বড়ই ভয় পাইল। কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল,—"তেমন কিছুই নয়। গা'টা একটু গরম হয়েছে—দেখ্‌ছি। তা এর জন্য কোনও ভাবনা নেই। ভোর রাত্রে একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, তার পরই রোদ্দুর; এতে জোয়ান মানুষই কাবু হয়;—তা দুধের বালকের সহ্য হবে কেন?"

রামদাস প্রবোধ দিল বটে; কিন্তু কৃষ্ণনাথের মন তাহাতে আশ্বস্ত হইল না। রামদাসকে এবং গাড়োয়ানকে আহারাদি করিতে বলিয়া, তিনি রঘুনাথের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। রামদাস তাঁহাকে একটু জলযোগের জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না।

মার্ত্তণ্ডদেব যেন সারা দিন অগ্নি-বর্ষণ করিলেন। বট-বৃক্ষের ছায়াতলে অবস্থান করিয়াও, সেই প্রখর কিরণে সকলেরই দেহ ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। একে জ্বরের যাতনা, তাহার উপর রৌদ্রের উত্তাপ!—রঘুনাথ সারাদিন ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল।

দৈনন্দিন কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, ক্রমে মার্ত্তণ্ডদেব পশ্চিম-গগনে আশ্রয় লইতে চলিলেন। রৌদ্রের তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিল। পুত্রকে ক্রোড়ের মধ্যে শয়ান করাইয়া লইয়া, কৃষ্ণনাথ রায় শকটবানকে শকটচালনার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। গো-যান রূপনগরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া, রামদাস কহিল,—"দাদা ঠাকুর! দেবতার অবস্থাটা যেন কেমন কেমন বোধ হ'চ্ছে। নিকটে গ্রাম-পল্লী নেই; মাঠের মাঝখানে হয় তো বৃষ্টি হ'তে পারে!"

রামদাসের কথায় গাড়োয়ান আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, সে-ও বলিল,—"হাঁ কর্ত্তা ম'শায়! আমারও তাই মনে হ'চ্ছে বটে। এই মাঠের মাঝে এখন যদি ঝড়-বৃষ্টি আসে, বড়ই বিপদে প'ড়্‌তে হ'বে।"

এইবার কৃষ্ণনাথ রায় একবার আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন,—পশ্চিমাকাশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটী সুদীর্ঘ রজত-রেখার সম্পাত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মেঘের লক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি কহিলেন,—"মেঘ কোথায় যে, তোমরা বৃষ্টির আশঙ্কা করিতেছ? গাড়ী চালাইয়া যাও। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই আমরা এ মাঠ পার হইতে পারিব।"

রামদাস ও গাড়োয়ান আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। পুত্রের পীড়ায়—বাড়ী যাওয়ার জন্য কৃষ্ণনাথের আকুল আগ্রহ। তাহারা প্রতিবাদ করিলে, সে সময় তিনি সে প্রতিবাদে কর্ণপাত করিবেন কেন? আর প্রতিবাদ শুনিলেই বা সে মাঠে তখন আশ্রয় কোথায়—উপায় কি? কৃষ্ণনাথ ভাবিতেছেন,—'কোনও প্রকারে এখন পুত্রকে বাড়ী লইয়া যাইতে পারিলেই মঙ্গল।' তাই তিনি জোরে গাড়ী হাঁকাইবার জন্য পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—"যদি বৃষ্টিও আসে, তার মধ্যে আমরা মাঠ পার হ'তে পারব। তোমাদের কোনও ভাবনা নেই; তোমরা জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে যাও!

সে সময়ে আকাশের অবস্থা দেখিলে, বৃষ্টি হইবে কি না—বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য ছিল না। তখনও মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই; তখনও সূর্য্যরশ্মি

অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল ; তখনও বায়ু-প্রবাহে তীক্ষ্ণ উষ্ণতা অনুভূত হইতেছিল। সুতরাং বৃষ্টির আশঙ্কা কি প্রকারে সম্ভবপর ?

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আকাশের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ! পশ্চিম-গগনের সেই রজত-রেখাঙ্কিত অংশ ক্রমশঃ গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে—ক্রমশঃ বিদ্যুৎ-প্রভা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

রামদাস আবার কহিল,—"মেঘ উঠ্‌ছে ; ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার খুব সম্ভাবনা। এখনও কোথাও আশ্রয় নিতে পার্‌লে ভাল হ'ত।"

কৃষ্ণনাথ রায় আর একবার আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—পশ্চিমাকাশে কাক-ডিম্ব-সদৃশ ঘনকৃষ্ণ মেঘান্তরালে ঘনঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইতেছে। দেখিলেন,— সেই বিদ্যুচ্ছটার বিকাশে কখনও পূর্ব্ব-পশ্চিমে কখনও বা উত্তর-দক্ষিণে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণনাথ রায়ের মনে হইল,—যেন সেই অন্ধকার মেঘের মধ্যে দিগন্তগ্রাসী অনলরাশি ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

রামদাস কহিল,—"এখনই ঝড় উঠ্‌বে।"

গাড়োয়ান গাড়ী সামলাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

কৃষ্ণনাথ রায় অদূরস্থিত একটী বৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"এখন ঐ গাছতলায় নিয়ে গিয়ে গাড়ী-খানাকে রাখ্‌লে হয় না !"

গাড়োয়ান গাড়ীর মুখ ফিরাইয়া লইল।

রামদাস বলিল,—"অতদূর যা'বার দেরী সইবে না। ঐ ঝড় উঠ্‌ল।"

প্রকৃতি নিবাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধ ছিল। দেখিতে দেখিতে

প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে দিঙ্মণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ কাঁপাইয়া, পৃথিবী কাঁপাইয়া, তরু-গুল্ম-লতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া, ধূলি-পত্র উড়াইয়া, প্রবল-বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইল। মেঘের উপর মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বায়ু-প্রবাহে শন্‌শন্‌-শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুহুর্ম্মুহু গম্ভীর-নাদে মেঘ-গর্জ্জন আরম্ভ হইল।

ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি-পতন! মধ্যে মধ্যে অশনি-সম্পাত! মধ্যে মধ্যে করকা-বর্ষণ!

সে অবস্থায় সেই প্রান্তর-মধ্যে পড়িয়া, কৃষ্ণনাথ রায় কি যন্ত্রণা-ভোগ করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহাদের গো-যানের আচ্ছাদন উড়িয়া গেল। তাঁহারা সকলেই অবিশ্রান্ত বারি-বর্ষণে অভিষিক্ত হইলেন। কৃষ্ণনাথ রায় আপনার পীড়িত পুত্র রঘুনাথকে যথাসাধ্য সাবধানতার সহিত ক্রোড়ের মধ্যে বস্ত্রাচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার শরীরে বারি-পতন নিবারণ হইল না। সঙ্গে বস্ত্রাদি জিনিস-পত্র যাহা কিছু ছিল, সকলই ভিজিয়া গেল। পিতা-পুত্র উভয়েই সমভাবে বৃষ্টির জলে পরিস্নাত হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল মুষলধারে বারি-বর্ষণ হইল। তাহার পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

রাত্রি এক প্রহরের পর বৃষ্টি থামিয়া যায়;—ক্রমশঃ মেঘ অপসৃত হয়। তখন, নব-পরিণীতা বধূর অবগুণ্ঠনোন্মচনে মুখচ্ছবি-বিকাশবৎ ঘনান্তরাল-মাঝে দুই একটী নক্ষত্র কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তখন, বৃক্ষ-লতিকা-গাত্রে কোথাও কোথাও দুই চারিটী খদ্যোৎ ঝিকিমিকি জ্বলিতে থাকে। তখন,

কোথাও কোনও বৃক্ষান্তরালে বিহঙ্গমের পক্ষ-বিধূনন-শব্দ শ্রুতি-গোচর হইতে থাকে।

বৃষ্টি থামিলে, গাত্রবস্ত্র নিঙ্ড়াইয়া লইয়া, কৃষ্ণনাথ রায় পুত্রের হস্ত-পদ-গাত্র মুছাইয়া দিলেন। গাড়োয়ান পুনরায় গাড়ী চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। রামদাস উৎসাহ দিয়া বলিল,—"ঐ সম্মুখে মাধবপুর গ্রাম দেখা যাচ্ছে; মাধবপুরে পৌঁছিয়াই চৌধুরী ম'শায়দের বাড়ী থেকে কাপড় চেয়ে এনে রঘুনাথকে সুস্থ ক'র্‌ব। এ পথটুকু একটু কষ্ট ক'রে যেতে পার্‌লেই হয়।"

উপায় তো আর নাই! কৃষ্ণনাথ রায় একইভাবে পুত্রকে বক্ষের উপর ধারণ করিয়া গাড়ীর উপর বসিয়া রহিলেন। গাড়ী আবার পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইল।

যে গ্রামখানি লক্ষ্য করিয়া গো-যান চলিতে লাগিল, রামদাস ভুল বুঝিয়াছিল, সে গ্রাম মাধবপুর নয়। অন্ধকারের ঘন-ঘোরে গাড়ীর বয়েল, একটী তেমাথা পথে পথভ্রষ্ট হইয়াছিল। এক পথে যাইতে গাড়ী এখন তাই অন্য পথে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন তাহারা যে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে গ্রামে চৌধুরী মহাশয়-দিগের বাস নয়,—সে গ্রামে ফতু ডাকাইত বাস করে। যে পথে যাইতেছে বলিয়া রামদাস মনে করিয়াছিল, এখন বুঝিল—রাত্রির অন্ধকারে তাহার বিপরীত পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

গ্রামের মধ্যে গাড়ীখানি প্রবেশ করিবা-মাত্র গাড়ীর শব্দ শুনিয়া ফতু ডাকাইতের একজন অনুচর আসিয়া গাড়ী আটক করিল; বলিল,—"শালা লোক, কাঁহা যাতা হায়?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পিলপিল করিয়া পঞ্চাশ যাট জন ডাকাইত আসিয়া গাড়ী ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণনাথ রায় সকলই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা যে পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে আসিয়াছেন, এখন আর তাহা বুঝিতে একটুও বাকী রহিল না।

যাহা হউক, সেই প্রবল দস্যুদলকে বাধা দেওয়া—তাঁহাদের সাধ্যের অতীত। সুতরাং কৃষ্ণনাথ রায় বিনয়-সহকারে দস্যুদল-পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমার যা কিছু আছে, সব তোমাদের। আমাদের প্রাণে মের' না।"

রামদাস একটু রোখ্ দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণনাথ রায় তাহাকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন,—"রামদাস! এ কি ক্রোধ-প্রকাশের সময়? আমাদের কি বিপদ উপস্থিত, কিছুই বুঝিতেছ না কি?"

রামদাস এক পার্শ্বে অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। তথাপি দস্যুদল তাহার প্রতি লাঠি চালাইতে ত্রুটি করিল না। সে আর গাড়োয়ান, দুই জনে, প্রথমে দুই-একটী রূঢ় কথা বলিয়াছিল বলিয়া, উভয়েই দস্যুহস্তে উত্তম-মধ্যম প্রহার খাইল। পরিশেষে ডাকাইতেরা সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথ রায় নাটোরে গিয়া যাহা কিছু দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দস্যু কর্ত্তৃক সকলই লুণ্ঠিত হইল। রামদাসের ও গাড়োয়ানের তৈজসাদি যাহা কিছু ছিল, দস্যুদল তাহাও লুটিয়া লইয়া গেল।

দস্যুদল চলিয়া গেলে, আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া, তাঁহারা অন্যপথে যাত্রা করিলেন। তখন, মেঘাপসরণে আকাশে জ্যোৎস্নার উদয় হইয়াছিল; সুতরাং গন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে কোনই সংশয় ঘটিল না।

সারা রাত্রি চলিয়া চলিয়া, গাড়ীখানি প্রভাতে রূপনগরে বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। রঘুনাথ সারা রাত্রি কৃষ্ণনাথের ক্রোড়ের মধ্যে শুইয়া ছিল; আর কেবলই জননীর নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছিল। এখন, বাড়ী পৌঁছিয়া, ক্রোড় হইতে তাহাকে নামাইতে গিয়া, কৃষ্ণনাথ দেখিলেন,—রঘুনাথ অচৈতন্য।

কৃষ্ণনাথ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দন-ধ্বনিতে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। মহামায়াও কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিলেন। রঘুনাথের পীড়ার সংবাদ মহামায়া পূর্ব্বে কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, তারার ও শ্যামার নিরুদ্দেশ-সংবাদ শুনিয়াই বুঝি বা তাঁহার পতির শোকাবেগ উছলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নিকটে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে সে ভ্রম বিদূরিত হইল;—তাহাতে হৃদয়ে আবার এক নূতন শেল বিদ্ধ হইল।

নিকটে অগ্রসর হইয়া, মহামায়া বুঝিলেন,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে! দেখিলেন,—রঘুনাথ অচৈতন্য; আর তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বামী আর্ত্তনাদ করিতেছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া, মহামায়ার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইল। "রঘুনাথ—রঘুনাথ!" বলিতে বলিতে মহামায়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

এই সময় পিতা মাতা উভয়েরই মনে, দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল। রঘুনাথকে নাটোরে পাঠাইবার জন্য তাঁহারা যে জিদ্ করিয়াছিলেন, সেই কথাই কেবল মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাতে, অনুশোচনার তীব্র-তাপে, প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিল। জননী চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"বাবা!—বাবা!

আমিই তোমার কালস্বরূপিণী! ঐশ্বর্য্যের লোভে আমিই তোমায় বিদায় দিয়াছিলাম!” পিতাও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন,—“আমার কেন সে দুর্ম্মতি হইয়াছিল? আমি কেন তোমায় নাটোরে লইয়া গিয়াছিলাম!”

পিতা-মাতা দুই জনকেই আত্মহারা দেখিয়া, রামদাস বলিল, —“আপনারা এ কি ক’রছেন? এখনও রঘুনাথ জীবিত। আপনারা যদি এমন করেন, সে যে আতঙ্কেই মারা যাবে! ব্যারাম এমন কঠিন নয় যে, শুশ্রূষায় সারতে পারে না। আপনারা অধৈর্য্য হ’লে, কে তার শুশ্রূষা ক’রবে? আসুন, রঘুনাথকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাই; চিকিৎসার ব্যবস্থা করি; এখনই সেরে উঠবে! সারা রাত যে কষ্ট গিয়েছে, তাতে শিশুর প্রাণ কত ক্ষণ সবল থাকতে পারে?”

রঘুনাথের অবস্থা দেখিয়া, রামদাসেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া, রামদাস তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিল।

রামদাসের উৎসাহ-বাক্যে পিতা-মাতা উভয়েই কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য-ধারণ করিলেন। বুঝিলেন,—‘যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।’ সুতরাং জননী বক্ষে ধারণ করিয়া, রঘুনাথকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। বিধিমতে রঘুনাথের মূর্চ্ছাভঙ্গের ও শুশ্রূষার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত তারার ও শ্যামার সংবাদ কৃষ্ণনাথ কিছুই জানিতে পারেন নাই। এখন যখন তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনাথের সন্ধান লইতে গেলেন, তখন আর কিছুই অপ্রকাশ রহিল না। দুর্ঘটনার বিষয় সকলই শুনিলেন। শুনিলেন,—পুত্র

শিবনাথ ও জামাতা শম্ভূনাথ, তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূর সন্ধানে গিয়াছেন। এক দিকে পুত্র মুমূর্ষু-শয্যায়, অন্য দিকে কন্যা ও পুত্রবধূর নিরুদ্দেশে প্রাণ-মান-জাতি-নাশের আশঙ্কা,— কৃষ্ণনাথ রায়ের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু সে চিন্তার— সে ভাবনার তখন আর অবসর হইল না। তখন, রঘুনাথকে লইয়াই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

একে জ্বরের প্রবল বেগ, তাহার উপর আবার মুষল-ধারে বৃষ্টি-পতন! বালকের কোমল শরীরে সহ্য হইবে কেন? অনেক চেষ্টায়, অনেক যত্নে, রঘুনাথের মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইল বটে; কিন্তু এখন সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; শরীর 'সান্নিপাতিকে' সমাচ্ছন্ন; গলার ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ হইতেছে। বাক্যরোধ বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

জননী 'রঘুনাথ রঘুনাথ' বলিয়া ডাকিতেছেন। দশ বার ডাকের পর, রঘুনাথ এক এক বার মায়ের মুখপানে ছলছল নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে। যেন কত কি বলিবে বলিবে মনে করিতেছে; কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তাহার মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া জননীর বক্ষঃস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে। জননী মধ্যে মধ্যে একটু একটু দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু সহজে দুধ গলাধঃকরণ হইতেছে না। তবে নিতান্ত যখন মুখ শুকাইয়া আসিতেছে, একটু একটু গরম দুধ আঙ্গুলে করিয়া লইয়া মহামায়া পুত্রের মুখে প্রদান করিতেছেন। রঘুনাথ তাহাও গিলিতে পারিতেছে না; দুই দিকের দুই কশ বাহিয়া সে দুধ গড়াইয়া যাইতেছে।

গ্রামে এক ঘর বৈদ্যের বাস ছিল। বৈদ্যের নাম—শ্রীকান্ত

কবিরত্ন। তিনি সুচিকিৎসক বটেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই সহরে বসবাস করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন আপনা-আপনিই 'কবিচন্দ্রমণি' উপাধি গ্রহণ করিয়া, গ্রামখানিকে এখন আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছেন।

রামদাস তাঁহাকে ডাকিতে গেল। রোগীর অবস্থার বিষয় বলিল। কবিচন্দ্রমণি কিন্তু যাত্রার সময় ঠিক করিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ ধরিয়া পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করিয়া, তিনি রামদাসকে বলিয়া দিলেন,—"এ বেলা শুভ মুহূর্ত্ত নাই। জানই তো, আমি লগ্ন না দেখিয়া কখনও কোনও রোগীর চিকিসায় ব্রতী হই না। তিন প্রহরের পর, পাঁচ দণ্ডের মধ্যে, শুভ লগ্ন আছে। এখন আমি কোনও কথাই কহিতে পারিব না।"

রামদাস কতই বুঝাইল। একবার তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য,কতই কাকুতি-মিনতি করিল। কিন্তু 'কবিচন্দ্রমণি' কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু, রামদাসকে বিদায় দিয়া, তিনি বলরাম-বাটী গ্রামে চলিয়া গেলেন। সেই গ্রাম হইতে একটী রোগীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।

রামদাস বিষণ্ণ-মনে ফিরিয়া আসিল। কৃষ্ণনাথ বুঝিলেন,—সকলই অদৃষ্টের ফের! তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"রামদাস! গোবর্দ্ধনের প্রতি আমার তেমন আস্থাও ছিল না। উহার পিতা কবিরত্ন মহাশয় যদি বাড়ী থাকিতেন, আমি গিয়া, যেমন করিয়া হউক, তাঁহাকে লইয়া আসিতাম। তা' যাক! তোমরা রঘুনাথকে নিয়ে থাক। আমি এখনই সহরে রওনা হইতেছি। যেমন করিয়া পারি, বৈকালে কবিরত্ন মহাশয়কে লইয়া আসিব।"

কৃষ্ণনাথ রায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই দণ্ডেই মুর্শিদাবাদ রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামদাস বাধা দিয়া বলিতে গেল,—"কাল সারাদিন অনাহারে আছেন; আপনি না গিয়ে, আমি গেলে হ'ত না?"

কৃষ্ণনাথ উত্তর দিলেন,—"না, রামদাস! তুমি বোঝ না! আমি না গেলে, তিনিও ওজোর ক'রে না আস্‌তে পারেন!"

রামদাস বলিল,—"যাবেনই যদি, তবে হাতে-মুখে একটু জল দিয়ে যান!"

কৃষ্ণনাথ।—"হাতে-মুখে জল দেবার সময় কি আর আছে, রামদাস! যদি কখনও দিন পাই, আমার রঘুনাথকে বাঁচাতে পারি, আবার হাতে-মুখে জল দেব। নচেৎ, নাওয়া-খাওয়া আমার এই পর্য্যন্ত!"

কৃষ্ণনাথ কাহারও আপত্তি শুনিলেন না,—কোনও বাধাই মানিলেন না। সেই অবস্থায়, সেই ভাবেই তিনি মুর্শিদাবাদে রওনা হইলেন। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র তাঁহার মস্তকের উপর অগ্নি-বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিলেন। তবে যাইবার সময় রামদাসকে আর একবার বলিয়া গেলেন,—"রামদাস! তুমি রইলে। আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি এক দণ্ড রঘুনাথের কাছ-ছাড়া হ'য়ো না!"

কৃষ্ণনাথ চলিয়া গেলেন। এদিকে রৌদ্রের উত্তাপ যতই বাড়িতে লাগিল, রঘুনাথের শরীরের উত্তাপও আবার বৃদ্ধি পাইল। রঘুনাথ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

* * *

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### ফুরাইল।

"Like the caged bird escaping suddenly,
The little innocent soul flitted away"
—*Tennyson.*

দিবা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ-প্রায়। কৃষ্ণনাথ রায় মুর্শিদাবাদে শ্রীকান্ত কবিরাজের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত; অবিরল স্বেদ-নির্গমে শরীর অভিষিক্ত। হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি যখন শ্রীকান্ত কবিরত্ন মহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত, কবিরাজ মহাশয় তখন আহারান্তে তাকিয়ায় দেহ বিন্যস্ত করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। সেই রৌদ্রে, সেই অবস্থায়, রায় মহাশয়কে সহসা সম্মুখে দেখিয়া, শ্রীকান্ত কবিরত্ন আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পদধূলি-গ্রহণ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"রায় মহাশয়! আসুন—আসুন! আপনার শুভাগমন এমন সময় কোথা থেকে হ'ল!"

কৃষ্ণনাথ রায় আকুল-চিত্তে কহিলেন,—"বড় বিপদ! আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

কবিরাজ মহাশয় বুঝিলেন,—ব্রাহ্মণের তখনও স্নানাহার হয় নাই। বুঝিলেন,—নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াই ব্রাহ্মণ অনাহারে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। মনে মনে ভাবিলেন,—কৌশলে স্নানাহার করাইয়া অগ্রে ব্রাহ্মণের শ্রান্তিদূর করা বিধেয়। তাই প্রকাশ্যে কহিলেন,—"তা বেশ—আপনার

কোনও চিন্তা নাই—আমি এখনই আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আপনি যত শীঘ্র পারেন, গঙ্গা থেকে স্নান ক'রে আসুন। সামান্য একটু জলযোগের পরই রওনা হওয়া যাবে এখন।"

কৃষ্ণনাথ কহিলেন,—"আমার স্নানাহারের আবশ্যক নাই। আপনি অনুগ্রহ ক'রে এখনই রওনা হ'ন—এই আমার ইচ্ছা। আমার রঘুনাথকে আমি যে অবস্থায় রেখে এসেছি, আমার এক দণ্ড আর বিলম্ব সইছে না।"

কবিরাজ মহাশয় কহিলেন,—"আমি বিলম্ব ক'র্‌তে ব'ল্‌ছি না। এখনই আমরা রওনা হ'ব; সেজন্ত আপনার কোনও ভাবনা নাই। তবে কি না, এত বেলা পর্য্যন্ত আপনি জলগ্রহণ করেন নাই; তাই আপনাকে সামান্য একটু জল খাইয়ে নিয়ে, এখনি আমি আপনার সঙ্গে রওনা হ'চ্ছি।"

কৃষ্ণনাথ।—"আপনি মাপ ক'র্‌বেন—আমি আর স্নানাহার ক'র্‌ব না। যদি আপনার যাওয়া হয়, আমার সঙ্গে এখনি আসুন। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে!"

রঘুনাথের পীড়ার বিষয় কবিরাজ মহাশয় সকলই বুঝিতে পারিলেন। কৃষ্ণনাথ রায় রোগের অবস্থা কিছু কিছু বিবৃত করিলেন। তাঁহার সঙ্গে রূপনগরে রওনা হওয়ার বিষয়ে, কবিরাজ মহাশয়ের মনে আদৌ কোনও সংশয়-প্রশ্ন উঠিল না। অধিকন্তু রায় মহাশয়ের কাকুতি-মিনতি দেখিয়া, লজ্জিত হইয়া, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন,—"আপনি ও-সব কথা কি ব'ল্‌ছেন? আপনাদের খেয়েই আমরা মানুষ। আপনার পিতামহ হরশঙ্কর রায় আমার পিতাকে যে অবস্থায় রূপনগরে এনে বাস করিয়েছিলেন, সে কথা আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না।

আমিও তো আপনাদের খেয়েই মানুষ হ'য়েছি। আপনাদের আশীর্ব্বাদে কয় বৎসর হ'ল আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। তা-না-হ'লে, হয় তো এখনও আমায় আপনাদেরই গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌তে হ'ত। আপনি নিজে এসেছেন, এর উপর আর কি কোনও কথা আছে? যদি পথের লোকের কাছেও আপনার পুত্রের পীড়ার সংবাদ পেতাম, আমি আপনা-আপনিই তদ্দণ্ডে রূপনগরে যাত্রা ক'র্‌তাম। স্নান কর্‌তে বা একটু জল খেয়ে নিতে আপনার যে বেশী দেরী হবে, আপনি তা ভাব্‌বেন না। আমি দু'খানা পাল্কীর বন্দোবস্ত ক'র্‌ছি। দু'জনে সাঁ সাঁ ক'রে গিয়ে পৌঁছাব—এখনি। ঔষধ-পত্র গুছিয়ে নিতেও তো একটু দেরী হবে।"

এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় আপনার গদাই-মাধাই দুই ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন। গদাই-মাধাই নিকটেই উপস্থিত হইল। রায় মহাশয়কে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য তিনি গদাইকে আদেশ করিলেন। মাধাই পাল্কী-বেহারার বন্দোবস্তের জন্য আদিষ্ট হইল।

কৃষ্ণনাথ রায়, কবিরাজ মহাশয়ের কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন। কবিরাজ মহাশয়ও ছাড়িবার পাত্র নহেন। সুতরাং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও রায় মহাশয়কে স্নান করিতে যাইতে হইল। রায় মহাশয় একবার বলিতে গেলেন,—"দু'খানা পাল্কীর দরকার নেই—আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পার্‌ব।" কিন্তু কবিরাজ মহাশয় তাহাতে উত্তর দিলেন,—"আপনি সে কি কথা বলেন? আপনি হেঁটে যাবেন, আর আমি পাল্কীতে যাব? শ্রীকান্ত কবিরাজ কি এতই মনুষ্যত্ব-হীন?"

কৃষ্ণনাথ রায় সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন-প্রান্তে জলধারার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, —"হায়! এই মহানুভবের পুত্রই কি সেই গোবর্দ্ধন! এমন মানুষেরও তেমন পুত্র হয়!"

দণ্ডেকের মধ্যেই সকল বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। দণ্ডেকের মধ্যেই কবিরাজ মহাশয় জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়া দিলেন। দণ্ডেকের মধ্যেই কৃষ্ণনাথ রায় গঙ্গাস্নান করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক আহ্নিকাদি সারিয়া আসিলেন।

কবিরাজ মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, কৃষ্ণনাথ রায়কে কিছু কিছু ফল-মূল খাইতে হইল। জলযোগের পর, দুই জনে দুই খানি পাল্কীতে চড়িয়া রূপনগর অভিমুখে রওনা হইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা রূপনগরে পৌঁছিতে পারিবেন,— বেহারারাও জোর করিয়া বলিল।

* * * *

ক্রমে বেলা অবসান হইল। সূর্য্যের উত্তাপ কমিয়া আসিল স্নিগ্ধসমীরসঞ্চারে রঘুনাথের গাত্রের উত্তাপ কমিয়া আসিবে বলিয়া আশার সঞ্চার হইল। এদিকে কৃষ্ণনাথের প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। তাই মহামায়া, এক একবার পথ-পানে চাহিয়া, রামদাসকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, —"কৈ রামদাস! তিনি তো কৈ এখনও এলেন না! এখনও কি তাঁর আস্‌বার সময় হয়-নি?"

মহামায়ার ব্যাকুলতা-দর্শনে রামদাস সান্ত্বনা-বাক্যে কহিল, —"এখনই তিনি এলেন ব'লে! দারুণ রোদ্দুর; তাই বোধ হয় আসতে একটু দেরী হ'চ্ছে!"

এই বলিয়া, রঘুনাথের গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া, রামদাস কহিল,—"এই তো গা একটু একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে আস্‌ছে। একটু একটু ঘামও হ'চ্ছে। এইবার ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়ে যাবে। আপনি ব্যস্ত হ'বেন না। জ্বরটা ছাড়লেই রঘুনাথ্ সুস্থ হবে।"

কিন্তু মায়ের প্রাণ—প্রবোধ মানিল না; মহামায়া বলিলেন,—"রামদাস! তুমি একটু এগিয়ে দেখ-না কেন?"

রঘুনাথের গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া, রামদাস মনে মনে বুঝিয়াছিল—তখন আর অন্যত্র গমন কর্ত্তব্য নয়। তাই সে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু সে একবার বাহিরে যাইলে, মহামায়ার প্রাণ আশ্বস্ত হয়,—তাই সে বাটীর বাহিরে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে গেল। বাহিরে গমন করিতেই সহসা আকাশের পানে তাহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। রামদাস দেখিল,—ঠিক পূর্ব্ব-দিনের ন্যায় পশ্চিম-গগনে এক খণ্ড মেঘের উদয় হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিল,—'গত কল্যকার ন্যায় আজিও ঝড়ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা; একটু পরেই ঝড় উঠিবে, একটু পরেই বৃষ্টি আসিবে।' তাই সে বাড়ীর দিকে আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া, মহামায়াকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—"চিন্তার কোনও কারণ নাই। তাঁরা এলেন ব'লে!"

রঘুনাথের গাত্র হইতে এই সময় অবিরাম ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হইতেছিল। রামদাস তাই আর এক বার রঘুনাথের গাত্রে হস্ত-প্রদান করিয়া দেখিল। কিন্তু দেখিয়া যাহা বুঝিল, তাহাতে তাহার আশঙ্কা বড়ই বৃদ্ধি পাইল। সে দেখিল,—এক দিকে গা দিয়া গল্‌গল্ করিয়া ঘাম বাহির হইতেছে, অন্য দিকে রঘুনাথের হাত-পা শীতল হইয়া আসিতেছে। মহামায়ার

নিকট যদিও সে কোনরূপ আশঙ্কার ভাব প্রকাশ করিল না, কিন্তু মনে মনে বড়ই শঙ্কা-বোধ করিল। এক বার তাহার মনে হইল,—'রঘুনাথের হাতে-পায়ে সেক দিতে আরম্ভ করি।' পরক্ষণেই আবার মনে হইল,—'পাড়ার কোনও প্রবীণ ব্যক্তিকে ডাঁকিয়া আনি।' এই মনে করিয়া, রামদাস কহিল,—"আমি আর এক বার এগিয়ে দেখি,—তাঁরা কত দূরে আস্‌ছেন!" মহামায়ারও ইচ্ছা, রামদাস আর একবার পথে গিয়া দেখিয়া আসে—তাঁহারা কত দূরে আসিতেছেন।

এই সময় মেঘ একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়া ছিল। মেঘের অবস্থা দেখিয়া, পাড়ার দুই একটী স্ত্রীলোক—যাহারা রঘুনাথকে দেখিতে আসিয়াছিল—প্রায়ই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। কেবল নিস্তারের মা, রামদাসের অনুরোধে এতক্ষণ উঠিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু এইবার, রামদাস বাহিরে যাওয়ায়, সে-ও উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"কেমন মেঘ মেঘ ক'র্‌ছে। ঘুঁটেগুলো বাইরে প'ড়ে আছে; সেগুলোকে সাম্‌লে রেখে, একটু পরে আমি আস্‌ছি।" মহামায়া অনিমিষ-নয়নে একাগ্র-চিত্তে পুত্র রঘুনাথের মুখপানে চাহিয়া ছিলেন। নিস্তারের মা, কি বলিল বা না বলিল—সেদিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল না। নিস্তারের মা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রামদাসও বাহিরে গিয়াছে। নিস্তারের মাও চলিয়া গেল। মহামায়া একইভাবে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

সহসা বিষম ঝটিকা উত্থিত হইল। প্রবল বেগে মেঘসমূহ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। ঘনঘন বিদ্যুচ্চমকে অশনিসম্পাতে ধরণী কাঁপিয়া উঠিল।

"কড় কুড় কড়!"- বিদ্যুচ্চমকের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিয়া বজ্রধ্বনি ধ্বনিত হইল। বিদ্যুৎ-শিখায় চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল। বজ্রধ্বনিতে গৃহ কাঁপিয়া উঠিল। শয্যা কাঁপিল। রঘুনাথ কাঁপিল। মহামায়া কাঁপিলেন।

দারুণ ত্রাসে বিকট স্বরে 'মা' বলিয়া রঘুনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ভয় কি—ভয় কি বাবা! এই যে আমি!"—এই বলিয়া মহামায়া রঘুনাথকে বক্ষমধ্যে টানিয়া লইলেন।

কিন্তু হায়! সেই শেষ! সেই 'মা'-বুলিই রঘুনাথের শেষ বুলি!

'মা' বলিয়াই রঘুনাথ উঠিয়া বসিল। জননী শশব্যস্তে হস্তপ্রসারণ করিলেন। রঘুনাথ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় জননীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। আর চক্ষের পলক পড়িল না। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার অন্তিম-দীপ্তির ন্যায়, একবার উঠিয়া—একবার মা বলিয়া ডাকিয়াই, রঘুনাথ চৈতন্যহারা হইল।

ফুরাইল—সকলই ফুরাইল—জনমের মত সব শেষ হইল!

জননী চাহিয়া দেখিলেন,—রঘুনাথের আর সাড়া-শব্দ নাই। দেখিলেন,—চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। দেখিলেন,—মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। দেখিলেন,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মার প্রাণ বুঝিল না। মহামায়া 'রঘুনাথ—রঘুনাথ' 'বাবা—বাবা' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

কোথায় রঘুনাথ?—কে উত্তর দিবে? এ যে কেবল পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে! প্রাণপাখী পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া পলাইয়াছে!

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

## অশ্রু-জল।

"There is a tear for all that die.
A mourner over the humblest grave."

—*Byron.*

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মুষল-ধারে বৃষ্টি-পতন হইল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন রহিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই ঘরের বাহির হইতে পারিল না।

সেই দুর্য্যোগে, সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, রামদাস মহেশ-মণ্ডলকে ডাকিয়া আনিল। মহেশ-মণ্ডল হাত দেখিতে জানে,—তাহার নাড়ীজ্ঞান চমৎকার! সেই বিশ্বাস-বশে রামদাস তাহাকে বৃষ্টিতে ভিজাইয়া ভিজাইয়াও লইয়া আসিল-বৃষ্টি বলিয়া মহেশও অবশ্য কোনও আপত্তি করিল না।

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াই রামদাস দেখিল—সর্ব্বনাশ হইয়াছে!—রামদাস যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে! রামদাস দেখিল,—মৃত-পুত্র ক্রোড়ে লইয়া মহামায়া আকুলি-ব্যাকুলি ক্রন্দন করিতেছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া, রামদাসও অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিল না। মহামায়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামদাস কাঁদিতে লাগিল। মহেশ-মণ্ডলের চক্ষেও অশ্রুধারা বিনির্গত হইল।

অনেক ক্ষণ কাটিয়া গেল। ক্রন্দনের রোলে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইল। দেখিতে দেখিতে পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই আসিয়া কৃষ্ণনাথ রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কেহ বা কান্নায় কান্না মিশাইলেন। কেহ বা মহামায়াকে

সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা পাইলেন। কেহ বা শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কেহ বা কৃষ্ণনাথ রায়ের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিলেন।

ঝড়বৃষ্টি-দুর্য্যোগে কৃষ্ণনাথ রায় যথাসময়ে কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া গ্রামে পৌঁছিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহাদের গ্রামে পৌঁছিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেও তাঁহাদের আসা, ঘটিয়া উঠিল না। দুর্য্যোগের সময় বাহকগণ পাল্কী বহন করিতে না পারায়, বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত, [illegible] পথে অবস্থান করিতে হইল। পথে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, কৃষ্ণনাথের প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কত দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু কি করিবেন?—উপায় নাই!—বিধাতা বাম! তাঁহার দেহ পাল্কীর মধ্যে পড়িয়া রহিল বটে; কিন্তু মন রূপনগরে রঘুনাথের নিকট চলিয়া গেল।

দুর্য্যোগ থামিলে, কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া, কৃষ্ণনাথ রায় যখন গ্রামে পৌঁছিলেন, দূর হইতে ক্রন্দন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই ক্রন্দন-ধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র, তাঁহার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তখনও একেবারে হতাশ হইতে পারিলেন না। কখনও মনে হইল,—'উহা ক্রন্দনের স্বর নহে।' কখনও মনে হইল,—'ও স্বর অন্য কোথা হইতে আসিতেছে।'

কবিরাজ-সহ কৃষ্ণনাথ রায় বাড়ী পৌঁছিলেন! কৃষ্ণনাথের প্রাণভরা আশা—শ্রীকান্ত কবিরত্নকে একবার দেখাইতে পারিলেই তাঁহার রঘুনাথ সারিয়া উঠিবে। কিন্তু হায়! এখন

কোথায় রঘুনাথ ?—কবিরাজ মহাশয় কাহার চিকিৎসা করিবেন? বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণনাথের কিছুই আর বুঝিতে বাকী রহিল না। মহামায়ার ক্রন্দনের স্বর কর্ণরন্ধ্রে বজ্রধ্বনিবৎ প্রবিষ্ট হইল। পাড়া-প্রতিবাসীর হাহাকারে প্রাণ বিচলিত করিয়া তুলিল। পাল্কী হইতে নামিয়া, 'রঘুনাথ—রঘুনাথ' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণনাথ রায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করার আর আবশ্যকতা বুঝিলেন না। বাহিরে দাঁড়াইয়াই প্রতিবাসীদিগের নিকট দুঃসংবাদের বিষয় সকলই জানিতে পারিলেন।

কৃষ্ণনাথ রায় অন্দরে প্রবেশ করিবা-মাত্র, তাঁহাকে দেখিয়া, মহামায়ার শোক-সমুদ্র আরও উথলিয়া উঠিল। মহামায়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন,—"এসেছ! এসেছ! তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের লোভে আমার সোণার মানিককে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছ!" কৃষ্ণনাথ রায় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"কৈ—কৈ রঘুনাথ!" মহামায়া উন্মাদিনীর ন্যায় উত্তর দিল,—"এতক্ষণ আস্‌তে পার্‌লে না! রঘুনাথ যে চলে গেল! রঘুনাথ—রঘুনাথ!"

পতি-পত্নী দুইজনে রঘুনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া 'রঘুনাথ—রঘুনাথ' বলিয়া, ক্রন্দনে গগন কাঁপাইয়া তুলিলেন। কৃষ্ণনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"রঘুনাথ! রঘুনাথ! ওঠ বাবা—একবার ওঠ! তোমার জন্য আমি যে মুর্শিদাবাদ থেকে কবিরাজ নিয়ে এসেছি!"

অশ্রুজলে উভয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

* * *

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### ভবানী-পূজা।

বড় আনন্দ উদয়।
শঙ্খ-ঘণ্টা-রব, মহা-মহোৎসব,
ত্রিভুবনে জয় জয়॥

—ভারতচন্দ্র।

একদিকে অন্ধকার, অন্য দিকে আলোক-মালা। একদিকে হাহাকার, অন্য দিকে আনন্দের লহরী-লীলা। বিধির কি বিচিত্র বিধান!

এক দিকে বিটপীর শুষ্ক-পত্র ঝরিয়া পড়িতেছে, অন্য দিকে বিটপী নবকিশলয়ে পুষ্প-পরাগে প্রফুল্লিত হইতেছে। এক দিকে প্রাবৃটাপগমে নদী শীর্ণতোয় বালুকঙ্করসার হইয়া পড়িতেছে; অন্যদিকে ভাদ্রের ভরা যৌবনে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত তরঙ্গ-ভঙ্গে সে অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। কিবা প্রকৃতি-পটে, কিবা সংসার-নাট্যমঞ্চে উভয়ত্র এই দৃশ্য পরিদৃশ্যমান!

এক দিকে রূপ-নগরে আকাশ ব্যাপিয়া হাঁহাকার-ধ্বনি সমুত্থিত; অন্য দিকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ-উপলক্ষে নাটোর-রাজধানীতে জনসাধারণ মহা-মহোৎসবে উন্মত্ত। কেবল নাটোর-রাজধানীতে নহে;—সেই মহোৎসবে আজি ভবানী মন্দিরেও অপূর্ব্ব সমারোহ-ব্যাপার উপস্থিত।

ভবানীপুরে—মা ভবানী।

Printed by K. V. Seyne & Bros.
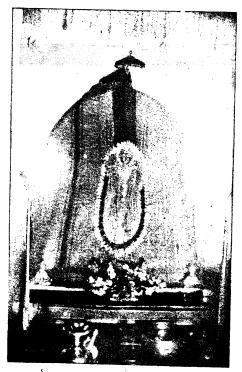
নাটোর রাজধানী হইতে প্রায় আঠার ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে—ভবানীপুরে ভবানী-মন্দির অবস্থিত।

ভবানীপুর পীঠস্থান। উত্তরবঙ্গে করতোয়া নদীর তীরে—যেখানে সতীর গুল্‌ফ পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানই এখন ভবানীপুর। ভবানীপুরের পীঠস্থানে ভবানী-মন্দিরে দেবীর অধিষ্ঠান।

ভবানীপুরে ভবানী-মন্দিরে মহারাণী ভবানী ভবানীর পূজা দিতে আসিয়াছেন। তাঁহার [illegible] ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়ছে; সেই উপলক্ষেই এই পূজার আয়োজন। আজি পোষ্যপুত্র-সহ মহারাণী ভবানীপুরে উপস্থিত। রাজপরিবারভুক্ত প্রায় সকলেই আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। দেশ-দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন।

পরিখা-পরিবেষ্টিত পুরীর মধ্যে দক্ষিণদ্বারী মন্দির। বিবিধ-কারুকার্য্যসমন্বিত সেই মন্দির-মধ্যে জগন্মাতা অধিষ্ঠিতা। মন্দিরের পার্শ্বে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, ভবানীশ্বর, হরেশ্বর প্রভৃতি মহাদেবের অধিষ্ঠান। মন্দিরের পশ্চাতে, উত্তরের দিকে, ভোগের দালান; তাহারই পূর্ব্বভাগে রাজ-প্রাসাদ। মায়ের পূজা দিতে আসিয়া, মরারাণী সেই প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছেন।

মহামায়ার এই মন্দিরের পূর্ব্বভাগে বিল্ব-বৃক্ষমূলে এবং পশ্চিম-ভাগে বট-বৃক্ষমূলে সাধকদিগের সাধনার স্থান। সেখানে সর্ব্বদা সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সমাগম হয়। সেখানে সর্ব্বদা হোমকুণ্ড জ্বলিতেছে। সেখানে সর্ব্বদা তত্ত্ব-কথার আলোচনা চলিয়াছে। সেখানে সন্ন্যাসিগণ, কেহ বা চক্ষু মুদিয়া ধ্যান-মগ্ন রহিয়াছেন, কেহ বা হোমাগ্নিতে আহুতি দিতেছেন, কেহ বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ইষ্টনাম জপ করিতেছেন, কেহ বা শাস্ত্র-কথা

শুনাইতেছেন। মহামায়ার পীঠস্থান বলিয়া এখানে দূর-দূরান্তর হইতে সাধকগণের সমাগত হন।

পোষ্যপুত্র-গ্রহণ উপলক্ষে ভবানী-মন্দিরে মহারাণী পূজা দিতে আসিয়াছেন বলিয়া, ভবানীপুরে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। কেহ পূজা দিতে আসিয়াছে। কেহ পূজা দেখিতে আসিয়াছে। কেহ ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে। কেহ রঙ্-তামাসা দেখিতে আসিয়াছে। কেহ দোকান-পাট সাজাইয়া বসিয়াছে। কেহ কেনা-বেচা করিতে আসিয়াছে।

ভবানীপুরে যেন একটী মেলা বসিয়া গিয়াছে। ভবানীপুর নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে।

প্রভাতে বাল্যভোগের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে মন্দির-প্রাঙ্গণ সহস্র সহস্র নর-নারীতে পরিপূর্ণ হইল।

সে এক অপরূপ দৃশ্য! এক সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে 'জয় মা ভবানী' ধ্বনি উত্থিত হইল; এক সঙ্গে অগণিত শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; এক সঙ্গে শত শত ঢক্কা-নিনাদে ভবানীপুরী প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। মস্তকে জটাভারসমন্বিত আবক্ষশ্বেতশ্মশ্রু-বিলম্বিত পট্টবস্ত্রপরিহিত তপ্তকাঞ্চনপ্রভ সেই রাজপুরোহিত যখন আরতি আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য-নিনাদে পুরী মুখরিত হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র নরনারী বদ্ধাঞ্জলি-সহকারে ভক্তি-প্লুত-প্রাণে নির্নিমেষ-নয়নে মহামায়ার মুখপানে চাহিয়া রহিল;—সে এক অপরূপ দৃশ্য! তখন মনে হইতে লাগিল, যেন মহাযোগী মহেশ্বর স্বয়ং পুরোহিত-বেশে আবির্ভূত হইয়া লোক-সমক্ষে মহামায়ার পূজা-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

আরতি শেষ হইল। বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল। সমবেত

নরনারী সকলেই সাষ্টাঙ্গে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিল। অবশেষে আবার সকলে সমস্বরে 'জয় মা ভবানী' রবে পুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

মায়ের বাল্য-ভোগ—নিরামিষ; চিড়া, দই, গুড়, মুড়কি, ক্ষীর, সন্দেশ, কলা, পান, গুপারি ইত্যাদি। এই বাল্য-ভোগ দর্শন করিলে মনে হয়—মা যেন পরমা বৈষ্ণবী।

কিন্তু মধ্যাহ্নে এ আবার কি দেখি! মায়ের স্নানের পর যখন মধ্যাহ্ন-পূজা আরম্ভ হইল, তখনও সেই বাদ্য, সেই লোক-সমাগম, সেই জন-কোলাহল! অন্যান্য আয়োজন সকলই প্রাতঃ-কালের ন্যায়; কিন্তু পূজার এ কি বিপরীত আয়োজন! এখন সারি-সারি যূপ-কাষ্ঠ; আর তাহার পার্শ্বে শত শত ছাগ, মেষ, মহিষ—বলির জন্য প্রস্তুত। সেগুলিকে সবে মাত্র স্নান করান হইয়াছে; তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিতেছে।

এই মধ্যাহ্ন-পূজার পুরোহিত স্বতন্ত্র, পূজোপকরণ স্বতন্ত্র, ভোগের আয়োজন স্বতন্ত্র। পুরোহিতের পরিধানে রক্তাম্বর, ললাটে রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, বাহুদ্বয়ে রক্ত-চন্দনের অনু-লেপন। সিন্দূর-বিলেপিত উৎসর্গীকৃত খড়্গসহ মন্দিরের বাহিরে আসিয়া তিনি বলিদান উৎসর্গ করিলেন। মন্ত্রঃপূত খড়্গ ছেদকের হস্তে অর্পিত হইল।

বলিদানের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার ঢক্কা-নিনাদে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনিতে পুরী প্রকম্পিত হইতে লাগিল। বলিদানের ছাগ, মেষ, মহিষ—যথাক্রমে যূপকাষ্ঠে সংবদ্ধ হইল। তাহাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন, সেই মন্ত্রঃপূত খড়্গ গ্রহণ করিয়া, ছেদক একে একে বলি-কার্য্য সম্পন্ন

করিল। বলিদানের রক্তস্রোতে ভবানীর প্রাঙ্গণ ভাসমান হইল। বলিদানান্তে অনেকে সেই রক্ত মাখিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। মায়ের মধ্যাহ্ন-পূজা সমাপন হইল।

প্রভাতে বাল্য-ভোগে যাঁহাকে পরমা বৈষ্ণবী বলিয়া মনে হইতেছিল, মধ্যাহ্নে মায়ের সে ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। ভাবুক ভক্ত! ভাব দেখি.—মা কোন্ ভাবে কখন অবস্থিতি করেন?

মহামায়ার পূজার সময়. পোষ্য-পুত্রকে পার্শ্বে বসাইয়া মহারাণী ভবানী গললগ্নীকৃতবাসে মার নিকট মঙ্গল-প্রার্থন করিতেছিলেন। এত গণ্ডগোল, এত বাদ্যধ্বনি, এত কোলাহল, —কিছুই যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। তিনি যেন তন্ময় হইয়া মার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, —"মা মঙ্গলময়ী! জগতের মঙ্গল-বিধান কর মা!"

পোষ্য-পুত্র—কুমার রামকৃষ্ণ!—তিনি মাতার পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন বটে; মাতার ন্যায় একাগ্রচিত্তে মহামায়ার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন বটে; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাণ বিচলিত হইতেছিল। বলিদানের সময় যখন তিনি দেখিলেন,— বলিদানের ছাগাদি পশুগণ প্রাণভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর তাহাদের সেই আর্ত্তনাদে কেহই কর্ণপাত করিতেছে না, পরন্তু মায়ের সম্মুখে তাহাদের মুণ্ডচ্ছেদ হইতেছে; তখন আর তিনি কোনক্রমে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবেগ-ভরে চীৎকার করিয়া মাতা ভবানীকে ডাকিয়া কহিলেন,— "মা! এ কি নৃশংস ব্যাপার! মায়ের পূজায় কেন এত প্রাণীর প্রাণনাশ হয়?"

তন্ময়-চিত্ত ভবানীর কর্ণে কুমারের সেই উচ্চ চীৎকারও

বুঝি প্রবেশ করিল না! মহারাণী কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, কুমারকে সম্বোধন করিয়া পুরোহিত কহিলেন,—"কুমার! এ বলিদানে নৃশংসতা কোথায় দেখিলেন? বলিদানে পশুগণের জীবন সার্থক হইল। বলিদানে—বন্ধন-মোচন!"

"বন্ধন-মোচন!"—কুমার শিহরিয়া উঠিলেন। কত অতীত-স্মৃতি তাঁহার মানস-পটে জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িল,—সন্ন্যাসীর কথা! মনে পড়িল—পাখীর বন্ধন-মোচনের কথা! মনে পড়িল,—বন্ধন-মোচনে আপনার প্রতিজ্ঞার কথা!

* * *

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

## সংশয়-প্রশ্ন।

"এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হরিদেব রায়ের পুত্র গোপাল, মহারাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র মনোনীত হইয়াছেন। তিনিই এখন—কুমার রামকৃষ্ণ।

নাটোর-যাত্রার সময় হরিদেব রায় শান্তিদেবীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গোপালকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় নাই। ত্র্যধিক শত-সংখ্যক বালকের মধ্যে গোপাল মহারাণীর পোষ্যপুত্র মনোনীত হয়। তখন, অর্থের লোভে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মোহে, পত্নীর নিকট প্রতিজ্ঞার কথা হরিদেব রায় একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। গোপালকে দত্তক দিয়া মহারাণীর নিকট আটগ্রাম পুরস্কার পাইয়া, সেই আনন্দেই তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। শান্তিদেবীকে যে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, সে ভাবনা তখন আদৌ তাঁহার মনে উদয় হয় না। আজি প্রায় এক মাস অতীত হইল, তিনি গোপালকে নাটোরে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই হইতে গোপাল, আর গোপাল নাই; গোপাল—রামকৃষ্ণ-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভবানী-মন্দিরে বলিদান-প্রসঙ্গে পুরোহিতের উত্তর শুনিয়া, কুমার রামকৃষ্ণ কেমন যেন অন্যমনা হইয়াছেন। রাজধানীতে আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত তিনি আদরের, সোহাগের, আনন্দের

নূতন নূতন লহরে ভাসমান হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে তাঁহার সকল ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। এখন তিনি কেবলই নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করেন ;—নির্জ্জনে বসিয়া নির্জ্জন-চিন্তায় কালাতিপাতে তাঁহার আনন্দ অনুভব হয়।

কুমার কি ভাবেন ?—কি চিন্তা করেন ? সুখৈশ্বর্য্য-পালিত দশমবর্ষীয় বালকের চিন্তার কারণ আবার কি থাকিতে পারে?

কুমারের এইরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্যের প্রতি অল্প দিনের মধ্যেই মহারাণী ভবানীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এক দিন নিভৃতে বসিয়া পাগলের ন্যায় কুমার আপন মনে কি বলিতেছেন; কুমারকে তদবস্থ দেখিয়া, অন্তরালে দাঁড়াইয়া, কুমার কি বলে —তাহা শুনিবার জন্য, মহারাণী চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং নিকটস্থ হইয়া স্নেহ-সম্ভাষে কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি একলা ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছ বাবা? এখানে এসে তোমার কি কোন কষ্ট হ'য়েছে?"

কুমার বিনীত-স্বরে উত্তর দিলেন,—"না—মা। আমার তো কোনও কষ্ট হয়-নি!"

ভবানী।—"তবে তুমি সর্ব্বদাই অমন ক'রে ব'সে থাক কেন বাবা! তোমার কিসের চিন্তা—কিসের ভাবনা? এ সংসারে তোমার কিসের অভাব আছে যে, তুমি বিষণ্ণ-মনে ব'সে থাক? যদি তোমার কোনও কষ্ট হয়ে থাকে, আমায় স্পষ্ট করে বল—আমি তোমার সে কষ্ট দূর কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব।"

কুমার।—"আমার তো কোনও কষ্টই নেই মা!"

ভবানী।—"তবে তুমি কি ভাব?—কি চিন্তা কর? আমার মনে হয়, তোমার চিত্ত যেন দারুণ দুশ্চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত!"

কুমার এতদিন ভাবিতেছিলেন,—'কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ? কে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে ?' এই সমস্যাই তাঁহার হৃদয়কে দুশ্চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং মহারাণীর প্রশ্নে কুমারের হৃদয়-ভার কথঞ্চিৎ লাঘব হইল।

কুমার কহিলেন,—"মা! আপনি সত্যই বলিয়াছেন। আমার হৃদয় সত্যই দারুণ দুশ্চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত।"

ভবানী।—"বাবা, কি সে দুশ্চিন্তা!"

কুমার—জীবনের সেই দুইটী স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন,—'পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের মুক্তি-দানে তাহার বন্ধন-মোচন হয়।' আবার ভবানী-মন্দিরের রাজ-পুরোহিত বলিয়াছেন,—'বলিদানে পশুর বন্ধন-মোচন হয়।'

সেই দুই ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া, কুমার জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বলিদানে বন্ধন-মোচন ? না—মুক্তিদানে বন্ধন-মোচন ?"

মহারাণী বিস্মিত হইয়া কুমারের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বালকের মুখে এ কি প্রশ্ন ? মহারাণী বুঝিলেন,—প্রশ্ন গুরুতর। কিন্তু এবংবিধ প্রশ্নে বালকের নির্ম্মল-চিত্ত কখনই উদ্বেলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তিনি স্থির করিলেন—সময়ান্তরে কুমারকে বুঝাইয়া এতাদৃশ চিন্তায় বিরত করিবেন। এক্ষণে কুমারকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"এই প্রশ্ন! আচ্ছা, আমি তোমার এ প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দেব! এ কথা তুমি এত দিন বল-নি কেন ?"

এই বলিয়া, কুমারের হাত ধরিয়া, মহারাণী কুমারকে প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া গেলেন।

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

'বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তির বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ. ক্রোধ হইতে সদসৎ বিবেকের নাশ, তাহা হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

* * *

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

## সূত্রপাত।

" The childhood shows the man
As morning shows the day."

—*Milton.*

হরিদেব রায় আটগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু গোপাল ফিরিয়া আসে নাই। গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শান্তিদেবীকে প্রায়ই তিনি প্রবোধ দেন,—"গোপালকে শীঘ্রই তাহারা রাখিয়া যাইবে।" কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া গেল; কৈ, গোপাল তো ফিরিয়া আসিল না!

প্রথম প্রথম হরিদেব রায় বুঝাইয়াছিলেন,—"গোপাল রাজা হইবে কি না!—তাই অভিষেক শেষ হইলে গোপাল ফিরিয়া আসিবে!" গোপাল ফিরিল না, অথচ তিনি ফিরিলেন কেন —এবম্বিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, হরিদেব রায় বলিতেন,— "অভিষেকের সময় আমায় থাকিতে নাই। তাই আমি চলিয়া আসিয়াছি!" শান্তিদেবী প্রথম প্রথম সেই কথাই বিশ্বাস করিতেন; গোপাল আজি আসিবে, কালি আসিবে বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ কত দিন সে প্রবোধ মানিতে পারে?

ভবানীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ এখনও মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা নিকটে থাকিলে, শান্তিদেবীর প্রাণ অনেকটা আশ্বস্ত থাকিত। কিন্তু তাহারাও তো এখন কাছে

নাই! বিষয়-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায়, অনবসর-প্রযুক্ত, হরিদেব রায় এ পর্য্যন্ত সে দুই পুত্রকেও আনিয়া দিতে পারেন নাই। তিনি এখন আটগ্রামের নূতন জমীদার হইয়াছেন। জমীদারীর ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে তাঁহার সময় কাটিয়া যায়। পুত্রদ্বয়কে আটগ্রামে আনয়ন-সম্বন্ধে কখন আর তিনি বন্দোবস্ত করিবেন? এক জন লোক পাঠাইলেও অবশ্য এত দিন তাহাদের আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নূতন জমীদারী পাইয়া বিষয়-কর্ম্মে তিনি এতই নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া আছেন যে, সে চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ক্বচিৎ কেহ সে বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেও অল্পক্ষণ মধ্যে সে চিন্তা স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত মানুষের চিত্ত—এইরূপ ভাবেই অন্য চিন্তা পরিহার করিয়া থাকে। শান্তিদেবী দিন দিন যে মলিন হইয়া পড়িতেছেন, হরিদেব রায়ের সেদিকে এখন দৃষ্টি করিবার অবসর নাই। বিষয়—বিষয়—বিষয়! বিষয় বলিয়া তিনি এখন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

শান্তিদেবী আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সে রূপ—সে কান্তি দিন দিন বিমলিন হইয়া আসিতেছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—তাঁহার মনে কেবলই এখন গোপালের চিন্তা।' 'গোপাল—গোপাল' বলিয়া তিনি পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। সংসারের কাজ-কর্ম্মে মন নাই; কাহারও সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্তি নাই; কেবল গোপালের চিন্তাই তাঁহাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। পতি বলিয়াছেন,—"গোপালকে শীঘ্রই তাহারা রাখিয়া যাইবে।" তাই তিনি সদাই পথপানে চাহিয়া থাকেন। পথে কাহাকেও চলিতে

দেখিলে আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"হাঁ গো! তোমরা আমার গোপালকে আস্‌তে দেখ্‌লে?" নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছেন; কাহারও পদ-শব্দ শ্রুতিগোচর হইল;—অমনি মনে করিলেন,—"ঐ বুঝি গোপাল আসিতেছে!" রাত্রে শুইয়া আছেন; নিশাচর পশুপক্ষীর গমনাগমন-শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল;—অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া আপনা-আপনই বলিয়া উঠিলেন,—"গোপাল! এলি বাবা!"

শান্তিদেবীর ভাববিকৃতি দেখিয়া কুমুদিনী দেব্যা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। সংসার কিরূপে রক্ষা হইবে,—সেই চিন্তাই তাঁহার প্রধান চিন্তা। কনিষ্ঠ হরিদেব রায় সংসারের দিকে চাহিয়া দেখেন না; তিনি বিষয়-কর্ম্মে উন্মত্ত হইয়া আছেন। শান্তিদেবীর এই অবস্থা;—তিনি গোপালের জন্য পাগলিনী-প্রায়। সংসার কেমন করিয়া রক্ষা হয়? হরিদেব রায়ের সাক্ষাৎ পাইলে কুমুদিনী দেব্যা সংসারের কথা প্রায়ই উত্থাপন করেন; বুঝাইয়া বলেন,—"আমি একলা আর কত পেরে উঠি? বউয়ের অবস্থা তো এই হ'ল! এখন যা'হক একটা বন্দোবস্ত তো কর্‌তে হয়!'

হরিদেব রায় প্রায়ই কোনও উত্তর দেন না। যদিও কখনও উত্তর দেন, বলেন,—"বিষয়-সম্পত্তিটা আগে কায়েমি ক'রে নিই; তার পর বন্দোবস্ত ঠিক হ'য়ে যাবে।" হরিদেব রায়ের মস্তিষ্কে এখন কেবল বিষয়-সম্পত্তিই স্থান পাইয়াছে। তিনি এখন সেই চিন্তাতেই মজ্‌গুল হইয়া আছেন। আহারে বসিয়াছেন; তখনও তাঁহার মস্তিষ্ক সেই চিন্তায় আলোড়িত হইতেছে। স্নান করিতে যাইতেছেন; তখনও সেই চিন্তাই

তাঁহাকে ঘেরিয়া আছে। তিনি কখনও ভাবিতেছেন,—"উত্তর মাঠের জমীটা হীরু ঘোষকে না দিয়ে, পাঁচু সর্দ্দারকে দিতে হ'বে। সে বেশী টাকা দিতে পারে।" কখনও ভাবিতেছেন,—"বিলের ধারের জমীটা—খাসেই রাখ্‌ব। লোক রেখে আবাদ ক'র্‌তে পার্‌লে, ও জমীটায় সোণা ফল্‌তে পারে।" আবার কখনও বা ভাবিতেছেন,—"আমার দরকার কি অত ঝঞ্ঝাটে যাওয়ায়? যা পেয়েছি, বুঝে চল্‌তে পার্‌লে, তাতে পায়ের উপর পা দিয়ে কাল কেটে যেতে পারে!"

কুমুদিনী দেব্যা সংসারের বিষয়ে কত সময় কত কথাই বলিবেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু একমাত্র আহারের সময়টী ভিন্ন কনিষ্ঠের সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটিয়া উঠে না। যদি কখনও অন্দরে ডাকিয়া পাঠান, একটা-না-একটা কাজের অজুহাতে হরিদেব রায় আসিতে পারেন না। সুতরাং আহারের সময় ভিন্ন অন্য সময় কোনও কথা কহা ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু তাহাতে যে উত্তর পান—চমৎকার! কুমুদিনী দেব্যা যদি জিজ্ঞাসা করেন,—"বউয়ের চিকিৎসা-বিষয়ে কি ব্যবস্থা ক'র্‌বে?" 'বিষয়ের' কথাটাই তখন কেবল হরিদেব রায়ের কর্ণে প্রবেশ করে। তিনি উত্তর দেন,—"কান্তরামের বিষয়টা এখনও হাত ক'র্‌তে পারি-নি।"

দুই জনের মন দুই ভাবের চিন্তায় বিভোর হইয়া আছে। হরিদেব রায় কেবলই দেখেন—বিষয়-সম্পত্তির কি হইতেছে! শান্তিদেবী কেবলই দেখেন—ঐ বুঝি গোপাল আসিতেছে!

রাখাল—গোপালের খেলার সাথী ছিল। রাখালকে দেখিলে, শান্তিদেবীর প্রাণ কতকটা শান্ত হইতে পারে!—এই

মনে করিয়া, কুমুদিনী দেব্যা মাঝে মাঝে রাখালকে শান্তি-দেবীর কাছে আসিতে বলিতেন। সুযোগ পাইলে, রাখালও তাই মাঝে মাঝে 'কাকি-মা' বলিয়া শান্তিদেবীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইত। শান্তিদেবী তাহাকে কতই আদর-যত্ন করিতেন,—আদর করিয়া কত সময় কত-কি খাইতে দিতেন। সময় সময় পয়সা-কড়ি দিতেও ত্রুটি করিতেন না। রাখালও সুযোগ বুঝিয়া শান্তিদেবীর নিকট কত-কি আব্‌দার করিত। কখনও বলিত,—"ঐ পুতুলটা আমি নেব।" কখনও বলিত,—"ঐ গহনাখানা আমায় দিতে হবে।" কখনও সে শান্তিদেবীর হাতের মুড়কি-মাদুলি-ছড়া লইয়া টানাটানি করিত। কখনও বা সে তাঁহার নাকের নথটী চাহিয়া বসিত। শান্তিদেবীও যথাসম্ভব তাহার আব্‌দার রক্ষার পক্ষে ত্রুটি করিতেন না। সময় সময় আপনার হাতের অলঙ্কারগুলি তিনি রাখালের হাতে পরাইয়া দিতেন; আর সেই অলঙ্কারগুলি পরিয়া রাখাল বাড়ী পলাইয়া যাইত। রাখালের মা কখনও কখনও সেই সকল গহনা ফিরাইয়া দিয়া যাইতেন বটে; কিন্তু রাখালের পিতা হলধর মৈত্র তাহাতে বড়ই বিরক্ত হইতেন। একদিন তাই তিনি রাখালকে নির্জ্জনে ডাকিয়া শিখাইয়া দিলেন,—"এখন থেকে যা তুই আন্‌বি, চুপি চুপি আমার কাছে এনে দিস্!"

একদিন তাহাই ঘটিল। হরিদেব রায়ের বাড়ীতে রাখালের এখন অবাধ গতি। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিতে ঘুরিতে রাখাল এক দিন শান্তিদেবীর গহনার বাক্সটি লইয়া পলায়ন করিল। কেহ দেখিতে পাইল না, কেহ জানিতে পারিল না,—এমন-

ভাবে সে কার্য্য সম্পন্ন হইল। শান্তিদেবী গোপালের চিন্তায় অন্যমনা ছিলেন; কুমুদিনী দেব্যা ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়াছিলেন; পরিচারিকা পদ্মমণি বোন্‌-পোর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। সেদিন এই অবসরে হরিদেব রায়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া, শান্তিদেবীর গহনার বাক্সটী লইয়া রাখাল পলাইয়া যায়;—সেদিন আর জননীর নিকট উপস্থিত না হইয়া, একেবারে পিতার নিকট গিয়া বাক্সটি প্রদান করে।

যেদিন এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেদিন গহনার কোনই সন্ধান হয় না। গহনার বাক্স আছে কি নাই, সেদিন সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই। পরদিন হরিদেব রায় দলিলবাহির করিতে গিয়া দেখিতে পান,—দলিলের সিন্দুকের উপর শান্তিদেবীর গহনার বাক্সটী নাই। সিন্দুক খুলিতে গিয়া হঠাৎ গহনার বাক্সের কথা তাঁহার মনে পড়ে। তিনি তখনই কুমুদিনী দেব্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"দিদি! গহনার বাক্সটা কোথায় গেল?"

কুমুদিনী দেব্যা কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। শান্তিদেবীও কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। গহনার বাক্স তবে কোথায় গেল? হরিদেব রায় আতিপাতি সন্ধান করিয়া দেখিলেন,—কোথাও গহনার বাক্স খুঁজিয়া পাইলেন না। চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়িয়া গেল! সোর-গোল শুনিয়া, পাড়ার অনেকেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমুদিনী দেব্যা শান্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি বউ, রাখালকে সে বাক্সটা দিয়েছ?"

শান্তিদেবী কহিলেন,—"কৈ—না, আমি তো কিছুই জানি

না। রাখালকে তো আমি গহনার বাক্স দেই নাই।" কিন্তু সে উত্তরে কুমুদিনী দেব্যার সংশয় দূর হইল না। হরিদেব রায়ের মনেও একটা খট্‌কা বাধিল। তখন রাখালকে ডাকিয়া আনিয়া সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হইল।

অন্য দিন রায়েদের বাড়ী কোনরূপ গণ্ডগোল হইলে, রাখাল আপনিই ছুটিয়া আসে। আজ কিন্তু তাহার কোনও সাড়া-শব্দ নাই। তবে কি রাখাল আজ অন্যত্র গিয়াছে? তাহাও তো নহে! একটু সন্ধান করিতেই রাখালকে তাহাদের বাড়ীর মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল। কিন্তু সে আসিতে চাহিল না। রায়েরা ডাকিতেছে শুনিয়া, তাহার জননী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিলেন। শান্তিদেবী রাখালকে যে কত আদর করেন, রাখালের জননীর তাহা অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি রাখালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। কিন্তু গণ্ডগোল দেখিয়া তিনি সকলের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। কুমুদিনী দেব্যা তাঁহার নিকট হইতে রাখালকে সকলের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিলেন।

হরিদেব রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাখাল! বাবা! গয়নার বাক্সটা কোথায় রেখেছ?"

প্রশ্ন শুনিয়া রাখাল যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল,— "গয়নার বাক্স কি—কাকাম'শায়!"

হরিদেব।—"সবাই ব'লছে, তুমিই তো নিয়ে গিয়েছ!"

রাখাল।—"কোন্ বেটা বলে—আমি নিয়েছি! তার বাপের মুখে কুকুরে পেচ্ছাব করুক!"

রাখালের মুখে তুব্‌ড়ী ছুটিতে লাগিল। যাহা মুখে আসিল, তাই বলিয়া গালাগালি দিতে দিতে, রাখাল সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই দেখিয়া, হরিদেব রায়ও তাহাকে আর ততটা পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ, রাখালের জননী যখন বলিলেন,—তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, রাখাল কোনও কিছু লইয়া গেলে তিনি নিশ্চয় তাহা ফিরাইয়া দিয়া যাইতেন; তখন আর রাখালকে পীড়াপীড়ি করিতে রায়-পরিবারের কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

পদ্মমণি কিন্তু তখনও জোর করিয়া বলিল,—"রাখাল ছাড়া এ কাজ আর কারও দ্বারা হয়-নি। ওটা যেদিন থেকে বাড়ী ঢুক্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, আমি সেইদিন থেকেই টিক্‌টিক্‌ ক'র্‌ছি; ব'ল্‌ছি,—'সাবধান! রাখালটাকে ঘরে ঢুক্‌তে দিও না—বউ মা!' কিন্তু আমার কথা তোমরা শুন্‌বে কেন? আমি দাসী-বাঁদী বৈ তো নয়!"

রাখালের ঠাকুর-মা গণ্ডগোল শুনিয়া রায়েদের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। রাখালের সম্বন্ধে পদ্মমণির এবম্বিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিতে লাগিলেন; হাত-মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কি-লা! এত বড় আস্পর্দ্ধা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! জমীদার আছে—তোর মনিবই আছে! তাই ব'লে তুই যাকে তাকে যা তা ব'ল্‌বি? এখনই নুড়ো জ্বেলে মুখ পুড়িয়ে দে'ব।"

পদ্মমণিই বা হটিবে কেন? সে মনে করে, সে তো কাহারও আটচালায় চাল বাঁধে নাই! সুতরাং পদ্মমণিও লম্ফ-ঝম্প প্রদান করিয়া, রাখালের ঠাকুর-মার মুখের উপর হাত ঘুরাইয়া

ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল,—"জানি-নে আর কি? তোদের ঘরের কথা কি আর না জানি? দশে-ধর্ম্মে জানে—দেশে-বিদেশে জানে। তোর পোড়ার মুখ—তাই আবার দেখাতে এসেছিস্। আমি নিশ্চয় ব'লছি, রাখাল ছাড়া এ কাজ আর কারও দ্বারা হয়-নি!'

রাখালের ঠাকুর-মা এবার আরও চটিয়া উঠিলেন। পদ্ম-মণিকে লক্ষ্য করিয়া 'নভূত-নভবিষ্যৎ' গালাগালি পাড়িতে লাগিলেন,—"হারামজাদী!—নচ্ছার!—পাজী!—আমার রাখাল চোর! ফের ব'লবি তো ঝাঁটা পেটা ক'রব—তা জানিস?"

পদ্মমণির আর সহ্য হইল না। রাখালের ঠাকুর-মা যাহা মুখে বলিলেন, পদ্মমণি এখন তাহা কাজে দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। গালাগালি শুনিয়া, লম্ফ-ঝম্প দিয়া, গোয়াল-ঘর হইতে ঝাঁটা-গাছটা লইয়া আসিল; আর সেই ঝাঁটা লইয়া রাখালের ঠাকুর-মার প্রতি ধাবমান হইল; বলিতে লাগিল,—"তবে রে শতেক-খোয়ারী! দেখি, তোর কোন্ বাবা তোকে রক্ষা করে!"

হরিদেব রায় পদ্মমণিকে বাধা দিলেন; বকিতে লাগিলেন। এদিকে, পদ্মমণির বিক্রম দেখিয়া, রাখালের ঠাকুর-মা ছুটিতে ছুটিতে আপনার বাড়ীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

হরিদেব রায় পদ্মমণিকে বাধা প্রদান করায়, পদ্মমণির অভিমান-সাগর উথলিয়া উঠিল। নাকি-সুরে কাঁদিতে কাঁদিতে পদ্মমণি বলিতে লাগিল,—"আমি আর তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌ব না। আমায় যে-সে এসে তোমাদের সাম্‌নে যা-তা ব'লে যাবে, তোমরা কেউ কিছু ব'লবে না। আমি এই চ'ললাম!"

সকল সময় কি সকল আব্‌দার শোভা পায়? একে গহনার বাক্স অপহৃত হওয়ায়, হরিদেব রায়ের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার উপর আবার পদ্মমণি, মৈত্র মহাশয়ের জননীকে অপমান করিয়াছে। এ অবস্থায় কি আর পদ্মমণির আব্‌দার সহ্য হয়?

পদ্মমণি বলিতে-না-বলিতেই হরিদেব রায় বলিলেন,—"দূর-হ বেটী! তুই আমার বাড়ী থেকে এখনই দূর-হ'! কি ব'লব—তুই স্ত্রীলোক! নইলে ঐ ঝাঁটাপেটা ক'রে আমি তোকে এখনই বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিতাম!"

পদ্মমণি কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমান-ভরে খিড়কীর দিকে চলিয়া গেল। হরিদেব রায় বাড়ীর সকলের উদ্দেশে গালি-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এক দিকে হরিদেব রায়ের বাড়ীতে এই ব্যাপার; অন্য দিকে রাখালের ঠাকুর-মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া, আপনার পুত্রের নিকট কান্না আরম্ভ করিয়া দিলেন,—"তোরা সব জল-জ্যান্ত বেঁচে থাকৃতে, আমায় কিনা হরিদেব রায় একটা চাকরাণী দিয়ে এই রকম অপমান করালে! এর প্রতিকার যদি আজই তোরা না করিস্, আমি এখনই আত্মহত্যা ক'র্‌ব।" এই বলিয়া হলধর-জননী, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া, উচ্চ চীৎকারে বাড়ী প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন।

পাড়ার দুই একটী মহিলা আসিয়াও তাহাতে রসান দিতে লাগিল। হলধর মৈত্র ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"একবার দেখ্‌ব—বেটা কেমন জমীদার হ'য়েছে!"

* * *

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### রাখালের কথা।

"Obtruding false rules prankt in reason's garb."

—*Milton.*

সেই দিন হইতে মুখ-দেখা-দেখি বন্ধ হইল। সেই দিন হইতে রায়-পরিবারের সহিত মৈত্র-পরিবারের সদ্ভাব টুটিয়া গেল। সেই দিন হইতে হরিদেব রায়ের শত্রুতা-সাধনে হলধর মৈত্র বদ্ধপরিকর হইলেন।

এখন প্রায় প্রতি দিনই হলধর মৈত্রের বাড়ীতে হরিদেব রায়ের অনিষ্ট-সাধন-বিষয়ে গুপ্ত পরামর্শ হয়। কখনও হরিদেব রায়কে সমাজ-চ্যুত করিবার কথা উঠে; কখনও হরিদেব রায়ের প্রজাকে গোপনে ডাকাইয়া আনিয়া খাজানা দিতে নিষেধ করা হয়।

আজিও হলধর মৈত্রের বাড়ীতে সেইরূপ একটী চক্রান্তের পরামর্শ চলিয়াছে। গহর আলি সর্দ্দার—হরিদেব রায়ের এক-জন মাতব্বর প্রজা। লোকটা বড়ই দুর্দ্দান্ত। সে যখন নাটোর-রাজের প্রজা ছিল, তখনই সময় সময় তহশীলদারদিগকে হাঁকাইয়া দিত। এখন হরিদেব রায় তাহার জমীদার হওয়ায়, সে যেন আরও সুযোগ পাইয়া বসিয়াছে। হলধর মৈত্র সে সন্ধান পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। সুতরাং অনলে ঘৃতাহুতি প্রদানের অভিপ্রায়ে তিনি আজ গহর আলি সেখকে ডাকাইয়া আনিয়া-ছেন; উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন,—"দেখ গহর আলি! আমি

জানি, এ অঞ্চলে তুমিই একজন তেজস্বী লোক। নূতন জমীদার হ'য়ে হরিদেব রায় ধরাখানাকে যেন সরার মত দেখ্ছে! তুমি যদি এর প্রতিকার ক'র্তে পার, লোকে দু'হাত তুলে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্বে।"

গহর আলি মন বুঝিবার জন্য কহিল,—"কি জানেন মৈত্র ম'শায়! হাজার হ'ক্, তিনি তো মনিব বটেন! এ পর্য্যন্ত তিনি তো আমার কোনও অনিষ্ট করেন-নি! আমি কি ক'রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ক'র্ব?"

হলধর।—"তুমি কি না বড় শক্ত লোক, তাই তোমার কাছে ঘেঁস্তে পারে না। নইলে, তুমি একবার গাঁয়ের মধ্যে তত্ত্ব নিয়ে দেখ, হরিদেব রায়ের অত্যাচারে লোকে দেশ ছেড়ে পালাতে আরম্ভ ক'রেছে। সে দিন আবদুল মিঞার ঘরখানা দিন-দুপুরে ধু-ধু করে জ্বলে গেল, তার নিগূঢ় তত্ত্ব কিছু জান কি?"

গহর আলি।—"না! কৈ, তা তো আমি কিছু শুনি-নি। আমি তো শুনেছি, আবদুল মিঞার বড় বেটা ছামদু তামাক খেয়ে ক'ল্কেটাকে বেড়ার কাছে রেখেছিল; হাওয়া পেয়ে সেই আগুন জ্বলে উঠে ঘরখানায় লেগে গিয়েছিল। সে কথা কি তবে ঠিক নয়?"

হলধর।—"ব'ল্ব আর কি ক'রে—সর্দ্দারের বেটা! ব'ল্তে এখন বড়ই শঙ্কা হয়! হরিদেব রায় এখন আটগ্রামের জমীদার! কি কথা ব'ল্তে কি ঘ'টে যাবে,—তাই মনে ভয় হয়! তবে তুমি অতি সজ্জন লোক, তাই তোমাকে দু'টো প্রাণের কথা ব'ল্তে সাহস হয়! নইলে, আর কাউকে এ সকল কথা বল্তে পারি কি?"

গহর আলি।—"তবে আবদুল মিঞার বাড়ী জালার মধ্যে কোনও রহস্য আছে নাকি?"

হলধর।—"রহস্য!—রহস্য ষোল আনাই! তুমি সাদাসিদে মানুষ; প্যাঁচ ফের কিছু বোঝ না। তাই তুমি যা শুনেছ, তাই বিশ্বাস ক'রেছ! কিন্তু আমার স্বচক্ষে দেখা! আমি কি ক'রে অন্য কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি?"

গহর আলি।—"বলেন কি? আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন!"

গহর আলি সর্দ্দার বিস্মিত হইয়া মৈত্র মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হলধর মৈত্র বুঝিলেন,—ঔষধ একটু ধরিয়াছে। তিনি আরও একটু জোরের সহিত বলিলেন,—"আমি স্বচক্ষে না দেখ্‌লে কি আর এমন ক'রে ব'ল্‌তে সাহস পাই! জানই তো হরিদেব রায় আমার কত আত্মীয়! তবু যে আমি তার বিরুদ্ধে এমন কথাটা ব'ল্‌ছি. বিশেষ কোনও কারণ না থাক্‌লে কি আর মিথ্যা ক'রে বল্‌তে পারি? ব'ল্‌তে কি গহর, আবদুল মিঞার ঘর-জ্বালানর পর থেকেই হরিদেব রায়ের প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা হ'য়েছে। পয়সার লোভে কি এমন ক'রে এক জনকে উদ্বাস্তু করা উচিত? হরিদেব রায় যে রকম আরম্ভ ক'রেছে, কোন্ দিন বা তোমার-আমারও কি সর্ব্বনাশ ক'রে ব'সবে! গহর!—তুমি যদি এর কোনও প্রতিকার ক'র্‌তে পার, ভাল, আমি এ গ্রামে থাকি। নয় তো এ পৈত্রিক ভিটে ত্যাগ ক'রে আমায় অন্য দেশে পালাতে হয়!"

গহর আলি আর অবিশ্বাস করিতে পারিল না। আবদুল তাহার আত্মীয় লোক। হরিদেব রায় সেই আবদুলের বাড়ী

পুড়াইয়া দিয়াছে, আর হলধর মৈত্র স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন;—ইহাতে গহরের প্রাণের ভিতর রোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। গহর বলিল,—"এ যদি হয়, তা হ'লে তো আর এদেশে বাস করাই চলে না!"

সুরে সুর মিশাইয়া হলধর মৈত্র বলিয়া উঠিলেন,—"আমিও তো তাই বলছিলাম! তোমার মত লোক দেশে থাকৃতে, এ অত্যাচারের যদি প্রতিকার না হয়, তবে আর কোন্ সাহসে দেশে থাকৃব।"

গহর আলি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—"সত্যই বলেছেন আপনি! এর প্রতিকার ক'র্‌তেই হবে!"

গহর আলি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছে, এমন সময় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে রাখাল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পিছু পিছু চারি পাঁচ জন স্ত্রী-পুরুষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হলধর মৈত্র বুঝিলেন—ব্যাপার গুরুতর। বুঝিলেন,—রাখাল নিশ্চয় কাহারও কিছু অনিষ্ট করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে কথা পাছে গহর আলি বুঝিতে পারে, তাই তিনি, কাহাকেও কিছু না কহিয়া, পূর্ব্বেই গহর আলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখ্‌লে গহর!—ব্যাপারখানা একবার দেখ্‌লে? এই দেখ!—চোখের উপর দেখ? একটা ছেলে আমার; তার উপর কি অত্যাচার! একবার দেখে যাও তুমি! এতে কি আর এ গ্রামে বাস করা চলে? তুমি নিশ্চয়ই জেন,—এ সব সেই হরিদেব রায়ের চক্রান্ত!"

গহর বলিল,—"আমি সব বুঝেছি। আমায় আর কিছু

ব'ল্‌তে হ'বে না। আজ আমি এখন আসি। পরশু সন্ধ্যার পর, এ বিষয়ে একটা হেস্ত-নেস্ত করা যাবে!"

গহর আলি চলিয়া গেল। রাখালের অনুসরণকারিগণ হলধর মৈত্রের সম্মুখে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"তোমরা কি আর আমাদের গাঁয়ে থাক্‌তে দেবে না!"

হলধর মৈত্র সান্ত্বনা-দানচ্ছলে কহিলেন,—"কেন—কি হয়েছে? বলই না শুনি!"

তারিণীর মা সকলের আগবাড়া হইয়া কহিতে লাগিল,— "আমার দুখীকে কি মারটা মেরে এয়েছে, একবার দেখ্‌বে এস! ছুঁড়িটের নাঁক দিয়ে গল্‌গল্‌ ক'রে রক্ত প'ড়ছে। এমন মারও কি মানুষে মারে?"

হলধর মৈত্র যেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে মেরেছে—কেন মেরেছে?"

তারিণীর মা।—"আর কে মার্‌বে!—তোমার ঐ গুণধর ছেলে! অমন ছেলে বেঁধে রাখ্‌তে পার না!"

সঙ্গে সঙ্গে হরমণি হাত-মুখ নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—"যেন কিছু জানেন না! ন্যাকা আর কি? ছুঁড়িটাকে বেদম মেরেছে। মেরে আবার তার হাতের পৈঁচে ছড়া কেড়ে নিয়ে এল গা?"

তারিণীর মা ও হরমণি ক্রমশঃ অনেক রূঢ় কথা কহিতে আরম্ভ করিল। আর আর যাহারা সঙ্গে ছিল, তাহারাও আস্ফালন করিতে লাগিল। গণ্ডগোল শুনিয়া, নিমাই মণ্ডল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিমাই মণ্ডল আসিয়া প্রথমে গণ্ডগোল থামাইবার চেষ্টা

পাইল। তারিণীর মা ও হরমণিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"তোরা একটু আস্তে কথা কইতে পারিস্‌নে। কার সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয়, সে জ্ঞানটা তোদের নেই! তোরা একটু থাম বাপু! কর্ত্তা মশায়কে কথাটা একবার শুন্‌তে দে।"

নিমাই মণ্ডল বলিতেছে। সুতরাং হরমণি ও তারিণীর মা শান্ত হইল। নিমাই মণ্ডল গ্রামস্থ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। হলধর মৈত্রও তাহাকে বিশেষ খাতির করেন।

নিমাই মণ্ডল কহিল,—"ঠাকুর ম'শায়! আপনার ছেলের জন্য আমাদের গ্রামে টেকা দায় হ'য়েছ। সেদিন আবদুল মিঞার ঘরখানায় আপনার ছেলেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আপনাকে আমরা মান্য করি ব'লে, জান্‌তে পেরেও সে কথা প্রকাশ করি-নি। আজ আবার আপনার রাখাল কি ক'রে এল, শুন্‌তেই তো পাচ্ছেন। আপনাদের ছেলে-পিলেকে আমরা তো কিছু ব'ল্‌তে পারিনে! কিন্তু সকল লোক তো সমান নয়! কোন্ দিন কে রাগের মাথায় কি ক'রে ব'স্‌বে, তখন আপনি আমাদের দোষ দিতে পার্‌বেন না। রোজ রোজ এমন অত্যাচার ক'র্‌লে কে সইতে পারে!"

গগন দাস যুবাপুরুষ; সম্পর্কে দুখীর খুড়া হয়; রাগে গরগর করিতেছিল। নিমাই মণ্ডলের কথা শেষ হইতে না হইতে সে বলিয়া উঠিল,—"আমি যদি আজ রাখালেটাকে ধ'র্‌তে পার্‌তাম, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌তাম!"

নিমাই মণ্ডল একটু রুক্ষস্বরে তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য কহিল,—"থাম্! আর বকিস্‌নে!"

গগন দাস নিরস্ত হইল। নিমাই মণ্ডলের নম্রভাব দেখিয়া হলধর জিজ্ঞাসা করিললেন,—"কেন, কি হয়েছে নিমাই! খুলেই ব'ল না কেন?"

নিমাই মণ্ডল একে একে সকল কথা বিবৃত করিল। দুখীকে বিষম প্রহার, তাহার হাত হইতে পৈঁছা ছিনাইয়া লওয়া, তাহাকে ফেলিয়া দিয়া পৈঁছা লইয়া ছুটিয়া পলায়ন করা,—একে একে রাখালের সকল কীর্ত্তি-কাহিনী নিমাই মণ্ডল বর্ণনা করিয়া গেল। কেবল এক দিনের কথা নহে; কোন্ দিন রাখাল কি করিয়াছে,—কোন্ দিন সে সনাতন দাসের আম গাছ হইতে আম পাড়িয়া আনিয়াছিল,—কোন্ দিন সে যুধিষ্ঠির ঘোষের দুধের কলসীতে মূত্রত্যাগ করিয়াছিল,—কোন্‌দিন সে অর্জ্জুন পরামাণিকের ঘরে ঢুকিয়া চাল-দাল ছড়াইয়া দিয়াছিল, —একে একে সকল বিষয়ই উল্লেখ করিল। শেষ বলিল,— "এখন আজকের বিষয়টা আপনি বিচার করুন। দুখীর পৈঁছে ছড়াটা আনিয়ে দেন!"

নিমাই মণ্ডল আসিয়াছে; তাহাকে অসন্তুষ্ট করিলে, ভবিষ্যতে নানা অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে!—এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া, হলধর মৈত্র একটু রোষভরে পুত্র রাখালকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"পাজি ছেলে, নচ্ছার ছেলে! আজ হাড় এক ঠাঁই, আর মাস এক ঠাঁই ক'রব।"

আগন্তুকগণ বুঝিল,—মৈত্র মহাশয় আজ সত্য-সত্যই চটিয়াছেন। তাহাদের মনে হইল,—আজ সত্য-সত্যই কোনও প্রতিকার হইবে। সুতরাং তাহাদের উত্তেজনা একটু কমিয়া আসিল।

পুনঃপুনঃ মৈত্র মহাশয় রাখালকে ডাকিতে লাগিলেন

রাখাল কোনই উত্তর দিল না; সে কেবল ঠাকুর-মার অঞ্চল-কোণে লুকাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। রাখালের ঠাকুর-মা সকলই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনে হইল, এ সময় হলধর যেরূপ রাগান্বিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সহায়তা ভিন্ন রাখালের আজ আর নিস্তার নাই। তাই তিনি আপনিই রাখালকে সঙ্গে লইয়া, বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন।

রাখালকে দেখিয়া হলধর মৈত্র আস্ফালন করিয়া তাহাকে গালাগালি দিয়া উঠিলেন।

রাখালের ঠাকুর-মা পুত্র হলধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কেন! রাখাল কি ক'রেছে যে, তুই অমন ক'রছিস্?"

হলধর মৈত্র কতই রাগভাব প্রকাশ করিলেন। কহিলেন,— "জান না? ঐ শোন—নিমাই মণ্ডলের মুখে শোন!" এই বলিয়া, নিমাই মণ্ডলের নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, একে একে সকল কথা কহিয়া গেলেন।

রাখালের বিশ্বাস ছিল,—"সে যতক্ষণ ঠাকুর-মার নিকট আছে, ততক্ষণ তাহার গায়ে কেহ আঁচড়টী পর্য্যন্ত দিতে পারিবে না।' সেই সাহসই—তাহার প্রধান সাহস। সেই সাহসে ভর করিয়া, রাখাল ঠাকুর-মাকে বলিল,—"না ঠাকুর-মা, কৈ আমি তো কিছুই করি-নি!"

রাখালের ঠাকুর-মাও সেই সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, তাই তো! রাখাল তো আজ বাড়ীর বাইরেই যায়-নি; ও তো আজ বাড়ীতে ব'সেই খেলা কর্‌ছে!"

রাখালের ঠাকুর-মার এই উত্তরে, তারিণীর মা ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিতে গেল,—"এই তে

রাখালেটা ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ী ঢুক্‌লো! চোখের মাথা কি সব খেয়ে ব'সেছ?"

নিমাই মণ্ডল তারিণীর মাকে গালি দিয়া উঠিল; সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে কহিল,—"কার সঙ্গে কি রকম কথাবার্ত্তা কইতে হয়—তা যখন জানিস্‌নে, তখন কথা কইতে যাস্ কেন?" এই বলিয়া, মৈত্র-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া, নিমাই মণ্ডল কহিল,—"মা-ঠাকরুণ কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন; তাই হয়-তো দেখ্‌তে পান-নি। নৈলে রাখাল যে দুখীকে ফেলে দিয়ে তার পৈঁছা ছড়া নিয়ে এয়েছে, তা কে না দেখেছে!"

রাখাল আবার বলিল—"আমি নিই-নি।" রাখালের ঠাকুর-মাও বলিলেন,—"রাখাল যদি নেবে, তা হ'লে পৈঁছা গেল কোথায়?"

হলধর মৈত্র মনে মনে সকলই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু রাখালও পৈঁছার কথা অস্বীকার করিতেছে; আর জননীও রাখালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার কথাই সমর্থন করিতেছেন। সুতরাং এ সুযোগ তিনি কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? তথাপি নিমাই মণ্ডলের মন রক্ষার জন্য বলিলেন,—"দেখ নিমাই! রাখালও অস্বীকার ক'র্‌ছে; মাও বল্‌ছেন,—রাখাল পৈঁছা আনে-নি। এ অবস্থায় কি কর্‌তে পারা যায়? তা যাই হোক, আমি তল্লাস ক'রে দেখ্‌ব—তুমি এখন সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে যাও। যদি পৈঁছা আমার বাড়ীতে এসে থাকে, তুমি নিশ্চয় জেন,—আমি তোমার কাছে তা পৌঁছে দেব। তবে যদি বাড়ীতে না এসে থাকে, তা হ'লে আর—"

হলধর মৈত্র আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন।

নিমাই মণ্ডল কহিল,—"আপনার বাড়ীতেই পৈঁছা এয়েছে। তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। যেমন ক'রে হোক, সে পৈঁছা-ছড়া খুঁজে দিতে হবে।"

"আচ্ছা তা—তা—তা তোমরা এখন যাও! আমারই অদেষ্টে দণ্ড আছে দেখ্‌ছি!"

হলধর মৈত্র এইরূপ ভাবের কথা-বার্ত্তা কহিয়া, নিমাই মণ্ডল প্রভৃতিকে বিদায় দিবার চেষ্টা পাইলেন।

তারিণীর মা কিন্তু সে কথা শুনিতে চাহিল না। সে বলিল,—"খোঁজাখুঁজির ধার ধারিনে। পৈঁছে এখনই দিতে হবে। এই মাত্র নিয়ে এল; তার আবার খোঁজাখুঁজি কি?"

কিন্তু মৈত্র মহাশয় এমনই মিষ্ট ভাষায় নিমাই মণ্ডলকে তুষ্ট করিলেন যে, নিমাই মণ্ডল আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। অন্যান্য সকলে সে কথা শুনিতে না চাহিলেও, হলধর মৈত্রের অনুরোধে নিমাই মণ্ডল সকলকে বুঝাইয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

* * *

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

---

## বিষ-বীজ।

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রায় প্রতিদিনই পুত্রের জন্য পিতামাতাকে লোকের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। সহিয়া সহিয়া অসহ্য হওয়ায়, হলধর মৈত্র একদিন পুত্রকে একটু তিরস্কার করিলেন; কহিলেন,—"গোপাল আর তুই—এক সঙ্গের খেলার সাথী ছিলি। সে রাজা হইতে চলিল; আর তুই লোকের তিরস্কার-গঞ্জনার পাত্র হইলি! নিজের অবস্থার উন্নতি-সাধনে তোর একটুও চেষ্টা নাই?"

গোপাল রাজা হইয়াছে, আর রাখাল লোকের নিকট পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে,—ভৎর্সনা করিয়া হলধর মৈত্র যেদিন এই কথা কহিলেন; রাখালের মন একটু চঞ্চল হইল। পিতা আর আর যাহা কিছু বলিলেন, সে সকল কথা রাখালের কর্ণে স্থান পাইল না। রাখাল সকল কথাই শুনিল বটে; কিন্তু এই কথাটি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া আঘাত করিল। এই দিন হইতে রাখাল সদাই ভাবিতে লাগিল,—'কি করিয়া গোপালের ন্যায় রাজ্যৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারি।'

যতই দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, রাখালের প্রাণের ভিতর সেই চিন্তা সেই আকাঙ্ক্ষা পল্লবিত মুকুলিত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নাটোর রাজধানী হইতে এক নিমন্ত্রণ-পত্র আসিল। মহারাণী ভবানী সেই নিমন্ত্রণ-পত্রে ব্রাহ্মণগণকে রাজধানীতে পদধূলি প্রদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। রাখাল মনে মনে স্থির করিল,—"এই এক অবসর বটে! গোপাল আমার খেলার সাথী ছিল। একটী ফল খেতে পেলে, সে তাহার অর্দ্ধেক আমাকে না দিয়া খেত না; এক মুঠো মুড়ি খেতে পেলে, অর্দ্ধেক সে আমার জন্য রেখে দিত। সে এখন অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর—সে সম্পত্তির কিছু অংশ আমায় দিতে পারে না কি?"

এই ভাবিয়া, নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নাটোর-রাজধানীতে গিয়া রাখাল একবার গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। মনে মনে কহিল—"আমি স্পষ্ট করিয়া সকল কথা গোপালকে খুলিয়া বলিব। শৈশবের সকল কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিব। তাহা হইলে, নিশ্চয় সে আমায় তাহার রাজস্বের কতক অংশ আমায় প্রদান করিবে।"

এইরূপ ভাবনায় বিভোর হইয়া, রাখাল যখন ঐশ্বর্য্যের সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, আশার আলোকে কখনও তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কখনও বা নৈরাশ্যের মেঘ আসিয়া তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। একবার তাহার মনে হইল,—"গোপাল নিশ্চয়ই আমার আশা পূর্ণ করিবে; সে কখনই আমার প্রার্থনায় উপেক্ষা করিতে পারিবে না।"

পরক্ষণেই আবার তাহার মনে হইল,—"যদি গোপাল আমার প্রার্থনা পূরণ না করে, ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া সে যদি আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে।" রাখাল আপনা-আপনিই সে প্রশ্নের মীমাংসা করিল,—"উপেক্ষা করে, রাজ্য না দেয়, অন্য পথ আছে। আমার সঙ্কল্প,—যেমন করিয়া হউক, গোপালের সম্পত্তির—গোপালের ঐশ্বর্য্যের কতক অংশ আমায় হস্তগত করিতে হইবে।"

ঈর্ষ্যানলে রাখালের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। রাখাল মনে মনে কহিতে লাগিল,—"গোপাল অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, আর আমি পথের ভিখারী! ইহা কখনই সহ্য হইবে না। ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হউক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।"

*
* *

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## ব্রাহ্মণ।

"কোটিব্রহ্মাণ্ডমধ্যেষু সন্তি তীর্থানি যানি বৈ।
তীর্থানি তানি সর্ব্বাণি বসন্তি দ্বিজপাদয়োঃ॥"

—পদ্মপুরাণ।

পোষ্যপুত্র-গ্রহণ-উৎসবের সমারোহ ব্যাপার শেষ হইতে না হইতেই নাঁটোর রাজধানী আবার এক উৎসব-সমারোহে মুখরিত হইয়া উঠিল।

প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেশ-দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া নাটোর-রাজধানীতে সমবেত হইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ বলিতে—কেবল যে নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক বা স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণগণ বলিতে—কেবল যে রাজবাটীর সংশ্রব-যুক্ত ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন,—গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে—দেশ-দেশান্তর হইতে। বৃদ্ধ আসিতেছেন, যুবা আসিতেছেন, প্রৌঢ় আসিতেছেন, বালক আসিতেছেন,—উপনীত উপবীতধারী ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই নাটোর-রাজধানীতে এ উৎসবে সমাদরের অবধি নাই। মহারাণীর দেওয়ান দয়ারাম রায় এবং মহারাণীর মাতুলপুত্র চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর, সকল রাজকর্ম্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া, প্রাণপণযত্নে দিবা-রাত্রি ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। নাটোর-রাজধানীতে এতাধিক ব্রাহ্মণের সমাগম আর কখনও হয় নাই; এবং

সমাগত সকল ব্রাহ্মণের সমভাবে এরূপ পরিচর্য্যার ব্যবস্থাও আর কখনও হয় নাই।

এতাধিক ব্রাহ্মণের সমাগম, আর সকল ব্রাহ্মণের সমভাবে পরিচর্য্যার ব্যবস্থা,—এ আবার কি নূতন উৎসব! মহারাণী ভবানী মনস্থ করিয়াছেন—লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিবেন। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-সংগ্রহে যে কি পুণ্য, মহারাণী অনেক দিন পূর্ব্বে আপন গুরুদেবের মুখে তাহা শুনিয়াছিলেন। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করিতে পারিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হইয়া থাকে। সে পদধূলি অঙ্গে ধারণ করিলে, দেহ সর্ব্বরোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। সেই ধূলি যিনি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, অশেষ পুণ্যভাগী হইয়া তিনি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন। গুরুদেবের নিকট সেই কথা শুনিয়া অবধি, লক্ষ-ব্রাহ্মণের পদধূলি-সংগ্রহে মহারাণী সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অনেক দিন হইতে সে সঙ্কল্প তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। আজ মহারাণী সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবেন। তাই আজ দেশ-দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিয়াছেন,—তাই আজ ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই বিশেষ পরিচর্য্যার ব্যবস্থা হইয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট তিথি-লগ্নে লক্ষ ব্রাহ্মণকে এক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আসনে বসাইয়া, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিতে হয়। লক্ষ ব্রাহ্মণের বসিবার জন্য তাই লক্ষাধিক কাষ্ঠাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল;—লক্ষ ব্রাহ্মণের অবস্থানের জন্য তাই বহুবিস্তৃত মণ্ডপ-সমূহে সহরের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিয়াছিল। পদধূলি-গ্রহণ-উপলক্ষে মহারাণী প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য পাথেয়

প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবং এই পদধূলিদান-উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ সকলেই উপযুক্ত-রূপ বিদায়-সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

শুভ বৈশাখের রামনবমী তিথিতে এই পদধূলি-গ্রহণোৎসব আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্বেই লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ নাটোরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। পদধূলি-গ্রহণোৎসব যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য,—বর্ণনায় তাহা বুঝাইবার নহে। অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানী, কুমার রামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া, দীনা ভিখারিণীর ন্যায় ব্রাহ্মণগণের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন; আর ব্রাহ্মণগণ—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ়—সকলেই চরণ-ধূলি-দানে তাঁহাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছেন।—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মহারাণী প্রত্যেক ব্রাহ্মণের আসন-সমীপে উপনীত হইয়া প্রণতি-পূর্ব্বক তাঁহাদের চরণরেণু গ্রহণ করিতেছেন; আর কুমার রামকৃষ্ণ, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া, একখানি স্বর্ণপাত্রে সেই চরণ-রেণু-সমূহ সংগ্রহ করিতেছেন। এইরূপে এক এক মণ্ডপের ব্রাহ্মণগণের পদধূলি-গ্রহণ-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, আর তাঁহারা অন্য মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছেন। রামনবমী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় তিন মাসে মহারাণী লক্ষ-ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই তিন মাস কাল নাটোর-রাজধানীতে মহামহোৎসব চলিয়াছিল। সেই তিন মাস কাল যে ব্রাহ্মণ যে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ যেরূপ ভক্ষ্য-ভোজ্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—রাজ-সংসার হইতে তাঁহাকে তাহাই প্রদান করা হইয়াছিল। সে কয়েক মাস কত ব্রাহ্মণের কত আব্দারই যে

মহারাণীকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। রাম-নবমী তিথিতে—যে দিন ব্রাহ্মণগণের পদধূলি-গ্রহণ আরম্ভ হয়, সেই দিন আহারে বসিয়া, দক্ষিণ-দেশীয় কয়েক জন ব্রাহ্মণ সদ্যঃ-চাক-ভাঙ্গা মধু খাইতে চাহেন। সদ্যঃ-চাক-ভাঙ্গা মধু—হঠাৎ তখন কি প্রকারে সংগ্রহ হওয়া সম্ভবপর! সে সময়ে একে তো মধুচক্র সংগ্রহ হওয়াই দুষ্কর; তাহার উপর আবার আহারে বসিয়া ব্রাহ্মণগণের মধু-পানেচ্ছা! কি করিয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে? দুই এক দিন পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে, রাজ-ভৃত্যগণ কোন-না-কোনও স্থান হইতে মধুচক্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিত। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে মধুচক্র এখন কোথায় মিলিবে?

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর যখন ব্রাহ্মণগণের মধুপানাকাঙ্ক্ষার সমাচার মহারাণীর নিকট জ্ঞাপন করিলেন, মহারাণী তখন বড়ই চিন্তান্বিতা হইলেন। সে অসময়ে সদ্যঃ-চাক-ভাঙ্গা মধু কোথায় পাওয়া যাইবে? মহারাণীর বড়ই ভয় হইল,—"তবে কি ব্রাহ্মণ-গণের তৃপ্তিসাধন করিতে না পারিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইব? তবে কি আমার সকল কর্ম্ম পণ্ড হইবে?" মহারাণী, এ বিষয়ে দয়ারাম রায়ের সহিত চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে পরামর্শ করিতে কহিলেন; বলিলেন,—"যদি কোনও উপায় থাকে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন। এ অবস্থায় যদি কেহ ঐরূপ মধু সংগ্রহ করিতে পারেন, আমি তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার দিব। আপনি সে পুরস্কারের বিষয় এখনই ঘোষণা করিয়া দেন।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে এই কথা বলিয়া, মহারাণী ভবানী মনে মনে জগজ্জননীকে ডাকিলেন—"হে মা ভবানী! যেন আমার কর্ম্ম পণ্ড না হয়!"

এই সময় দয়ারাম রায় আসিয়া কহিলেন,—"মা! কোনও ভাবনা নাই। আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে কোনও বিঘ্ন ঘটিবে না। আমি ভাণ্ডারে সন্ধান করিতে গিয়া শুনিলাম, মধুর অভাব হইবে না। তাই তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপে কোথা হইতে মধু সংগ্রহ হইল?"

দয়ারাম।—"নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একখানি নৌকা করিয়া অনেকগুলি মধুর চাক পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেগুলি নৌকার মধ্যে ঝুলান আছে। মক্ষিকাগণ এখনও সে মধুচক্র পরিত্যাগ করে নাই। নৌকা হইতে সেই মধু আনয়নের জন্য রামরূপকে পাঠাইয়াছি। এখনই মধু আসিয়া পৌঁছিবে।"

মহারাণীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে মা-ভবানীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। এই মধু-সংগ্রহ উপলক্ষে দয়ারাম রায়ের উপর মহারাণী এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, এই সূত্রে তিনি দয়ারাম রায়কে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সে সম্পত্তি আজি পর্য্যন্ত দয়ারাম রায়ের বংশধরগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

অনতিবিলম্বে মধুচক্র লইয়া রামরূপ প্রত্যাবৃত্ত হইল। চন্দ্র-নারায়ণ ঠাকুর উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করাইলেন। সেই সদ্যঃ-চাক-ভাঙ্গা মধু প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মহারাণী ভবানীর জয়-নিনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল।

* * *

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুরোদ্গম।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণ-উৎসব শেষ হইলে, ব্রাহ্মণগণ একে একে বিদায়-গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদায়ের ভার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণের উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং বিদায়-দান-ক্রিয়া অল্প দিন মধ্যেই সমাধা হইল। কোনও ব্রাহ্মণ কোনও বিষয়ে মহারাণী ভবানীর ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাইলেন না।

পদধূলি-গ্রহণোৎসব উপলক্ষে নাটোর রাজধানীতে গমন করিয়া, কুমার রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, রাখাল প্রতিনিয়ত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কুমার রামকৃষ্ণ প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহাদের নিকট পটমণ্ডপে আগমন করিতেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার অগ্র-পশ্চাতে পারিষদগণ উপস্থিত থাকিত। পারিষগণের সে বিষম ব্যূহ ভেদ করিয়া কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করা বা কুমারকে কোনও কথা বলা—কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, তাঁহাদিগকে সম্মুখে পাইলেই যে সকল কথা বলিতে পারা যায় এবং তাঁহারাও সকল কথায় কর্ণপাত

করেন, তাহা নহে। সুতরাং দুই তিন বার রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইলেও, রাখাল আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিবার অবসর পাইল না ;—তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কুমার রামকৃষ্ণ যখন শেষদিন পটমণ্ডপ পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন, সেদিনও রাখাল তাঁহাকে কোনও কথা বলিবার সুযোগ পাইল না।

একবার রাখাল কি-যেন-কি বলিবার জন্য উঠিয়াছিল। কিন্তু কুমারের পার্শ্বচরগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইয়া দেন। লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে—অসংখ্য বালক, যুবক, প্রৌঢ়ের মধ্যে—কুমার রামকৃষ্ণের দৃষ্টি রাখালের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি একবার তিনি যেন রাখালকে দেখিয়া তাহার সহিত কথা কহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পার্শ্বচরগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সে স্থান হইতে সরাইয়া লইয়া যান।

পটমণ্ডপে কুমারের গমনাগমন-কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের চেষ্টা যখন কোনক্রমেই ফলবতী হইল না ; তখন রাখাল লোকদ্বারা কুমারের নিকট সংবাদ প্রেরণের চেষ্টা পাইল। কিন্তু কুমারের নিকট কে সে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবে ? সাহসে ভর করিয়া, রাখাল একবার ঠাকুর মহাশয়দের একজনের নিকট আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিল ;—একবার কুমার রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইল। কিন্তু সেই ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং রামকৃষ্ণের নিকট সে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি অপর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

এইরূপে পর-পর কর্ম্মচারীদের নিকট সে সংবাদ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে সংবাদ কেহ শুনিলেন, কেহ বা শুনিলেন না। পরিশেষে সন্ধ্যার সময় উত্তর আসিল,—"কুমার বড়ই ব্যস্ত আছেন; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার তাঁহার অবসর নাই।"

রাখাল এত করিয়াও কুমার রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইল না। সে আপনাকে বড়ই অপমানিত মনে করিল। মনে মনে কহিল,—"এত অহঙ্কার! দেখিতে পাইয়াও কথা কহিল না। আমি এত করিয়া বলিয়া পাঠাইলাম, সে এত বড় হইল যে, একবার সাক্ষাৎ করিতে পারিল না! সে ঐশ্বর্য্যমদে এতই উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে!"

রাখাল অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। মনে মনে কহিল,—"আচ্ছা, থাক' রামকৃষ্ণ! তুমিই বা কেমন, আর আমিই বা কেমন, দেখা যাবে এক দিন। তোমার রাজ্য যদি ছারে-খারে দিতে পারি, তোমার এই ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব যদি চূর্ণ করিতে সমর্থ হই, তবেই আমার জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিব।"

রাখাল সেই দিনই নাটোর রাজধানী পরিত্যাগ করিল। একান্ত-মনে রামকৃষ্ণের অনিষ্ট-সাধনে, তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য অপহরণে, চেষ্টা পাইতে লাগিল।

* * *

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

---

## দান-গ্রহণ।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সকল ব্রাহ্মণ 'বিদায়' লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু একটী ব্রাহ্মণ 'বিদায়' গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে 'বিদায়ের' অর্থ প্রদান করিতে যাইলে, ব্রাহ্মণ আপত্তি করিয়া কহিলেন,—"আমি বিদায় লইব কেন?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর ধীরভাবে উত্তর দিলেন,—"রাজ-পরিবারের কল্যাণের জন্য!"

ব্রাহ্মণ।—"রাজ-পরিবারের কল্যাণ-কামনা আমি কায়-মনোবাক্যে করিতেছি। কিন্তু তাহার জন্য আমি অর্থ গ্রহণ করিব কেন?"

চন্দ্রনারায়ণ।—"দক্ষিণা ভিন্ন সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। তাই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।"

ব্রাহ্মণ।—"আপনি যেরূপ করিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা পা'ন, আমি দান-গ্রহণ করিব না।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"ব্রাহ্মণের গতি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের দান-গ্রহণে ব্রাহ্মণের কি আপত্তি থাকিতে পারে? লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের

কেহই আপত্তি করিলেন না; সকলেই হাসিহাসি-মুখে বিদায়-গ্রহণ করিলেন; আপনই বা কেন আপত্তি করিতেছেন? যদি এ দান আপনার মনঃপুত না হয়, বলুন—আমি মহারাণীকে সে বিষয় বরং জানাইতেছি।"

ব্রাহ্মণ অট্টহাসি হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"আপনি কি মনে করিতেছেন, আমি কিছু অধিক অর্থের প্রার্থী হইয়াছি? এ আপনার বড়ই ভ্রম দেখিতেছি। স্পষ্ট কথা শুনিবেন কি?—আশীর্ব্বাদ বিক্রয় করা আমার ব্যবসায় নয়।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মুখের উপর এমন কথা বলিতে পারে,—বাঙ্গালায় কি তেমন ব্রাহ্মণ কেহ আছে? চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর, ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া, ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—"আপনার কথার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তবে মহারাণীর অভিপ্রায়—যদি কোনও বিষয়ে কোন-রূপ বিঘ্ন ঘটে, মহারাণীকে তাহা জানাইতে হইবে। তাই আমার প্রার্থনা,—আপনি আমার সঙ্গে একবার আসুন, মহা-রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

ব্রাহ্মণ প্রথমে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন,—"মহারাণীর সহিত সাক্ষাতের আমার কি প্রয়োজন? আমি তো মহারাণীর নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ-প্রার্থী নই। তবে আমি কি জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—"যে সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আপনি তাঁহাকে পদধূলি দান করিতে আসিয়াছেন, সেই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই আপনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—এই আমার প্রার্থনা। আপনি দক্ষিণা না লউন, একবার

মহারাণীর সমক্ষে আপনাকে উপস্থিত করিতে পারিলেই আমার কার্য্য সমাধা হয়।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—“আপনার যখন এতই আগ্রহ, চলুন, আমি মহারাণীকে ও কুমার বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসি। কিন্তু আমার প্রার্থনা,—আপনি আমায় দান-গ্রহণের জন্য কোনরূপ অনুরোধ করিবেন না।”

মহারাণী পূজার দালানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বিদায়-গ্রহণে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, সেখানে বসিয়া তাহারই তত্ত্ব লইতেছিলেন। কুমার রামকৃষ্ণ, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, আগন্তুকগণের অভিবাদন করিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর সেখানে উপনীত হইলে, মহারাণী স-সম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কুমার রামকৃষ্ণও ব্রাহ্মণের চরণে প্রণত হইলেন। মহারাণীর সম্মুখে ব্রাহ্মণের জন্য বসিবার আসন প্রদত্ত হইল। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর সেই আসনে ব্রাহ্মণকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—“না — আমি বসিব না। আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি; আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইব।”

ব্রাহ্মণ ফিরিয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহারাণী সবিস্ময়ে ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ব্রাহ্মণের শরীর হইতে কি যেন এক দিব্য-জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ সত্যই তেজঃপুঞ্জকলেবর। বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ অতীত হইয়াছে; কিন্তু তিনি এখনও যুবজনোচিত বল-সম্পন্ন। মস্তকের কেশরাশি শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে দেহের

শান্তা যেন অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বয়সে শরীরের লাবণ্য যেন নূতনভাবে বিকশিত হইয়াছে। তাঁহার আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগলের জ্যোতিঃ একটুও পরিম্লান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দীর্ঘদেহ, উন্নত ললাট, আজানুলম্বিত বাহু—সকল শুভলক্ষণই ব্রাহ্মণের দেহে বিদ্যমান। তাঁহার গৌরাঙ্গ-দেহে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ কি এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিয়াছে! তাঁহার গাত্রাবরণ উত্তরীয় ভেদ করিয়া, তাঁহার দেহজ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে।

আশীর্ব্বাদ করিয়াই ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইতেছেন, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের অনুরোধে কর্ণপাত করিতেছেন না; তদ্দৃষ্টে মহারাণী যুক্তকরে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর! যখন অনুগ্রহ করিয়া পদধূলি প্রদান করিয়াছেন, তখন দক্ষিণা-গ্রহণে কেন আপত্তি করিতেছেন?"

ব্রাহ্মণ বিনীত-স্বরে উত্তর দিলেন,—"মা! আমি যে দান গ্রহণ করিব না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি! আমার গুরুদেবের উপদেশ,—ব্রাহ্মণের কোনও বিষয়ে লোভ করিতে নাই। দান-গ্রহণে লোভের উৎপত্তি। আমি কিরূপে গুরুর উপদেশ অমান্য করিব?"

মহারাণী।—"তবে কি আমার শুভকার্য্য পণ্ড হইবে? আমি আপনার শরণাপন্ন।"

ব্রাহ্মণ।—"মা! আপনি অমন কথা বলিতেছেন কেন? আমি তো প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। আপনার কাজ কেন পণ্ড হইবে?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া, ব্রাহ্মণকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন,—"ব্রাহ্মণের দান-গ্রহণে ব্রাহ্মণের আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না।"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি সমস্তই বুঝিয়াছি। কিন্তু আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, —আশীর্ব্বাদ বিক্রয় করা আমার ব্যবসায় নয়। নিস্পৃহ নির্লোভ হওয়াই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর পুনরায় শাস্ত্রবাক্য আবৃত্তি করিলেন; পুনরায় ব্রাহ্মণকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। ব্রাহ্মণও উত্তর দিতে ক্রটি করিলেন না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"লোভই নাশের কারণ।" শাস্ত্রবাক্য-উদ্ধারে দেখাইলেন-"স তু নাশ কারণং। যথা—

লোভ-প্রমাদ-বিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতি ত্রিভিঃ।
তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ প্রমাদো নো ন বিশ্বসেৎ॥"

আর বাদানুবাদ অনাবশ্যক। সুতরাং চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কদাচ তাহা অস্বীকার করি না। নিস্পৃহ নির্লোভ হওয়াই যে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, তাহাতে কি আর কোনও সংশয় আছে? তবে মহারাণীর কার্য্য যাহাতে পণ্ড না হয়, তাহাও তো আপনাকে দেখিতে হইবে!"

মহারাণীও বিনীত-স্বরে কহিলেন,—"আমার ব্রত যাহাতে উদ্‌যাপন হয়, আপনিই তাহার ব্যবস্থা করুন। আমার এই মাত্র প্রার্থনা।"

মহারাণীর বাক্যে বিচলিত হইয়া, বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন,—"মা! সংসারের সহিত দারুণ সংগ্রাম করিয়াও সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছি না। আবার কেন আমায় নূতন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চান! দান-গ্রহণ যে বিষম বন্ধন মা! পূর্ব্বজন্মের সহস্র বন্ধনের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি;

আবার ইহজন্মের নূতন বন্ধন সাধ করিয়া গলায় পরিব কেন—মা!”

“তবে উপায় কি হবে—বাবা!” এই বলিয়া মহারাণী ব্রাহ্মণের পদযুগল ধারণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ একটু বিচলিত হইলেন; উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, —“মা! তুই আজ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করালি! তোর দান আমি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু একটী কথা—”

ব্রাহ্মণ আবার কি কথা বলিবেন!—সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মহারাণী ভবানী চাহিয়া রহিলেন; কুমার রামকৃষ্ণ চাহিয়া রহিলেন; চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর চাহিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—“একটী কথা—এই দান-প্রদত্ত সামগ্রী আমি কিছুই সঙ্গে লইব না। এ সমস্তই তোর জিম্মায় রহিল। ঐ দেখ মা!—দেশব্যাপী ঘোর অশান্তির অনল প্রজ্বলিত-প্রায়। সে অনলে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-তৃণ-গুল্ম-লতা পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইবে; আর তুই মা, তখন অন্নপূর্ণা-রূপে অন্ন-বিতরণ করবি। সেই সঙ্গে মা, আমার এই দান-প্রাপ্ত অর্থে যদি একজনেরও—একটী প্রাণীরও প্রাণ বাঁচাতে পারিস্, সেই চেষ্টা করিস্; সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই অর্থ আমি তোর কাছে গচ্ছিত রেখে গেলাম।”

ব্রাহ্মণ এই বলিয়া দানদত্ত সামগ্রী স্পর্শ করিয়া মহারাণীর পার্শ্বে তাহা রাখিয়া দিলেন।

মহারাণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। একবার বিনীত-স্বরে কহিলেন,—“আপনি যে বন্ধনের আশঙ্কায় আকুল

হইয়াছেন, আমায় কি তবে সেই বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া যাইতে চাহেন ?”

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরও কহিলেন,—“দান-দত্ত বিত্ত আপনার। পরবিত্ত-রক্ষাও কি বন্ধন নহে ?”

মহারাণীও সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন,—“পরবিত্ত রক্ষাও একপ্রকার বন্ধন। আপনি কেন আমায় সেই বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছেন ?”

ব্রাহ্মণ সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না; বলিলেন,—“মা! তোর ভাবনা কি ? তোর বন্ধন আপনিই মোচন হইবে।” এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন।

কুমার রামকৃষ্ণের চিত্ত আবার এক নূতন ভাবনা স্রোতে ভাসমান হইল। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়াছিলেন,—‘মুক্তি-দানই বন্ধন-মোচন।’ ভবানী-মন্দিরের রাজপুরোহিতের নিকট শুনিয়াছিলেন,—‘বলিদানে বন্ধন-মোচন।’ আজ ব্রাহ্মণের নিকট শুনিলেন,—‘দান-গ্রহণ না করাই বন্ধন-মোচন।’ জননী আবার কহিলেন,—‘পরবিত্ত-রক্ষায় বন্ধন।’

রামকৃষ্ণ ভাবিয়া কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না।

* * *

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### সমস্যা-নিরসনে!

"The cloud, which, intercepting the clear light,
Hangs o'er thy eyes, and blunts thy mortal sight,
I will remove."

—*Addison.*

বারি-বিন্দুর আশায় চাতক আকাশের পানে চাহিয়া আছে। 'ফটিক-জল'—'ফটিক-জল' করিয়া, পাখী পাগল হইয়া গেল। সম্মুখে স্বচ্ছ সরোবর পড়িয়া আছে; পদপ্রান্তে নির্ম্মল বাহিনী তটিনী কুলুকুলু বহিতেছে; অদূরে অতল জলনিধি বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া আছেন; ক্ষুদ্র পাখীর, এত জলেও তৃষ্ণা নিবারণ হয় না?

মানুষ! তোমারও সেই দশা! তুমি তো সংসার-সাগরে পড়িয়া নিয়ত হাবুডুবু খাইতেছ! তোমারই বা তৃষ্ণা মিটিল কৈ? বিকারের রোগী!—যতই জলপান করিতেছ, তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে না কি? আজি ধনতৃষ্ণা, কালি যশোলিপ্সা—তোমার পিপাসা কবে মিটিবে?

একবার চাতক হইয়া চাহিতে পার? বারি-বিন্দুর আশায় এক বার আকাশের পানে চাহিয়া ডাকিতে পার? পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, আকাশের পানে চাহিয়া ডাকিয়াছিল—'কোথা ভগবান করুণা-নিদান।' তার তো পিপাসা মিটিয়াছিল! আহা!—বারিবিন্দু নয়—সে যে অমৃতবিন্দু! বিকারের রোগীর তাহাই উপযোগী।

রোগের যাতনায়, দারুণ পিপাসায় নিশিদিন ছটফ্রুট করিতেছ! প্রাণ!—একবার চাতক হইতে পারিবে না!

কুমার রামকৃষ্ণ তো চাতক হইতে পারিলেন না! তবে তাঁহার পিপাসার কি প্রকারে নিবৃত্তি হইবে? তাঁহার চিত্ত—শত-চিন্তায় শত-সংশয়-প্রবাহে আন্দোলিত! কি করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন?

দারুণ সংশয়! এ সংশয় কে দূর করিবে? রামকৃষ্ণ কখনও মনে করেন,—"সুখ কি? সুখ কোথায় পাই? ঐশ্বর্য্যই কি সুখের নিদান? যদি তাহাই হয়, তবে ব্রাহ্মণ কেন ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? মা কেন ঐশ্বর্য্যে বন্ধন-ভয় পাইলেন? তবে কি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগই সুখের নিদান?"

পরক্ষণেই আবার তাঁহার মনে হয়,—"না—না! তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে! আমার পিতা ঐশ্বর্য্যরূপ সুখের জন্য আমাকে রাজ-পরিবারে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'এ ঐশ্বর্য্য-লাভে তাঁহারও সুখ-শান্তির সম্ভাবনা, আমারও সুখ-শান্তির সম্ভাবনা।' আমার পিতৃদেব কখনও অসঙ্গত কথা কহিতে পারেন না। বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই,—যাহাদের ঐশ্বর্য্য নাই তাহারা সুখী নহে, ঐশ্বর্য্যের জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিত্য নিত্য আমাদের দুয়ারে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিতেছে; তখন কেমন করিয়া বলিতে পারি,—ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই! লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ অর্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন বটে; কিন্তু আর তো কৈ কেহ পারিলেন না? তবে কি করিয়া বলিব,—ঐশ্বর্য্য সুখের মূলীভূত নহে! কেমন করিয়াই বা না বলিব,—ঐশ্বর্য্যই সুখের মূলীভূত!"

যখন সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে হয়, রামকৃষ্ণ তখন ভাবেন—"সন্ন্যাসীই বা তবে কি বলিলেন! যদি বন্ধন-মোচনই সুখ হয়, আমি কি রাজভবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিলেই সুখী হইব? কিন্তু তাহাও তো আমার মনে হয় না! এমন বসন-ভূষণ, এমন আহার-বিহার—আমি কোথায় পাইব? এখানে আমার যে সম্মান, আমার পিত্রালয়ে তো সে সম্মান কখনও দেখি নাই! এই রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে পথে বাহির হইলেই যে আমি সুখী হইতে পারিব, ভ্রমেও তো আমার মনে হয় না? তবে সন্ন্যাসী আমায় সে কি বুঝাইলেন?"

পরক্ষণেই আবার মনে হয়,—"তবে কি রাজপুরোহিতের কথাই সত্য! বলিদানে পশুর মুক্তিলাভ হইল কি না,—যদিও তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু বলি-প্রদত্ত প্রসাদ-ভক্ষণে আমাদের রসনার পরিতৃপ্তি নিশ্চয়ই হইয়া থাকে! সে সুখী হইল কি না,—সে সন্ধানে আমার প্রয়োজন কি? আমি তো সুখী হই! তবে কি রাজপুরোহিতের কথাই সত্য! তবে কি পরপীড়ন—পরপ্রাণ-হরণই সুখের নিদান।" রামকৃষ্ণ স্থির করিলেন,—পরপীড়নই সুখের আকর।

পরক্ষণেই পুনরায় চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। "পরপীড়নে সুখ!—তাই বা কি করিয়া বলিতে পারি! বলিতেছি বটে,—বলি-প্রদত্ত ছাগমাংসে পরিতৃপ্তি-সুখ পাইয়াছি। কিন্তু সে সুখ কত অল্প—কত ক্ষণস্থায়ী! মায়ের মন্দিরে দাঁড়াইয়া যখন সেই বলিদানের ছাগশিশুগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়াছিলাম, তখন প্রাণটা কেমন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল! এখনও সে স্মৃতি

মনোমধ্যে উদয় হইলে, প্রাণ বিদীর্ণ হয়। তবে কেমন করিয়া বলি,—পরপীড়নই মুক্তি—পরপীড়নই সুখের আকর! বলিদান —পরপীড়ন ভিন্ন আর কি হইতে পারে!”

রামকৃষ্ণের চিন্তার গতি সহস্র ধারায় প্রবাহিত। সহস্রমুখী চিন্তার প্রবাহে কুমার রামকৃষ্ণ সহস্ররূপে বিচালিত হইতেছেন।

প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত পরিখা। সে পরিখা দেখিলে মনে হয়—একটী স্রোতস্বিনী যেন রাজপুরী পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই পরিখার তীরে, একটী আম্রবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, কুমার রামকৃষ্ণ ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন। অপরাহ্নে—কত বেলা থাকিতে,—কুমার সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া বসিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়; তথাপি তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করেন নাই। এখন, সান্ধ্য-সমীর-প্রবাহে পরিখার জলরাশি যেমন বিচঞ্চল হইতেছিল, বীচি-বিক্ষোভিত ও পরিকম্পিত হইতেছিল, চিন্তার প্রবাহে কুমারের চিত্তও সেইরূপ বিচঞ্চল ও বিক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কোনদিকে দৃক্‌পাত নাই। পরিখার জলরাশি মৃদুল হিল্লোলে কিরূপ নৃত্য করিতেছে, অথবা সুনির্ম্মল সান্ধ্য-গগন-প্রান্তে সূর্য্যদেব কিরূপভাবে লুক্কায়িত হইতেছেন,—প্রকৃতির সে সৌন্দর্য্যের প্রতি কুমার রামকৃষ্ণ একবারও দৃক্‌পাত করিতেছিলেন না। ভাবনার প্রবাহে ভাসমান হইয়া, তিনি আপনাতেই আপনি বিভোর হইয়া ছিলেন। মুখে প্রায়ই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। তবে মাঝে মাঝে এক এক বার আপন মনে আপনা-আপনি বলিতেছিলেন,—“দারুণ সংশয়! আমার এ সংশয়ের কি মীমাংসা হইবে না!”

মহারাণী ভবানী, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কুমারকে না দেখিয়া, প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে তাঁহার সন্ধান করিতেছিলেন। সন্ধান করিতে করিতে ছাদের উপর উঠিয়া মহারাণী হঠাৎ দেখিতে পাইলেন,—অন্দর-সমীপস্থ পরিখার পার্শ্বে আম্রবৃক্ষ-মূলে কুমার বসিয়া আছেন। দেখিয়া, ছাদ হইতে নামিয়া, মহারাণী আপনিই কুমারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য গমন করিলেন।

মহারাণী ধীরে ধীরে কুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন। কুমার তখন তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি একমনে একই ভাবনায় বিভোর। সুতরাং মহারাণীর আগমনের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। মহারাণীও, কুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অনেক ক্ষণ এক-দৃষ্টে কুমারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—কুমারের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ভাবিয়া ভাবিয়া কুমার কোনই মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। যখন কোনও মীমাংসা হইল না, কুমার আবেগ-ভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"তবে কি মীমাংসা হইবে না!"

সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ব হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল,—"মীমাংসা অবশ্যই হইবে। তুমি এস—আমার সঙ্গে এস।"

স্বর শুনিয়া কুমারের মনে হইল,—তিনি যেন দৈববাণী শুনিলেন। কুমার চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মহারাণী ভবানী দণ্ডায়মানা। দেখিয়াই "মা" বলিয়া কুমার সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাণী কহিলেন,—"বৃথা ভাবনায় আবশ্যক নাই। এ সংশয়ের মীমাংসা শীঘ্রই হইবে।" এই বলিয়া, কুমারের হস্তধারণ-পূর্ব্বক, মহারাণী প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

* * *

শিক্ষার অভাবে মানুষ জীবনগতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। তবে এ বয়সে সেরূপ শিক্ষা উপযোগী হইবে কিনা, তাহাও বিবেচনার বিষয়। মস্তিষ্ক পরিপক্ক না হইলে, শাস্ত্র-তত্ত্ব অনুধাবন সম্ভবপর কি?"

চন্দ্রনারায়ণ।—"সদ্‌গুরুর উপদেশে মন অনেকটা স্থৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে। আমার মনে হয়, কুমার যদি এখন দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরুর নিকট যথোপযুক্ত শাস্ত্রোপদেশ প্রাপ্ত হন, কুমারের মতি পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর।"

দয়ারাম রায়।—"সেও এক সদুপায় বটে। তবে সঙ্গে সঙ্গে সংসারের প্রতি কুমারের মন যাহাতে আকৃষ্ট হয়, তৎপক্ষেও যত্ন করা কর্ত্তব্য। গুরূপদেশে চিত্ত সাধারণতঃ ভগবচ্চিন্তায় প্রধাবিত হয়। তাহাতে সংসারাসক্তি নাও আসিতে পারে।"

চন্দ্রনারায়ণ।—"আপনি তাহা হইলে কিরূপ যুক্তি স্থির করেন?"

দয়ারাম রায়।—"কুমার দীক্ষিত হইয়া গুরুর নিকট শাস্ত্র-তত্ত্ব শিক্ষা করুন,—সে পক্ষে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তবে কুমারকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইলে, আমার মনে হয়, আর একটী ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমি বিবেচনা করি,—বিবাহ-বন্ধনে কুমারকে এই সময়ে আবদ্ধ করিতে পারিলে, আমাদের সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কুমার একদিকে যেমন গুরুর নিকট সুশিক্ষা লাভ করিবেন, অন্যদিকে তেমনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন। এ ব্যবস্থায়, দুই দিকই রক্ষা হইবে। কেমন—এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?"

চন্দ্রনারায়ণ।—"আপনার এ পরামর্শ সমীচীন বটে।

কুমারের বিবাহ দেওয়া আমারও মত। বিবাহ হইলে, কুমারের চিত্ত নিশ্চয় সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। দীক্ষিত হইলেও গুরূপদেশে কুমারের মনের মালিন্য দুরীভূত হইবে।"

দয়ারাম রায়।—"গুরুগ্রহণ-সম্বন্ধেও আমার একটু বক্তব্য আছে। আপনারা তো এ সংসারের গুরুপদে অধিষ্ঠিত আছেনই; অধিকন্তু আমার ইচ্ছা—কুমার মহারাণীর নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করেন। তাহাতে মহারাণীর প্রতি কুমারের ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং মহারাণীর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে কুমার অবশ্যই চেষ্টা পাইবেন। আপনারা গুরুর গুরুরূপে কুমারকে উপদেশ দিবেন; কুমার ভক্তিসহকারে আপনাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া অনায়াসে গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"আপনি যথার্থ কথাই কহিয়াছেন; আমারও সেই ইচ্ছা। এরূপ হইলে, কুমারের মাতৃভক্তি বৃদ্ধি পাইবে; কুমার মাতার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবে। এ প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি।"

মহারাণী ভবানী একটু দ্বিধা ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে অন্যমত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মাতৃদেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে ঠাকুরবংশীয় আমরা একটুও ক্ষুণ্ণ হইব না। রাজৈশ্বর্য্য যাহাতে রক্ষা হয়, তাহার সুব্যবস্থা করাই আমাদের অভিপ্রায়। কুমার যদি মহারাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, মহারাণীর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলেন, আমার বিশ্বাস, সকল দিকেই সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর মহারাণী ভবানীকে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে একান্তভাবে অনুরোধ করিলেন। মহারাণী চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

পরামর্শে ধার্য্য হইল,—'শীঘ্রই কুমার রামকৃষ্ণের বিবাহের বন্দোবস্ত স্থির হইবে।' পরামর্শে ধার্য্য হইল,—'কুমারকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার চিন্তার গতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।' পরামর্শে ধার্য্য হইল,—"মহারাণী ভবানীর নিকট কুমার রামকৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।" পরামর্শে স্থির হইল,—'গুরুর গুরুরূপে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর এবং তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর কুমারের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিবেন।' পরামর্শে স্থির হইল,—'কুমার যাহাতে আর নির্জ্জন-চিন্তায় কালাতিপাত করিতে না পারেন, সর্ব্বদা তিনি যাহাতে উপযুক্ত সহচরগণে পরিবৃত থাকেন,—তাহারও ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" পরামর্শে স্থির হইল,—'তাহা হইলেই কুমারের সকল দুশ্চিন্তা দূর হইবে,—'কুমার সংসারী হইবেন।' যেরূপ পরামর্শ হইল, তদ্রূপ অনুষ্ঠান-আয়োজনেরও ত্রুটি রহিল না।

* * *

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## তৃতীয় খণ্ড।

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হে অর্জ্জুন! যে পুরুষ মনের বলে ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা কর্ম্মরূপ যোগানুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

* *
*

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### অনুশোচনা।

"Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!—"

—*Shakespeare.*

"নৃশংস!—নরপিশাচ!—বিশ্বাসঘাতক!"

এই বলিয়া মীরজাফর শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চক্ষু বিদীর্ণ করিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"মহারাজ! এখনও আপনার ভ্রান্তি দূর হইল না!"

পলাশী-যুদ্ধের পর সাত বৎসর অতীত-প্রায়। বক্সারের সমর-ক্ষেত্রে মীরকাশেমের ক্ষীণ আশার রশ্মিটুকু বিলুপ্ত হওয়ায়, নবাব মীরজাফর পুনরায় বাঙ্গালার মসনদে সমাসীন। কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা টাকার জন্য এবারও তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার নবাবী তাঁহার পক্ষে এখন কণ্টক-স্বরূপ। দুর্ভাবনায়—দুশ্চিন্তায়—অনুশোচনার তীব্রতাপে—তিনি এখন কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, মীরজাফর যখন সঙ্কট পীড়ায় কাতর;—আপনার দক্ষিণহস্ত-স্থানীয় মহারাজ নন্দকুমারকে

নিকটে ডাকিয়া. বিষয়কর্ম্ম-সম্পর্কে পরামর্শ করিতেছেন। যতই পুরাতন কাহিনী স্মৃতি-পথে উদিত হইতেছে. ততই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন।

সেই উত্তেজনা-বশেই, শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া, মীরজাফর চীৎকার করিয়া উঠিলেন,--"নৃশংস!--নরপিশাচ!-বিশ্বাসঘাতক!"

মহারাজ নন্দকুমার ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"আপনি বৃথা অনুশোচনা করিতেছেন। গতানুশোচনায় এ সময় চঞ্চল-চিত্ত হওয়া কখনই বিধেয় নহে। আমরা আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি মাত্র। অপরের প্রতি দোষারোপ করিয়া কি ফললাভ হইবে? দোষ আমাদের অদৃষ্টের!"

মীরজাফর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—""আমি যে তাহাকে বড়ই বিশ্বাস করিয়াছিলাম! সে যে এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, আমি স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই! এরূপ ঘটিবে বুঝিলে, আমি কি কখনও সিরাজ-উদ্দৌলার সর্ব্বনাশ-সাধনে অগ্রসর হইতাম?"

নন্দকুমার আবার কহিলেন,—"সে সকল পুরাতন কথা এখন আর কেন মনে করেন? যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। এখন দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। শরীর যাহাতে সুস্থ হয়, তৎপক্ষে মনোযোগী হউন।"

মীরজাফর বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—'মহারাজ! বড় কষ্ট—বড় যন্ত্রণা! আমার আর এক দণ্ড বাঁচিবার সাধ নাই! সিরাজ যখন আমার চরণতলে উষ্ণীষ রাখিয়া আত্মসমর্পণ করিল, আমি যখন তাহাকে অভয় দিয়া বলিলাম,—"সিরাজ! তোমার কোনও ভাবনা নাই'; পরিশেষে আবার যখন কোরাণ

হইলাম। তখন স্বপ্নেও যদি একবার মনে হইত—আমার এই পরিণাম সংঘটিত হইবে!"

মহারাজ নন্দকুমার ক্লাইবের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং মীরজাফর কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ ক্লাইবের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণে তিনি একটু বিচলিত হইলেন। তিনি মীর-জাফরের কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন,—"আপনি পুনঃপুনঃ বলিতেছেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ক্লাইবের কোনও দোষ দেখিতে পাই না। আপনার সম্বন্ধে ক্লাইব যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথা কি তিনি রক্ষা করেন নাই? তিনি বলিয়াছিলেন—সিরাজের হস্ত হইতে সিংহাসন গ্রহণ করিয়া সে সিংহাসন তিনি আপনাকেই সমর্পণ করিবেন। সে সত্য তিনি পালন করেন নাই কি? তবে ক্লাইবের কি দোষ?"

মীরজাফর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"ক্লাইবের কি দোষ! আপনি কি জানেন না—ক্লাইবের কি দোষ! নিরীহ উমীচাঁদ ক্লাইবের প্ররোচনায় কি অসম-সাহসিক কাজই না করিয়াছিল! কিন্তু তাহার শেষ পরিণাম কি হইল? ক্লাইব জাল দলিল উপস্থিত করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করিলেন! আর সেই প্রবঞ্চনার ফলে উমীচাঁদ পাগল হইয়া ইহলীলা সংবরণ করিল।"

নন্দকুমার।—"উমীচাঁদের পক্ষাবলম্বন আপনার মুখে শোভা পায় না। উমীচাঁদ যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহার পরিণাম ঐরূপ হওয়াই বিধেয়। আমি যখন হুগলীর ফৌজদার, উমীচাঁদই আমায় নবাবের বিরুদ্ধাচরণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আমি যে ইংরেজগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য ওলন্দাজদিগের সহিত সমরক্ষেত্রে মিলিত হই নাই, সে কেবল উমীচাঁদেরই

প্ররোচনায়। উমীচাঁদ স্বদেশদ্রোহী। তাহার স্বদেশদ্রোহিতার পরিণাম-ফল ঠিকই হইয়াছে।”

মীরজাফর মনে মনে হাসিলেন; মনে মনে বলিলেন,—“যদি তাই হয় নন্দকুমার, তোমার আমার অদৃষ্টে কি ফল লিখিত আছে, কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?” প্রকাশ্যে কহিলেন,—“যতই যাহা বলুন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ অনেকেই ঘোর স্বার্থপর। তাঁহাদের চাই,—কেবল টাকা—কেবল টাকা!”

নন্দকুমার।—“তাহাই স্বাভাবিক। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এদেশে কিছু দান-খয়রাৎ-সদাব্রত করিতে আসেন নাই। তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়া অর্থের জন্যই তাঁহারা এই দূরদেশে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং অর্থসংগ্রহ-পক্ষে তাঁহাদের যে চেষ্টা, আমি তাহাতে দোষ দেখিতে পাই না। তাহাই স্বাভাবিক!”

মীরজাফর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কহিলেন,—“আপনি যে এখনও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কাম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এতাদৃশ বিশ্বাসবান্, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। আপনি কি জানেন না,—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধ্যক্ষ ভান্সিটাট আপনার প্রতি কিরূপ বিরূপ হইয়া আছেন? আমি কত করিয়া আপনাকে সহকারী নবাবের পদে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছি, তাহা আমিই জানি, আর অন্তর্য্যামীই জানেন। ভান্সিটার্টের একটুও ইচ্ছা নয় যে, নবাব-সংসারের সহিত আপনার কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে। আমি যে আজ আপনাকে ডাকিয়া আনিয়াছি, অনেক পরামর্শের জন্য। আমি বেশ বুঝিয়াছি, আমার আয়ুঃকাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালার মসনদ-সম্পর্কে আপনার সহিত

আমি একটা পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি। পরামর্শ আর কিছু নয়; পরামর্শ—আমার মৃত্যুর পর আমার কনিষ্ঠ পুত্র গোবারককে সিংহাসনে বসাইতে হইবে। কিন্তু ভান্সিটার্ট তখনও যে আপনাকে এ সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে দিবেন, তাহা আমার মনে হয় না।"

নন্দকুমার আশ্বাস-বাক্যে কহিলেন,—"সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আমি নিগূঢ় সন্ধান পাইয়াছি, ভান্সিটার্ট শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন; আর ক্লাইব পুনরায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিতে আসিতেছেন। ক্লাইব আসিলে, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমার ক্ষমতা কেহই লোপ করিতে পারিবে না। নবাব-সংসারের সংশ্রব-ছিন্ন হইলে, তিনিই আমাকে প্রথম আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মুন্সী ও দেওয়ান পদ লাভ করিয়া, তাঁহারই অনুগ্রহে, ক্রমশঃ আমি হুগলী ও হিজ্‌লী প্রভৃতির দেওয়ানী পদ পাই। তার পর, কিরূপে এই সহকারী নবাবের পদে উন্নীত হইয়াছি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ক্লাইব যখন আসিতেছেন, আমার উদ্দেশ্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে।"

মীরজাফর।—"আবার ক্লাইব! সে একবার আসিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন ওলোট-পালোট করিয়া গিয়াছে। এবার আসিয়া, না-জানি আবার কি নূতন অনর্থ-সাধন করিয়া যাইবে! সে আবার আসিতেছে শুনিলে, আমি মরণেও শান্তি পাইব না।"

নন্দকুমার।—"আপনি ক্লাইবের উপরই সকল দোষ চাপাইতেছেন। কিন্তু আপনার হাত হইতে নবাবী কাড়িয়া লইয়া মীরকাশেমকে নবাবী দেওয়ার সময়, ক্লাইব কোথায় ছিলেন? পলাশী যুদ্ধের পর আপনাকে মসনদে বসাইয়াও ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, ক্লাইব বিলাত চলিয়া যান। ১৭৬১

খৃষ্টাব্দে আপনার সিংহাসন-চ্যুতি ঘটে। কিন্তু তখন তো সর্ব্বেসর্ব্বা—ভান্সিটার্ট! ভান্সিটার্টই আপনার হাত হইতে নবাবী কাড়িয়া লন; তিনিই আবার, কয়েক মাস হইল, আপনাকে নবাবীতে অধিষ্ঠিত করাইয়াছেন। আপনার এই সিংহাসনচ্যুতি ও সিংহাসন-প্রাপ্তির বিষয়ে ক্লাইবের কি হাত ছিল?"

মীরাজফর।—"এক ভস্ম, আর ছার! যা'ক্—ও সকল কথায় আর কাজ নাই। এখন কি ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, তাহাই বিচার করিয়া দেখুন। আমার কর্ম্মফল আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করিতেছি!"

পুনরায় অনুশোচনায় মীরজাফরের চক্ষু ছলছল হইয়া আসিল। মীরজাফর আত্মগ্লানি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"আমার সিংহাসন-চ্যুতি ও সিংহাসন-প্রাপ্তির কথাই বা কি বলিতেছেন! আমি যে আজি এই মহাব্যাধিগ্রস্ত, আমার পাপের ফলই তাহার কারণ নহে কি? মহারাজ!—কুষ্ঠব্যাধি কি অল্প পাপে হয়? বিশ্বাসঘাতকতা মহা পাপ। আমি মহাপাপী, তাই এই মহারোগগ্রস্ত।"

নন্দকুমার বাধা দিয়া কহিলেন,—"আপনি ও-সকল অনুশোচনার কথা কেন কহিতেছেন? আপনার বয়ঃক্রম চুয়াত্তর বৎসর অতীত-প্রায়। এ বয়সে ব্যায়রাম-পীড়া স্বাভাবিক। তার জন্য অনুতপ্ত হইতেছেন কেন?"

মীরজাফর।—"মহারাজ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অনুতপ্ত হইতেছি কেন? আমার প্রিয়পুত্র মীরণ বজ্রাঘাতে নিহত হইল; সে কি পাপের ফল নহে? আপনি কি বুঝিতেছেন

না—আমি দিবানিশি কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি! আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া সারা হইলাম। এখন মরণই আমার মঙ্গল। তবে মরণের পর কিসে শান্তি পাই, সেই ভাবনায় বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি। আপনি বলিতে পারেন—মরণের পর আমার শান্তির উপায় কিছু আছে কি?"

নন্দকুমার অন্য কথার অবতারণা করিলেন। বলিলেন,—"আপনার মৃত্যুর পর আপনার পুত্র মোবারক-উদ্দৌলা যাহাতে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন, সে ব্যবস্থা এখন হইতে করিয়া রাখাই শ্রেয়ঃ।"

মীরজাফর।—"সে বিষয়ে যাহা ঘটিবে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। মোবারক হয় তো নামে বাঙ্গালার নবাবী লাভ করিবে; কিন্তু জানিবেন—নবাবীর এই শেষ। কেবল নবাবীর কথাই বা বলি কেন, হয় তো ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যেরও এই শেষ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠার দিনও ফুরাইয়া আসিবে। আমার অন্তরাত্মা পুনঃপুনঃ আপনাকে সেই কথা বলিবার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিতেছে। আমার ন্যায় আপনিও এমন অনেক বিষয়ে লিপ্ত আছেন, পরিণামে যাহার জন্য আপনাকেও আমার ন্যায় অনুতপ্ত হইতে হইবে।"

মীরজাফরের বাক্যের গতি আবার পরিবর্ত্তিত হইল। মীরজাফর রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পুনরায় নন্দকুমারকে কহিলেন,—"মহারাজ! এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আমার শান্তিলাভের উপায় কিছু বলিতে পারেন কি? আমি শুনিয়াছি; আপনাদের দেব-দেবী অনেকেই জাগ্রৎ আছেন। আমার এই

কষ্ট দূর করিবার জন্য কোনও দেব-দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিতে পারা যায় না কি?"

নন্দকুমার।—"হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতি আপনার বিশ্বাস আছে কি? আমাদের দেবতা সত্যই জাগ্রৎ দেবতা। আপনি মুসলমান হইয়াও যদি ভক্তিসহকারে সে দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার রোগের শান্তি হয়।"

মীরজাফর।—"আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।"

নন্দকুমার।—"আপনি ভক্তিসহকারে দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিতে পারেন? মা আমার সাক্ষাৎ শান্তিরূপিণী।"

নন্দকুমারের বাক্যে মীরজাফরের ব্যাকুলতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। মীরজাফর ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"তবে আপনি কি আমায় দেবীর চরণামৃত আনিয়া দিতে পারিবেন? আমি নিশ্চয় জানিয়াছি—আর বেশী দিন বাঁচিব না। যত সত্বর পারেন, আপনি মায়ের চরণামৃত আনিয়া দেন।"

নন্দকুমার।—"আপনার যখন বিশ্বাস হইয়াছে, আগামী কল্য দেবীর পূজার পর তাঁহার চরণামৃত আনিয়া আপনাকে প্রদান করিব। সেই চরণামৃত পান করিবেন, মস্তকে রাখিবেন, সর্ব্বসন্তাপ দূরীভূত হইবে।"

দুই পরামর্শই স্থির হইল। মোবারক উদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইবার পক্ষে চেষ্টা হইবে। মীরজাফরের অনুতপ্ত প্রাণে শান্তিদানের জন্য মহারাজ তাঁহাকে চরণামৃত আনিয়া দিবেন।

* * *

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## শান্তি কোথায়?

"Can'st thou not minister to a mind diseas'd;
Pluck from the memory a rooted sorrow;
Raze out the written troubles of the brain,
And, with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff,
Which weighs upon the heart."

—*Shakspeare.*

মীরজাফরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নন্দকুমার বাহিরে আসিয়াছেন। নিয়ামৎ খাঁ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; সসম্মানে অভিবাদন-পূর্ব্বক নন্দকুমারকে কহিলেন,—"আপনার সন্ধানে আমি আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। আপনি বলিয়াছিলেন,—আজ নাটোরের বিবাদটা মিটাইয়া দিবেন। খাজুরা গ্রাম হইতে রঘুনন্দন লাহিড়ীর আত্মীয়গণ আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আটগ্রামের হলধর মৈত্র প্রভৃতিও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

নন্দকুমার দেখিলেন—উভয় সঙ্কট। এক দিকে নিয়ামৎ খাঁ অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন; অন্য দিকে নবাবের মন চঞ্চল হইয়া আছে। এ সময় নবাবকে বিষয়-কর্ম্ম-সম্পর্কে কোনও কথা বলিতে যাওয়াও বিধেয় নহে; অথচ, না যাইলেও

চলিতেছে না। অনেক দিন হইতে ঐ বিষয় লইয়া নানারূপ দরবার চলিয়াছে ; কিন্তু কোনই মীমাংসা হয় নাই।

নিয়ামৎ খাঁ বলিলেন,—"নবাবকে আমি বলিয়া রাখিয়াছি। তিনি আজ এ বিষয় শুনিবেন বলিয়াছেন। সময়-মত আপনাকেও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ আর এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কোনমতে উচিত নহে।"

নিয়ামৎ খাঁ—সম্পর্কে নবাব মীরজাফরের ভগ্নীপতি। নবাব-সংসারে তাঁহার প্রভুত্ব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। তিনি আসিয়া যখন অনুরোধ করিতেছেন, নন্দকুমার দ্বিরুক্তি করিতে পারেন কি? তথাপি নন্দকুমার বলিলেন,—"আমি এই মাত্র নবাবের নিকট হইতে আসিতেছি। তাঁহার মনের অবস্থা বড়ই খারাপ। আমার মানসিক অবস্থাও ভাল নহে। আজিকার দিনে এ দরবার স্থগিত রাখিলে ভাল হইত না?"

নিয়ামৎ খাঁ।—"স্থগিত রাখার কি প্রয়োজন? নবাবের মনের অবস্থা এখন আর ভাল হওয়ার আশা দেখি না। আমার ইচ্ছা, যাহা হয় আজি একটা শেষ হইয়া যাউক।"

নন্দকুমারকে নবাব-সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য নিয়ামৎ খাঁ বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—"আপনার সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত। আপনি যাহা ঠিক করিয়া দিবেন, কে তাহার অন্যথা করে?"

নন্দকুমার।—"নবাবের মেজাজ আজ ভাল নহে।"

নিয়ামৎ খাঁ 'হা-হা' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"নবাব! নবাব আবার কে? আপনিই তো সব। একবার চলুন দেখি!—নবাব কেমন আপনার কথার অন্যথা করেন!"

অগত্যা নন্দকুমার যাইতে সম্মত হইলেন। মনে মনে কহিলেন,—"খাঁ সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহা তো আর মিথ্যা নয়! আমি যাহা বলিব, সে কথায় কে আপত্তি করে?"

নিয়ামৎ খাঁ ও নন্দকুমার উভয়েই নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন।

নন্দকুমারকে বিদায় দিয়া, একাকী শয্যার উপর বসিয়া, নবাব ভূত-ভবিষ্যৎ কত-কি চিন্তা করিতেছিলেন। এক এক বার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবানকে ডাকিতেছিলেন; এক এক বার আত্মগ্লানির আবেশে মনে মনে বলিতেছিলেন,—"হায়! কি করিতে গিয়া আমি কি ফল লাভ করিলাম! কেন আমার সে দুর্ম্মতি হইয়াছিল? কেন আমি তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম? কেন আমি আমার স্বদেশের স্বজাতির বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছিলাম?" ভাবিতেছেন, আর এক এক বার ডাকিতেছেন,—"ভগবান! আমার পাপের কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

এই সময় সহসা নন্দকুমার ও নিয়ামৎ খাঁর আগমন-বার্ত্তা লইয়া সংবাদবাহী ভৃত্য নিকটে উপস্থিত হইল। কুর্ণিশ করিয়া, সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নিবেদন করিল,—"জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহারাজ নন্দকুমার ও খাঁ সাহেব অপেক্ষা করিতেছেন।"

মীরজাফর মনে মনে কহিলেন,—"আবার কেন? একটু শান্তিলাভের চেষ্টা পাইতেছি; আবার এ কি বিঘ্ন! নিয়ামৎ খাঁই বা কেন আসিতেছেন?" যাহা হউক, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে কহিলেন।

নন্দকুমার ও নিয়ামৎ খাঁ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, নবাব মীরজাফর শয্যায় বসিয়াই তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন; মিষ্টবাক্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"আসুন মহারাজ! আসুন খাঁ সাহেব! আর কি কোনও নূতন কথা আছে?"

নন্দকুমার সসম্মানে উত্তর দিলেন,—"হুজুর! তাহা না থাকিলে, এ সময় আবার আপনাকে উত্যক্ত করিতে আসিব কেন?"

মীরজাফর।—"সে কি বলেন মহারাজ! আপনারা আসেন —সে তো আমার সৌভাগ্যের বিষয়। এ ব্যায়রামের সময় আপনাদিগকে যত ক্ষণ সম্মুখে পাই, তত ক্ষণ অনেক যন্ত্রণার লাঘব হয়।"

নন্দকুমার।—"আপনি আমাদিগকে নিতান্ত ভালবাসেন; আমরাও তাই আব্দার করিতে আসি। যদি অনুমতি করেন, খাঁ সাহেব ও আমি এবার যে জন্য আসিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করি।"

মীরজাফর।—"আমার নিকট কোন কথা কহিতে আপনারা এত সঙ্কোচ-ভাব প্রকাশ করিতেছেন কেন? যাহা বলিবার জন্য আসিয়াছেন, নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন।"

নন্দকুমার।—"আপনার ন্যায় উদার মহান্ ব্যক্তির নিকট কোনও বিষয় জানাইতে কখনই সঙ্কোচ-বোধ করি নাই। তবে আজ আপনার শরীর নিতান্ত কাতর, তাই—"

মীরজাফর বাধা দিয়া কহিলেন—"সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই। আবার ফিরিয়া আসিতে হইল, এমন কি প্রয়োজন পড়িয়াছে—মহারাজ!"

যে কারণেই হউক, নন্দকুমার, সকল কথা বুঝাইয়া

বলিবার জন্য খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। নিয়ামৎ খাঁ বলিতে গেলেন; কিন্তু বলিতে বলিতে কথা আটকাইয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিতে গেলেন—"মহারাণী ভবানীর বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই তিনি তাঁহার জামাতা রঘুনন্দনকে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু জামাতা রঘুনন্দনের উত্তরাধিকারিগণ সে বিষয়-সম্পত্তি কিছুই এখন অধিকার করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা তাই আপনার নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।" নিয়ামৎ খাঁ যত কথা বলিতে পারিলেন বা না পারিলেন, মহারাজ নন্দকুমার সকল কথাই সামলাইয়া লইলেন। পরিশেষে মহারাজ নিজেই বুঝাইয়া বলিলেন,—"আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে এই সম্বন্ধে নবাব-সরকারে দরবার চলিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও বিচার-মীমাংসা হয় নাই। সংপ্রতি খাজুরা-গ্রাম হইতে রঘুনন্দনের আত্মীয়গণ নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। আটগ্রামের এক জন গণ্য-মান্য ব্যক্তি এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রদানে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন! হুজুর যদি হুকুম করেন, তাঁহাদিগকে হাজির করিতে পারি।"

নবাব ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"আজ এ দরবার স্থগিত রাখিলে হয় না?"

নন্দকুমার।—"আমারও তাই ইচ্ছা। তবে খাঁ সাহেব বড়ই ছটেপটে ধরিয়াছেন। খাঁ সাহেব বলেন—পাঁচ বৎসর হইতে এ সম্বন্ধে দরবার চলিয়াছে; এবারও আবেদনকারিগণ ছয় মাস কাল মুর্শিদাবাদে বসিয়া আছেন। একটা বিচার-মীমাংসা শেষ করিয়া দিলেই গোল চুকিয়া যায়। হুজুরের মুখের কথা

বৈ ত নয়? ন্যায্য বিষয়, ন্যায়সঙ্গত দাবী। মহারাণী ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে, এ দাবীর বিষয় তিনিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না!"

মীরজাফর।—"সকলই সত্য বটে! সকল কথাই সঙ্গত বলিতেছেন বটে! কিন্তু বলিতে পারেন কি—মহারাণীর কন্যা এখন কোথায়? আজ সাত বৎসর অতীত হইল, রঘুনন্দনের মৃত্যু হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি, সেই হইতেই মহারাণীর কন্যা তারাসুন্দরী মহারাণীর সঙ্গেই বসবাস করিতেছেন। এ অবস্থায়, আপনারা কাহার সম্পত্তি কাহাকে দিতে অনুরোধ করিতেছেন?"

নন্দকুমার।—"অনুরোধ আমাদের কিছুই নাই। অনুরোধ এই,—হুজুর দেখুন, মহারাণী আপন সম্পত্তি জামাতা রঘুনন্দনকে দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কি না? তিনি যদি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সম্পত্তিতে আবেদনকারিগণের স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে কি না?"

মীরজাফর।—"সত্য হউক, মিথ্যা হউক, আপনারা যখন বলিতেছেন, আমি সকলই মানিয়া লইতেছি। তবে আমি জানি, মহারাণী ভবানী অসামান্যা ধর্ম্মানুরাগিণী। তিনি যে কখনও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি যে কখনও পরস্ব অপহরণ করিবেন, অথবা তিনি যে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট-সাধনে চেষ্টা পাইবেন, এ বিশ্বাস আমার একটুও নাই।"

নন্দকুমার।—"সে বিশ্বাস আমারও নাই। তবে ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই হুজুরে জানান যাইতেছে। বিশেষতঃ খাঁ-সাহেব এ সম্বন্ধে প্রমাণ-পরম্পরা দেখাইতে প্রস্তুত আছেন।

তাঁহার অনুরোধেই আমি আপনার নিকট এ দরবার উপস্থিত করিয়াছি।”

নিয়ামৎ খাঁ।—“হাঁ—হাঁ! প্রমাণ আছে বৈ কি ?”

মীরজাফর।—“ভাল, খাঁ সাহেব, আপনি একটু স্থির হউন। আমি মহারাজকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। মহারাজ যদি সদুত্তর দিতে পারেন, আমি এখনই বিচার শেষ করিয়া দিব।”

এই বলিয়া মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি তীব্র-দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া মীরজাফর গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মহারাজ! আচ্ছা, আপনিই বলুন দেখি,—এ বিষয়ে আপনার অন্তরাত্মা কি বলে ? আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আর তার পর উত্তর দেন! আমার প্রশ্ন—মহারাণী ভবানী এ বিষয়ে দোষী কি নির্দ্দোষ ? বলুন,—আপনার অন্তরাত্মা কি উত্তর দেয় ?”

মহারাজ নন্দকুমার আর উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কি উত্তর দিবেন ? তিনি একবার ভাবিলেন—‘বলি, মহারাণী নির্দ্দোষ!’ আবার ভাবিলেন—‘বলি, আমি কি জানি ? যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে আসিয়াছি।’ কিন্তু বলিতে কিছুই পারিলেন না। মীরজাফরের প্রশ্ন শুনিয়া, তিনি নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নন্দকুমারকে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, নবাব মীরজাফর উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—“কি মহারাজ! নীরব কেন ? বলুন, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই শুনিব।”

নন্দকুমার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। মীরজাফর পুনরপি কহিলেন,—“মহারাজ! এ জীবনে আমি অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছি; কিন্তু আর না! যাহা করিয়াছি, তাহারই

যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর আবার যদি আমি সেই পুণ্যময়ী মহারাণী ভবানীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হই, নরকেও যে আমার স্থান হইবে না! আমি যাহা শুনিয়াছি, আমি যাহা সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে মহারাণী ভবানীকে স্বর্গের দেবী বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে। মহারাণী—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও ব্রহ্মচারিণী; মহারাণী—রাজরাজেশ্বরী হইয়াও পরসেবাব্রতধারিণী! মহারাণী ভবানীর তুলনা কি আর এ সংসারে আছে? মহারাজ!—পরসেবাই যাঁহার শান্তি, পরহিতসাধনই যাঁহার একমাত্র বৃত্তি, তিনি কি মানবী?, কখনই না। আমি মুসলমান হইয়াও তাঁহার চরণে তাই কোটী কোটী প্রণাম করিতেছি।"

নন্দকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না। মীরজাফর আবারও বলিতে লাগিলেন,—"মহারাণী নির্দ্দোষ ত বটেই; অধিকন্তু তিনি অশেষ-গুণ-সম্পন্না। তিনি যেমন উচ্চমনা, তেমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। এক দিকে দয়াধর্ম্মে পরসেবাব্রতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা, অন্য দিকে বুদ্ধিমত্তায় তিনি অদ্বিতীয়া। মহারাজ!—মনে আছে কি, শেঠ-ভবনে আমরা যেদিন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি, মহারাণী ভবানী সেদিন কি বলিয়াছিলেন? মহারাণী স্ত্রীলোক হইয়াও যেরূপ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ভবিষ্যদ্দর্শন করিয়াছিলেন, আমরা শত-পুরুষপুঙ্গবে পরামর্শ করিয়াও তাহা স্থির করিতে পারি নাই। কেমন—মহারাণী তখন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখন ঘটিতেছে কিনা? সে বুদ্ধির কণামাত্রও যদি আমরা পাইতাম!"

মীরজাফরের মুখে যতই বাক্যের লহর ছুটিতে লাগিল,

অতীত-স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশনে নন্দকুমারের হৃদয়কে ততই অধীর করিয়া তুলিল। ইতিপূর্ব্বে দুই এক বার তিনিও যে মহারাণী ভবানীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, এখন সে সকল কথা এক এক বার মনে পড়িতে লাগিল। নবাব আলীবর্দ্দীর দরবারে মহারাণী ভবানীর স্বামী মহারাজ রামকান্তের রাজ্যচ্যুতির চক্রান্ত-ব্যাপারে তিনিও যে লিপ্ত ছিলেন, তজ্জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইল। তার পর, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, আর এক বার তিনি মহারাণী ভবানীকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; সে জন্যও অনুশোচনা আসিতে লাগিল। রামকান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদ সেবার পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন ; আর, মহারাজ নন্দকুমার তদ্বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। পরিশেষে এবার আবার নন্দকুমার, মহারাণীর স্বর্গগত জামাতা রঘুনন্দনের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষাবলম্বনে মহারাণীর বিরুদ্ধে দরবার করিতে আসিয়াছেন। বার বার তিন বার! নন্দকুমারের লজ্জাবোধ হইল।

শেঠ-ভবনে ষড়যন্ত্র-সভার বিষয় স্মরণ করিয়া নন্দকুমার কহিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার একটী কথাও অতিরঞ্জিত নহে। সত্যই মহারাণী যাহা ভবিষ্যবাণী করিয়াছিলেন, এখন বর্ণে বর্ণে তাহা সংঘটিত হইতেছে। হায়!—আমরা যদি তখন মহারাণীর পরামর্শে কর্ণপাত করিতাম!"

মীরজাফরের বাক্যে নন্দকুমারের চৈতন্যোদয় হইল। নন্দকুমার মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তবে সে কষ্ট—সে অনুশোচনা—কতক্ষণ যে স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। মানুষ যখন উচ্চ-পদবীতে আরূঢ় থাকে, মানুষ

যখন ঐশ্বর্য্য-মদে প্রমত্ত রহে, গতাপকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইলেও, সে অনুশোচনা তাহার মনে অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না। জানি-না,—ক্ষণপরেই নন্দকুমারের মতি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল কি না! জানি-না,—সেই হইতেই তিনি অনুশোচনার অন্তর্দ্দাহে অনুক্ষণ জর্জ্জরীভূত হইতেছিলেন কি না!

যাহা হউক, যে কারণেই হউক, নবাবের কথায় নন্দকুমার আর কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না; পরন্তু নবাবের বিচারই সুবিচার বলিয়া মানিয়া লইলেন; মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলেন,—"আপনি যাহা মীমাংসা করিয়া দিলেন, তাহাই ঠিক। আপনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, আমারও এখন মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমারও এখন মনে হইতেছে, মহারাণীর কোনও দোষ নাই।"

নিয়ামৎ খাঁর সে সম্বন্ধে আর কোনও কথা কহিবার সাহস হইল না। তিনি যে তরুকে আশ্রয় করিয়া ছিলেন, সেই আশ্রয়-তরুই যখন বাত্যাহত কদলীর ন্যায় পৃষ্ঠ ভঙ্গ হইয়া ভূতলশায়ী হইল, তখন আর তিনি কি করিতে পারেন?

মীরজাফর বিচার শেষ করিয়া দিলেন। বিচারে রঘুনন্দনের আত্মীয়গণের পরাজয় হইল। সে সম্বন্ধে মহারাণী ভবানীর কোনও ত্রুটি নাই—তাহাই সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। নিয়ামৎ খাঁ যে আশায় নন্দকুমারের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে আশা সম্পূর্ণরূপ বিফল হইল।

পরিশেষে, নন্দকুমার ও নিয়ামৎ খাঁ বিদায়-গ্রহণে প্রস্তুত হইলে, মীরজাফর ইঙ্গিতে নন্দকুমারকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নিয়ামৎ খাঁ সেদিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর পাইলেন না। মীরজাফরের বিচারে, অপিচ নন্দকুমারের মত-

পরিবর্ত্তনে, কতকটা অভিমানে, কতকটা রোষ-বশে, নিয়ামৎ খাঁ ক্ষুণ্নমনে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নিয়ামৎ খাঁ চলিয়া গেলে, নন্দকুমার বিদায় লইবার জন্ত গাত্রোত্থান করিলে, মীরজাফর আর একবার তাঁহাকে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃতের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন; বলিলেন,—"মহারাজ! দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃতের অপেক্ষায় আমি পথপানে চাহিয়া রহিলাম। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনি যত ক্ষণ চরণামৃত না পাঠাইবেন, আমি তত ক্ষণ পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করিব না।"

নন্দকুমার।—"কাল দ্বিপ্রহরে মায়ের পূজার পর আমি চরণামৃত লইয়া আসিব। আপনার অসুস্থ দেহ; তত বেলা পর্য্যন্ত জলগ্রহণ না করিলে বড়ই কষ্ট হইবে।

মীরজাফর।—"কষ্ট কি মহারাজ! যে যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করিতেছি, কিছু ক্ষণ জলগ্রহণ না করিলে, তাহার অপেক্ষা অধিক কষ্ট কখনই সম্ভবপর নহে। কল্যকার কথা কি বলিতেছেন? আমি আজ হইতে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম; আজিও আর জলগ্রহণ করিব না,—কালিও না,—যতক্ষণ না চরণামৃত পান করিব, তত ক্ষণ না।"

নন্দকুমার দুই এক বার বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু মীরজাফর কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। তিনি পুনঃপুনঃ বলিলেন,—"মহারাজ! এ জীবনের শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। এখনও যদি মায়ের চরণে স্মরণ লইতে পারি, হয় তো তিনি পাপী বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া একবার কৃপা-কটাক্ষে চাহিতে পারেন। সেই আমার শেষ ভরসা।"

নন্দকুমার হারি মানিলেন। "তাই হইবে। মায়ের পূজার পর, যত সত্বর সম্ভব, আমি চরণামৃত লইয়া আসিব। সে জন্য চিন্তা নাই।" এই বলিয়া, নন্দকুমার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবার সময় কিন্তু কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"মুসলমান হইয়াও দেবীর প্রতি নবাবের এত বিশ্বাস—এত ভক্তি! হিন্দু হইয়াও আমরা এ বিশ্বাস—এ ভক্তি দেখাইতে পারি কৈ!"

নন্দকুমার এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন। মীরজাফর মনে মনে কহিলেন,—"মা কিরীটেশ্বরী কি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না!" তাঁহার মনই সে কথার উত্তর দিল। তিনি আপনা-আপনিই বলিয়া উঠিলেন,—"মা আমার অবশ্যই এ যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিবেন। মার চরণামৃত পান করিলে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।"

কিন্তু এ তন্ময়-ভাব কত ক্ষণ থাকিবে! মীরজাফরের চতুর্দ্দিকে পাপ-পুরুষ মোহজাল বিস্তার করিয়া আছেন। দেবীর প্রতি মীরজাফরের ভক্তি-ভাব দেখিয়া, তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন; মনে মনে কহিলেন,—"মূঢ়! এ তন্ময়-ভাব তোমার কত ক্ষণ থাকিবে।"

* * *

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### মোহজাল।

"যে দিকে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়,
মোহ করে প্রেম-মধু ঢালিয়া রে।"

—ভারতচন্দ্র।

নন্দকুমার চলিয়া গেলে, মীরজাফরের প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে সহসা যেন বৈদ্যুতিক আলোক বিকাশ পাইল।

এ কি! এ তো চপলার চকিত চমক নহে! এ যে অচঞ্চল স্থির-সৌদামিনী!

মীরজাফর ইষ্ট-চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। ব্যগ্রভাবে ব্যস্ত-সমস্তে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার গৃহমধ্যে কি যেন এক দিব্য জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল। মীরজাফর দেখিতে লাগিলেন,—যেন উজ্জ্বলতায় কক্ষ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, গৃহ-শোভা দর্পণে দর্পণে সে উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত হইতেছে, বর্ত্তিকাধার বেলোয়ারি ঝাড়গুলিতে এবং দেওয়ালগিরিসমূহে সে উজ্জ্বলতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুধা-ধবলিত কক্ষ-প্রাচীরে উজ্জ্বলতার চারু-চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে! মীরজাফরের খট্বাঙ্গোপরি শলমা-খচিত ভেলভেট-মণ্ডিত শয্যা ও উপাধান ছিল,—উজ্জ্বলতায় তাহা চাকচিক্যসম্পন্ন হইয়া উঠিল। মর্ম্মর-নির্ম্মিত

গৃহ-প্রাঙ্গণ, মর্ম্মর-নির্ম্মিত মেজ ও কেদারাগুলি,—সকলই যেন উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মীরজাফরের অনেক ক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ক্ষণেক পরে চমক ভাঙ্গিলে, মীরজাফর একদৃষ্টে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মীরজাফরের শয্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, বীণা-বিনিন্দী-কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইল,—"জনাব! জনাব! অনুগ্রহ করিয়া এই সরবৎটুকু পান করুন। শরীর এখনই শীতল হইবে!"

মীরজাফর এ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? না—না!—এ তো স্বপ্ন নয়। মীরজাফর আকুল-কণ্ঠে কহিলেন,—"মণি—মণি! আমায় কি একটীবারও দেখা দিতে নাই?"

মণির বদনমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য-রেখা প্রকটিত হইল। কিন্তু কৌশল-জালে সে হাস্য-রেখা আবৃত রাখিয়া, মণি বীণার ঝঙ্কারে উত্তর দিল,—"নাথ! আপনার চরণ-সেবার জন্য এ দাসী সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু আপনি সংসারের শত কার্য্যে নিয়ত বিব্রত;—আপনার চরণ-সেবার সময় পাই কৈ?" যেন সুধা-কণ্ঠে সুধাধারা! মণির স্বর শুনিয়াই মীরজাফরের হৃদয় গলিয়া গেল। মীরজাফর আর কোনও সংশয়-প্রশ্ন তুলিতে পারিলেন না।

এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। মণির অদর্শনে মীরজাফর কত সময় মণির সম্বন্ধে কত অপ্রিয়-চিন্তা পোষণ করিতেন; কিন্তু মণি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল কথা—সকল চিন্তা ভুলিয়া যাইতেন। আজও তাহাই ঘটিল। আজ প্রায় আট দশ দিন মণি তাঁহার নিকটে আসে নাই। মীরজাফর

মীরজাফর ও মনি বেগম।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

মনে মনে মণির প্রতি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। অভিমান-বশে এ কয় দিন তিনি একবারও মণিকে ডাকিয়া পাঠান নাই; পরন্তু, মণি নিকটে আসিলে, মিষ্ট মিষ্ট দুই চারি কথা শুনাইয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু মণির মুখমণ্ডলে না-জানি কি মোহিনী মায়া আছে! মণির মুখ দেখিয়াই মীরজাফরের মাথা ঘুরিয়া গেল,—অভিমান কোথায় উড়িয়া পলাইল।

মণির কটাক্ষ-বাণে অতি-বড় বলবান্ ব্যক্তিই মুহ্যমান্। আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধ মীরজাফর সে কটাক্ষের নিকট কত ক্ষণ সজীব থাকিতে পারেন? মণির রূপ, মণির বয়স, মণির বেশ-বিন্যাস,—কত জনকেই পাগল করিয়া রাখিয়াছিল। মীরজাফর তো কোন্ ছার! মণির শত দোষ দেখিতে পাইলেও, মণিকে তাই মীরজাফর কখনও কোনও কথা কহিতে সাহসী হইতেন না। আজিও তাই আর কোনও কথা কহিতে পারিলেন না! পারিবার সাধ্য কোথায়?

মণি পূর্ণযৌবনা। ভাদ্র-মাসের ভরা নদী। সর্ব্বাঙ্গে রূপের তরঙ্গ ছুটিয়াছে। গণ্ডে গোলাপ-কান্তি প্রস্ফুটিত। নয়নে নয়নে বিজলী খেলিতেছে। ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূ-যুগল—বিজলীর পাশে পাশে ঘন-মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপরূপ কারুকার্য্যসমন্বিত মস্‌লিনের মসৃণ বসনে মণির দেহ আবৃত ছিল। সেই সুচিক্কণ বসনাঞ্চল ভেদ করিয়া, সুন্দরীর রূপের ফোয়ারা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। মণির মস্তকের অবগুণ্ঠন—অর্দ্ধোত্থিত অর্দ্ধস্খলিত; সেই অবগুণ্ঠনান্তরালে বেণীবদ্ধ কেশরাশি—বিলম্বমান কৃষ্ণ-সর্পের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া আছে। সুন্দরীর

পরিধানে রেশমের সাটি, গাত্রে বিবিধ-বিচিত্র কারুখচিত অঙ্গরাখা। তাঁহার চম্পকবিনিন্দী অঙ্গুলি কয়েকটীতে হীরকাঙ্গুরীয় ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে। এক ছড়া মুক্তার মালা মণির গলায় সর্ব্বদা দোদুল্যমান থাকিত। নিতম্বে সোণার চন্দ্রহার; হস্তে হীরার বলয়; মস্তকে বিচিত্র মুকুট;—মণির যখন যাহা সাধ যাইত, মণি তখনই সেই বেশে সুসজ্জিত হইত। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান—ত্রিবিধ জাতীয় মহিলাদিগের পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে যেটুকু পছন্দসই, মণি সখ করিয়া, তাহারই অনুকরণে আপনার পোষাক প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিল। কাহারও মনোরঞ্জনের আবশ্যক হইলে, মণির বেশ-ভূষার বাহার কতই বাড়িয়া উঠিত! মীরজাফরের নিকট মণি যখন উপস্থিত হইত, মণির কতই বেশ-বিন্যাস প্রকাশ পাইত।

যেমন বয়স, তেমনই রূপ, তেমনই বেশ-ভূষা। পরন্তু মণি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী। এবম্বিধ নানা কারণে, নবাব-সংসারে মণির প্রতাপ অতুলনীয়। মণি প্রথম যেদিন নবাব মীরজাফরের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই দিন হইতেই মুর্শিদাবাদে মণির প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি, সেই দিন হইতেই লোকে ধীরে ধীরে মণির পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে মণি যে নর্ত্তকীর ব্যবসায় করিত, পূর্ব্বে মণি যে দেশে-বিদেশে মজুরা করিয়া ফিরিত, মণির প্রতাপে, সে কথা এখন আর কেহ উচ্চারণ করিতেও সমর্থ নহে।

মণি এখন—মণি বেগম। মণি বেগম মীরজাফরের প্রাণ-প্রিয়া প্রধানা মহিষী। সেকেন্দ্রার নিকট বালকুণ্ডা-গ্রামে মণির জন্ম হয়। দিল্লীতে মণি নর্ত্তকীর ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন

করিত। সেই সূত্রে মজুরা লইয়া মণি একবার মুর্শিদাবাদে আসে; মুর্শিদাবাদে আসিয়া, মীরজাফরের নজরে পড়িয়া যায়। সে আজ প্রায় ষোল বৎসরের কথা। নবাব আলিবর্দ্দী তখন জীবিত। মীরজাফরের প্রথমা পত্নী—নবাব আলিবর্দ্দীর ভগিনী সা-খানুম তখন জীবিত। সুতরাং গোপনে গোপনে মণি বেগমের ও মীরজাফরের মধ্যে প্রেম-প্রবাহ প্রবাহিত হয়। পরিশেষে মীরজাফর যখন বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া বসেন, তাহার অল্প দিন পরেই মণি বেগম পাট-মহিষীর আসন প্রাপ্ত হন। বব্বু বেগম নামে মীরজাফরের আর এক যে পত্নী ছিলেন, তিনি তখন দ্বিতীয়া বেগমের স্থান লাভ করেন। যাহা হউক, এই হইতেই নর্ত্তকী মণি 'মণি বেগম' নামে পরিচিতা;—এই হইতেই তাঁহার প্রভাবে নবাব-পুরী প্রকম্পিতা। মণি বেগমের এখন দুই পুত্র। তাঁহার এক পুত্রের নাম,—নাজম-উদ্দৌলা; দ্বিতীয় পুত্র—সৈয়ফ-উদ্দৌলা। বব্বু বেগমেরও একটী পুত্র; তাহার নাম—মোবারক-উদ্দৌলা। মহারাজ নন্দ-কুমারের সহিত নবাব মীরজাফর বাঙ্গালার নবাবী-সম্বন্ধে সেদিন যে পরামর্শ করিতেছিলেন, সে পরামর্শ—বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক-উদ্দৌলাকে সিংহাসন-দান-বিষয়ে। নাজম-উদ্দৌলা সৈয়ফ-উদ্দৌলা এবং মোবারক-উদ্দৌলা,—মীরজাফরের এই তিন পুত্রের মধ্যে নাজিম-উদ্দৌলাই জ্যেষ্ঠ। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন নাজম-উদ্দৌলার বয়স অনুমান অষ্টাদশ বৎসর, সৈয়ফ-উদ্দৌলা পঞ্চদশ-বর্ষীয়, মোবারক-উদ্দৌলা সপ্তম-বর্ষীয়।

কিন্তু যাউক সে কথা! মণি বেগম যখন হেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া দুলিয়া চটুল চাহনীতে সম্মুখে আসিয়া মৃদুমন্দস্বরে

কহিলেন,—"জনাব! অনুগ্রহ করিয়া এই সরবৎটুকু পান করুন;—দেহ শীতল হইবে;" মীরজাফর যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন; তাঁহার প্রাণের-প্রাণ মণি বেগম আসিয়া এমন করিয়া অনুরোধ করিতেছেন; সরবৎ-পানে শত অনিচ্ছা থাকিলেও, মীরজাফর আপত্তি করিতে পারিলেন না। মণি বেগম, মীরজাফরের মুখের নিকট সরবৎ ধরিলেন; মীরজাফর আগ্রহ-প্রকাশে সে সরবৎ পান করিলেন।

"এ কি! সরবৎ পান করিতেই আবার এ দেহ জ্বলিয়া উঠিল কেন? দেবীর চরণামৃত পানের পূর্ব্বে আর কিছু পানাহার করিব না মনে করিয়াছিলাম, তাই কি শরীর এমন জ্বলিয়া উঠিল!"

কিন্তু মণি পাছে মনে কষ্ট পায়,—মীরজাফর সেই জন্য আপনার যন্ত্রণার কথা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইলেন। বুদ্ধিমতী মণি বেগম তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া, ধীরে ধীরে মীরজাফরকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। মণি বেগম স্বয়ং মীরজাফরকে ব্যজন করিবেন,—মীরজাফরের মনে স্বপ্নেও কখনও সে আশার উদয় হয় নাই। সুতরাং সে যন্ত্রণার মধ্যেও মীরজাফর মনে মনে অভিনব আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি এক এক বার বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মণি! তুমি কেন বাতাস কর? হাতে বেদনা হবে যে!"

মণি বেগম মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন,—"আপনাকে ব্যজন করিব,—ইহা তো আমার সৌভাগ্য। ইহাতে কি কখনও বেদনা অনুভব হয়? আপনি একটু সুস্থ হউন; তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।"

মীরজাফর কহিলেন,—"মণি! আমি বেশ একটু শান্তি অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু আবার যেন শরীরটা কেমন কেমন করিতেছে। মণি! বড় জ্বালা।"

মণি বেগম।—"আপনার কি যন্ত্রণা বোধ হচ্চে? দাসী কি কোনপ্রকারে সে যন্ত্রণার নিবৃত্তি করিতে পারে না?"

মীরজাফর।—"সে যন্ত্রণা তুমি কি দূর করিবে—মণি! যতই পূর্ব্ব-স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে, ততই আত্মগ্লানি-অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। জানি-না—কোন্ প্রায়শ্চিত্তে এ জ্বালা নিবারণ হইতে পারে?"

মণি বেগম।—"আপনি তো কোনও অপকর্ম্ম করেন নাই! অপকর্ম্ম বলিয়া মনে হইলে, আপনি তো কোনও কার্য্যেরই প্রশ্রয় দেন নাই! আমি তো সর্ব্বদা আপনার সুবিচারের বিষয়ই শুনিতেছি!"

মীরজাফর।—"সারাজীবন আমি কেবল অবিচার ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। কখনও কোনও বিষয়ে সুবিচার করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।"

মণি বেগম।—"কেন—গতকল্যও তো আপনার সুবিচারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে!"

মীরজাফর।—"কাল!—সুবিচার!"

মীরজাফরের স্মরণ হইল না। মণি বেগম স্মরণ করাইয়া দিলেন,—"মহারাণী ভবানীর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আপনি বড় সুবিচার করিয়াছেন। আপনার সুবিচার সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে।"

মীরজাফরের বদনে আনন্দ-রেখার বিকাশ পাইল। মীর-

জাফর আনন্দব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"এঁ—এঁ! তুমি এ সংবাদ কোথায় পাইলে?"

মণি বেগম।—"দাসী আপনার সকল কার্য্যের সমাচার সর্ব্বদাই রাখিয়া থাকে। পাছে কোনও বিষয়ে আপনার ভুল-ভ্রান্তি হয়, আর পাছে সেই ভুল-ভ্রান্তি-বশে আপনি মনঃকষ্ট পান, তাই আপনাকে স্মরণ করাইবার জন্য আমি সকল সংবাদ রাখিয়া থাকি।"

মীরজাফর।—"মণি! তুমি যথার্থ ই আমার হিতাভিলাষিণী। বল তো মণি!—আমার কোনও ভুল-ভ্রান্তির কথা তোমার মনে পড়ে কি?"

মণি বেগম।—"আপনার ভুল! কৈ; কিছুই তো আমার মনে পড়ে না!"

মণি বেগম যেন একটু চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন,—"না—কৈ, তেমন তো কিছুই মনে হয় না! তবে—"

'তবে' বলিয়াই মণি বেগম নীরব রহিলেন। মীরজাফরের কৌতূহল বাড়িয়া গেল। মীরজাফর আগ্রহ-সহকারে কহিলেন,—"মণি! কি বলিতেছিলে—বল! আমার নিকট সঙ্কোচ কেন? যদি কোনও ভুল-ভ্রান্তিই হইয়া থাকে, আমি তাহা সংশোধন করিয়া লইব।"

মণি বেগম।—"না, তেমন কথা কিছু নয়। সে একটা পুরাতন কথা। তা এখন থাক্; আপনি সুস্থ হউন; সময়ান্তরে সে কথার আলোচনা করা যাইবে।"

মীরজাফর।—"সময় আর কবে হইবে—মণি! যাহা

বলিবার আছে, এখনই আমায় বল। এখনও যদি সময় থাকে, কর্ত্তব্য-পালনে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।”

মীরজাফর একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মণি বেগমও সেই আগ্রহ-বশেই কথাটা যেন না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। মণি বেগম কহিলেন,—“কথাটা তেমন কিছু নয়। সে কথা পালন না করিলেও যে বিশেষ কোনও দোষ আছে, তাহাও আমার মনে হয় না। তবে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় আপনার যশঃজ্যোতিঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়,—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা; আর সেই জন্যই আপনাকে সেই কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। আপনার স্মরণ হয় কি—আপনি ক্লাইবকে ‘মুরচাজম’ উপহার দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? তজ্জন্য আপনি একখানি দান-পত্রও লিখিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই দান-পত্রে আজিও আপনার স্বাক্ষর হয় নাই। সেই দান-পত্রে স্বাক্ষর করিতে আপনার কি কোনও আপত্তি আছে?”

মীরজাফর শিহরিয়া উঠিলেন।

আবার সেই ক্লাইবের নাম! ক্লাইব আমাকে যাদু করিয়াছিল। সে কি মণি বেগমকেও যাদু করিয়া গিয়াছে! তাহাকে এই বিপুল অর্থ প্রদান করিবার জন্য মণি বেগমের এত আগ্রহ কেন? ক্লাইবের সহিত-হেষ্টিংসের সহিত—মণি বেগমকে মিশিতে দিয়া আমি তো তবে ভাল কাজ করি নাই! আমার কার্য্যোদ্ধারের পক্ষে, মণি বেগমের দ্বারা, তাহাদের সহায়তা পাইয়াছিলাম সত্য; কিন্তু তার পর, তাহারা যে ব্যবহার করিয়াছে, মণি তাহা সকলই তো অবগত আছে! তথাপি, মণি কেন আমায় ক্লাইবের নামে দান-পত্র স্বাক্ষর

করিতে বলে! রহস্য কিছুই বুঝিলাম না! কিন্তু কি করি?"

মীরজাফর ভাবিতেছেন,—"কি করি! মণি বেগমের এ প্রস্তাবে কি উত্তর দিই!"

মীরজাফরকে নীরব দেখিয়া, মণি বেগম কহিলেন,—"ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছেন। পাছে ধর্ম্মভ্রষ্ট হন, তাই আপনাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ক্লাইব আমার কেহই নয়; ক্লাইবকে ঐ অর্থ প্রদান না করিলে, অর্থ আমাদেরই ঘরে মজুত থাকিবে; নবাবী পাইলে, আপনার পুত্রই ঐ অর্থের অধিকারী হইবে। তবে যে আমি আপনাকে ঐ বিষয় স্মরণ করাইতেছি, সে কেবল আপনারই পারলৌকিক হিতসাধনের জন্য। ইচ্ছা হয়, আপনি ক্লাইবের নামে দান-পত্র লিখিয়া দিতে পারেন; ইচ্ছা না হয়, তাহাতেও হানি নাই!"

মীরজাফর মনে মনে কহিলেন,—"সত্যই তো! এ ব্যাপারে মণি বেগমের স্বার্থ আদৌ নাই। মণি বেগম যাহা বলিতেছে, আমারই হিত-কামনায়। মণি নিঃস্বার্থ।"

মীরজাফর প্রকাশ্যে কহিলেন,—"মণি! তুমি সত্যই বলিয়াছ! ক্লাইব আমার যাহাই করুক, আমি তো প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি!" এই বলিয়া, মীরজাফর সেই দানপত্র দেখিতে চাহিলেন; কহিলেন,—"কৈ, সে দান-পত্র কোথায় আছে? আমায় আনিয়া দাও; আমি স্বাক্ষর করিতেছি।"

মণি বেগম দান-পত্র সেই প্রকোষ্ঠেই আনিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন কৌশলে তাহা বাহির করিয়া লইয়া মীরজাফরের সম্মুখে ধারণ করিলেন। আর দ্বিরুক্তি হইল না। মীরজাফর দান-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সেই দান-পত্র এবং দান-প্রদত্ত অর্থ-সম্পৎ

মণি বেগমের জিম্মায় রহিল। ক্লাইব কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মণি বেগম ক্লাইবকে তাহা প্রদান করিবেন,—স্থির হইল।

এই দান-পত্রোল্লিখিত সম্পত্তির নাম "নুরচাজম্‌" অর্থাৎ "নয়নের আলোক"। মীরজাফর একটী তহবিলকে "নয়নের আলোক" বলিয়া মনে করিতেন। সেই তহবিলে পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ মজুদ ছিল; তদ্ভিন্ন, বহুসংখ্যক মোহর এবং বহুমূল্য জহরতে, মীরজাফর সে তহবিল পূর্ণ রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি-কালে মণি বেগম কর্ত্তৃক ঐ তহবিল্‌ ক্লাইবের হস্তে সমর্পিত হয়। এই তহবিল প্রাপ্ত হইয়া, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল, ক্লাইব একটী 'ট্রষ্ট' ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। যে সকল ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ও সৈনিক-পুরুষ ভারতবর্ষে আসিয়া, ইংরেজের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে দেহপাত করিবেন বা তদ্দরুণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন, তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য এই ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী বা নাবালক পুত্রগণ সেই ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার অধিকারী হন। রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেও তাঁহাদিগকে ঐ ভাণ্ডার হইতে সাহায্য-দানের ব্যবস্থা হয়। ক্লাইব যখন এই ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন এই ভাণ্ডারের আয় হইয়াছিল,—বাৎসরিক চল্লিশ হাজার পাউণ্ড—এখনকার হিসাবে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা।

ক্লাইবের নামের দান-পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া, মণি বেগম কহিলেন,—"জাঁহাপনা! আপনার অন্তঃকরণ যে কত উচ্চ—কত উদার, এই দান-পত্রে জগৎ তাহা প্রত্যক্ষ করুক। মিত্রের প্রতি উদার ব্যবহার—অনেকেই করিতে পারে! কিন্তু শত্রুর প্রতি এমন উদারতা—জগতে কে দেখাইতে পারিয়াছে

মীরজাফর মনে মনে ভাবিলেন,—"একবার বলি—মণি, এ উদারতা কি আমি ক্লাইবের প্রতি দেখাইলাম?—তোমার ঐ সুধামাখা মুখ-খানি দেখিয়াই আমি যে ক্লাইবের সব শত্রুতার কথা ভুলিয়া গেলাম!" কিন্তু মীরজাফর সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। তিনি কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মণি বেগম তাঁহার জয়-ধ্বনি করিয়া কহিলেন,—"প্রাণেশ্বর!—এই এক দান-ব্যাপারেই আপনার যশঃজ্যোতি পৃথিবীব্যাপী হইল।" এই বলিয়াই মণি বেগম মীরজাফরের ললাটে আপন কমল-হস্ত ন্যস্ত করিলেন;—প্রেম-বিহ্বলার ন্যায় অপাঙ্গে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন;—"প্রাণেশ্বর! আপনি এত উদার—এত মহান্, দাসী এত দিন তাহা বুঝিতে পারে নাই। পদে পদে তাই কত অপরাধই করিয়া বসিয়াছে। আমি অবলা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

মীরজাফর চমকিয়া উঠিলেন। আজ যেন সকলই প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল! মণি বেগমের কাতরতায় বিচলিত হইয়া, মীরজাফর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মণি! আমি তো কৈ ভ্রমেও কখনও তোমায় কোনও রূঢ় কথা বলি নাই! তবে কেন তুমি আমায় অমন কথা কহিতেছ?"

মণি বেগম বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"প্রাণেশ্বর! আমি মন্দভাগিনী, তাই সদাই শঙ্কা হয়,—শেষ জীবনে আমার অদৃষ্টে না-জানি কি কষ্টই লিখিত আছে! আমি যে আপনার বড় সোহাগের—বড় আদরের মণি বেগম ছিলাম!"

'মণি বেগম বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন। মীরজাফরের মনে

হইল,—তাঁহার লোকান্তরের আশঙ্কা করিয়াই মণি ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আকুল হইয়াছে। মীরজাফর সান্ত্বনা-ব্যঞ্জক-স্বরে উত্তর দিলেন,—"মণি! তুমি কেন দুঃখ করিতেছ! আমি ব্যবস্থা করিয়া যাইব,—আমার লোকান্তরের পরও তোমার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তুমি অণুমাত্রও চিন্তিত হইও না।"

মীরজাফর আপনার হস্ত-প্রসারণে মণির মুখের বসন সরাইয়া দিলেন। মণি বেগম ক্রন্দনের স্বরে কহিলেন,—"আমার আর কি আশা!—কি ভরসা! আমি আপনার প্রাণপ্রিয় বেগম ছিলাম; আপনার লোকান্তরে—ঈশ্বর না করুন—আমায় হয় তো বা কাহারও বাঁদী-বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।"

মীরজাফর চমকিত হইয়া কহিলেন,—"সে কি!—সে কি! সে কি কথা বল?"

মণি বেগম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিলেন,—"আমি কি মিথ্যা বলিতেছি? আমার নাজম—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও—সে তো সিংহাসনের অধিকারী নহে! আপনার নবাবীর আমলে আপনার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই তো নবাব হইবার অধিকারী। সে যদি নবাব হয়, হাজার আমি তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করি, সে কি আমায় বিমাতা বলিয়া উপেক্ষা করিবে না?"

মীরজাফর।—"মণি! তুমি যে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার কনিষ্ঠ পুত্র মোবারক—সাত বৎসরের বালক মাত্র। তাহার গর্ভধারিণী বব্বু বেগম—সম্পূর্ণরূপ সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা। মোবারক যদিও সিংহাসন লাভ করে, তোমাকেই তাহার অভিভাবিকার

পদ গ্রহণ করিতে হইবে। তবে তুমি কেন অন্য চিন্তায় আকুল হইয়াছ ?"

মণি বেগম।—"না—না, আমি আকুল হইব কেন ? নাজম ও সৈয়ফ আমার যেমন দুই পুত্র ; মোবারককেও আমি আমার সেইরূপ বলিয়া মনে করি। অভিন্ন ভাবি বলিয়াই তো আমার যত-কিছু দুর্ভাবনা।"

মীরজাফর।—"তাহাতে আবার দুর্ভাবনা কি ? তিন জনের যেই হউক, এক জন নবাব হইলেই হইল !"

মণি বেগম।—"তাহাই তো বলিতেছি ! কিন্তু আপনার মনে সে অভিন্ন-ভাব কৈ ?"

মীরজাফর।—"এমন কঠিন কথা কেন কহিতেছ—মণি ! আমি কি আমার তিনটী পুত্রকেই সমান স্নেহের চক্ষে দর্শন করি না ?"

মণি বেগম।—"জাঁহাপনা ! দাসী প্রগল্‌ভা। অপরাধ লইবেন না। যদি অভয় দেন, তবে বলিতে পারি,—তিন পুত্রের প্রতি আপনার সমান স্নেহ নাই।"

মীরজাফর।—"কেন—কেন ? কেন এমন কথা বলিতেছ ?"

মণি বেগম।—"প্রাণেশ্বর ! যদি তিন পুত্রের প্রতিই আপনার সমান স্নেহ থাকিবে, তবে আপনি জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবেন কেন ?"

মীরজাফরের যেন চৈতন্যোদয় হইল। মীরজাফর যেন ভুল বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং লজ্জিত হইয়া উত্তর দিলেন,—"মণি ! তুমি ঠিক বলিয়াছ। নাজম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই সিংহাসন-দান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

মণি বেগম।—"তাই তো আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি। নচেৎ, উহাতে আমার কি স্বার্থ আছে? ক্লাইবের নামের দান-পত্রে আমার যে স্বার্থ, এ ব্যাপারেও আমার তাহার অধিক স্বার্থ নাই। উভয় ব্যাপারেই আমি আপনার ভারবাহী দাসী মাত্র।"

মণি বেগমের কথাগুলি মীরজাফরের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। ক্লাইবের ব্যাপারে মণি বেগমের নিঃস্বার্থ ভাবের যে ছায়া-চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, ইহাতে সেই চিত্রই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মীরজাফর কহিলেন,—"আমার নাজমকেই সিংহাসনে বসাইতে হইবে। তোমার উপর সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব-ভার ন্যস্ত রহিল।"

মণি বেগম।—"আপনি বলিতেছেন বটে; কিন্তু নাজমের বিরুদ্ধে চারিদিকে ঘোর ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইয়া আছে। কি করিয়া সে জাল ছিন্ন করিতে পারিব? আমি অবলা,—অর্থ-সম্পদ্-হীন। আপনার আদেশ-পালন আমার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে?"

মীরজাফর।—"মণি! কোনও ভাবনা নাই! আমার ধন-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, আজি হইতে সকলই তোমার অধিকারে আসিল। আমার লোকান্তরের পর, আমার প্রাণ-প্রিয় পুত্র নাজমকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইতে হইবে। তোমার উপর আমি সেই ভার অর্পণ করিয়া যাইতেছি। সময় আসিলে, যেমন করিয়া হউক, তুমি সে কার্য্য সাধন করিবে। এ বিষয়ে আমি এখনই [illegible] স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি। আর আর যাহা তোমার আবশ্যক হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিব।"

মণি বেগম।—"মহারাজ নন্দকুমার আপত্তি করিবেন না কি ?"

মীরজাফর।—"আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব। তিনি কখনই তোমার কথা অমান্য করিবেন না। অর্থ-বল—লোক-বল, কোনও বলেরই তোমার অভাব হইবে না। আদেশ-পত্রও যেমন ভাবে লিখিতে হয়, তেমন করিয়াই লিখিয়া দিব।"

মণি বেগম।—"আপনার ন্যায়পরতা ও করুণার শেষ নাই। আপনার নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই আমার ধারণা ছিল,—ন্যায়-সঙ্গত প্রস্তাব আপনার নিকট কখনই উপেক্ষিত হইবে না। ঐ সম্বন্ধে আপনার আদেশ-পত্রের তাই একটা মুশাবিদাও করাইয়া রাখিয়াছি। সেইটা একবার পড়িয়া দেখিবেন কি ?"

মীরজাফর।—"তুমি মুশাবিদা করিয়াছ, তার আর দেখিব কি ? দেও—কাগজখানা দেও—আমি সহি-মোহর করিয়া দিতেছি।"

মণি বেগম কাগজখানা ধরিয়া রহিলেন। মীরজাফর সহি-মোহর শেষ করিয়া দিলেন।

সহি-মোহর শেষ হইলে, মণি বেগম পুনঃপুনঃ নবাব-সাহেবের ন্যায়পরতার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন বটে ; কিন্তু মনে মনে কহিলেন,—"বড় সহজেই কাজ হাসিল হইয়াছে! আজ যদি সহি না হইত, বড়ই সঙ্কটে পড়িতাম! এখন সময় পাইব,—সাবধান হইতে পারিব! এখন দেখি—কে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়!"

এই সময় মীরজাফরের একবার মনে হইল,—"বব্বু

বেগমের সহিত একটা পরামর্শ করা হইল না!" মীরজাফর তাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছোট বেগম এখন কোথায়?"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মণি বেগম মীরজাফরের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন; আপনা হইতেই উত্তর দিলেন,—"তাহার নিকটই আমি একবার যাইব বলিয়া মনে করিতেছি। সে আমার ছোট বোন্‌টীর মত। তাকে আমি বড় ভালবাসি। এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ একান্ত আবশ্যক। সে যদি ক্ষুণ্ণ হয়—তেমন ব্যবস্থায় আমি কখনই সম্মত নহি। যাই—তা'কে একবার আমি এই আদেশ-পত্রখানা দেখাইয়া আসি। সে কি বলে না বলে,—আপনার নিকট এখনই তাহাকে লইয়া আসিয়া শুনাইতেছি।"

এই বলিয়া মণি বেগম গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার সময় মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ছোট বেগম!—বব্বু বেগম! মূঢ় নবাব!—আর কি তাকে তোমার কাছে ঘেঁস্‌তে দেব?"

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ-সময়ে মণি বেগম বিদ্যুতের ন্যায় বিকাশ পাইয়াছিলেন। বহির্গমন-কালে তাঁহাতে বজ্র-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল। বিজলীর হাসি-রাশির-অন্তরালে বজ্র কি এইরূপ-ভাবেই লুক্কায়িত থাকে?

* * *

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### পরিবর্ত্তন।

"Weak and irresolute is man ;
The purpose of to-day,
Woven with pains into his plan,
To-morrow rends away."

—*Cowper.*

যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে, পরদিন অপরাহ্নে, মহারাজ নন্দকুমার নবাব-ভবনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে কিরীটেশ্বরীর পুরোহিত। দেবীর চরণামৃতের পাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরোহিত প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। নবাব মীরজাফর, নন্দকুমারের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কত ক্ষণে চরণামৃত লইয়া নন্দকুমার আসিবেন,—তজ্জন্য পুনঃ-পুনঃ পথপানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। যন্ত্রণায় দেহ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল ; তথাপি, সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, এক এক বার শয্যার উপর উঠিয়া বসিতেছিলেন, আর এক এক বার বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছিলেন। দেবীর চরণা-মৃত পান করিলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে,—মীরজাফরের চিত্ত তখন সেই চিন্তাতেই আকুল হইয়া ছিল।

নন্দকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলে, মীরজাফরের আনন্দের আর অবধি রহিল না। পুরোহিতের মস্তকে কিরীটেশ্বরীর

চরণামৃত দেখিয়া, মীরজাফর অনুপম আনন্দ অনুভব করিলেন। আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে তিনি নন্দকুমারকে কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন। মায়ের চরণামৃত দর্শন-মাত্র যখন আমার যন্ত্রণার এত লাঘব হইল, এ চরণামৃত পান করিলে না-জানি আমি কি অনুপম শান্তিই লাভ করিব! আমি দিবানিশি সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া আছি। দেন—আমায় চরণামৃত দেন! মায়ের চরণামৃত পান করিয়া এই সন্তপ্ত প্রাণ শান্তিলাভ করুক।"

চরণামৃত-পানে নবাব একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন, নন্দকুমারের ইঙ্গিত-ক্রমে পুরোহিত ব্রাহ্মণ, নবাবকে সেই চরণামৃত পান করাইলেন। ভক্তি-গদগদ-চিত্তে মায়ের চরণামৃত পান করিয়া, মীরজাফরের পরিতৃপ্তির অবধি রহিল না।

"আহা—কি আরাম! চরণামৃত পান করিবা মাত্র আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল যে!" মীরজাফর দেবীর উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে আপনা-আপনিই যেন "জয় মা কিরীটেশ্বরী" ধ্বনি বিনির্গত হইল। "জয় মা কিরীটেশ্বরী" রবে প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

চরণামৃত-পানে অভাবনীয় শান্তি লাভ করিয়া, মীরজাফর বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আমি এ জীবনে কখনও এমন শান্তি লাভ করি নাই। মায়ের চরণামৃত এত শান্তিপ্রদ! আমি সারাজীবন অন্তর্দ্দাহে অস্থির হইয়া আছি; এমন শান্তিপ্রদ ঔষধ জানা থাকিতে, আপনি এত দিন আমায় সে সন্ধান দেন নাই কেন? মহারাজ!—আজি আপনাকে যে কি বলিয়া

ধন্যবাদ দিব, ভাষায় তেমন শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার মরণের দিনে আমি যে শান্তিতে মরিতে পাইব,—আমি স্বপ্নেও এ বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমার শেষ-জীবনে মা কিরীটেশ্বরী যে আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন, মা যে এমন ঘোর নারকী পাষণ্ডকে চরণে স্থান দিবেন,—আমি ভ্রমেও কখনও মনে করি নাই। মহারাজ!—আজ আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম—দয়াময়ী সত্যই অধমতারিণী!"

দয়াময়ী সত্যই অধমতারিণী! তিনি যদি অধমতারিণী না হইবেন, পাপীর পরিত্রাণ কোথায় আছে? মা যদি দয়াময়ী স্নেহময়ী না হইবেন, সারা-জীবন পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়া, চৈতন্যোদয়ে একবার মাত্র তাঁহাকে ডাকিয়া, পাপী পরিত্রাণ লাভ করিবে কেন? মানুষ মোহবশে বুঝিতে পারে না; তাই সময়ে সময়ে মায়ের করুণার কথা ভুলিয়া যায়। মা যে সাক্ষাৎ করুণা-রূপিণী! তাহা না হইলে, তাঁহার চরণামৃত-পানে মহাপাপী মীরজাফরের তাপ-তপ্ত-প্রাণ স্নিগ্ধ হইল কি প্রকারে? মোহান্ধ মন! তবু তুমি বুঝিতে পার না—মা কি, মা কেমন!

মায়ের অনুপম করুণার কথা স্মরণ করিয়া, মীরজাফর অধীর হইয়া উঠিলেন। "আমি মুসলমান হইয়াও দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিলাম; দেবীর চরণামৃত পান-মাত্র সকল যন্ত্রণার অবসান হইল; মায়ের করুণার দৃষ্টান্ত ইহার অধিক আর কি হইতে পারে?" মীরজাফর পুনঃপুনঃ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"দয়াময়ী সত্যই অধমতারিণী!"

মীরজাফরের উক্তি-প্রত্যুক্তি শ্রবণ করিয়া, মহারাজ নন্দকুমার

বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনিও মীরজাফরের সহিত সমস্বরে কহিলেন,—"দয়াময়ী সত্যই অধমতারিণী!" মহারাজ নন্দকুমার আরও বলিলেন,—"এত করুণা না হইলে মার-আমার করুণাময়ী নাম হইবে কেন? আপনি এত দিন যদি এ চরণামৃত পান করিতেন, আমার বিশ্বাস, এই রোগের যন্ত্রণা আপনাকে কখনই ভুগিতে হইত না। যাহা হউক, বেলা অপরাহ্ন হইয়াছে; আপনি অনাহার আছেন; এক্ষণে আহারাদির ব্যবস্থা করুন। আমরা এখন আসি।"

নন্দকুমার বিদায়-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মীরজাফর বাধা দিয়া বলিলেন,—"আর আহার! মহারাজ!—আর আমার আহারে প্রবৃত্তি নাই। যে সুধা পান করিয়াছি, তাহাতেই আমার সকল ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইয়াছে। তবে এখন একটী কথা আপনাকে বলিবার আছে। আমার মনে হইতেছে —আজই আমার জীবনের শেষ দিন। বিষয়-কর্ম্ম সম্পর্কে যে সকল পরামর্শ করিবার ছিল, পূর্ব্বেই আপনাকে তাহা জানাইয়াছি। সে বিষয়ে আমার আর অন্য কিছুই বক্তব্য নাই। তবে নাজম যাহাতে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়, তৎপক্ষে আপনি একটু লক্ষ্য রাখিবেন।"

নন্দকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে নবাবের সহিত পরামর্শ হইয়াছিল,—নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র মোবারককে সিংহাসনে বসাইতে হইবে। কিন্তু আজি আবার নবাব এ কি কথা বলেন? নন্দকুমার ভাবিলেন,—'বোধ হয়, নবাব ভুল বলিতেছেন।' সুতরাং তাঁহাকে স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন,—"আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে মোবারককে

সিংহাসনে বসাইবার বন্দোবস্ত স্থির করা হইয়াছে। আজ আবার কেন অন্য মত করিতেছেন? এখন আবার নাজমকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা পাইলে, বিশেষ গোল বাধিবার সম্ভাবনা।"

মীরজাফর।—"সে বিষয়ে আমি পাকাপাকি হুকুমনামা লিখিয়া যাইব। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আপনি যদি আজ এক বার আসিতে পারেন, বড় ভাল হয়।"

সহসা কেন নবাবের এইরূপ মতি-পরিবর্ত্তন ঘটিল,—মহারাজ নন্দকুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পুনঃপুনঃ মোবারকের পক্ষ-সমর্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মীরজাফর সে কথায় আর কর্ণপাত করিলেন না। নন্দকুমার বুঝিলেন,—'এখন আর আপত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।' ভাবিলেন,—'যাহা হইবার, হইবে; এখন আর সে কথায় প্রয়োজন নাই।' তবে সন্ধ্যার সময় পুনরায় তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করায় তিনি কহিলেন,—"কেন?—আর বিশেষ কিছু কারণ আছে কি?"

নবাব।—"তাহা না থাকিলে আর এত করিয়া বলিতেছি?"

নন্দকুমার।—"কখন আসিতে বলেন?—অবশ্যই আসিব।"

নবাব।—"আর কখন?—আমার অন্তিম-সময়ে।"

নন্দকুমার।—"আপনি কেন ওরূপ অমঙ্গলের কথা কহিতেছেন? আপনার শরীর সুস্থ হইয়াছে। আপনি শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন। আপনার কোনও চিন্তা নাই।"

নবাব।—"মহারাজ! সত্যই আমার শরীর সুস্থ হইয়াছে। সত্যই আমার আর কোনও চিন্তার কারণ নাই। সত্যই আমি এখন সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব। সত্যই দেবী কিরীটেশ্বরী আজি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন।"

মীরজাফর আকাশের পানে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"সত্যই মহারাজ, ঐ দেখুন,—মা আমায় ডাকিতেছেন! সত্যই মহারাজ, ঐ দেখুন—মা আমার যন্ত্রণার অবসান করিতে চাহিতেছেন! মহারাজ!—সারাজীবন শুধুই আমি আত্মসুখ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। মহারাজ!—সারাজীবন শুধুই আমি পরের অনিষ্ট-সাধনে চেষ্টা পাইয়াছি। মহারাজ!—সারাজীবন শুধুই আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি কিন্তু এক দিনও মনে এমন সুখ পাই নাই।"

মীরজাফরের চক্ষু বাহিয়া জলধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। নন্দকুমার সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—"এ সময় কেন অতীত-চিন্তায় মনকে ব্যথিত করেন?"

মীরজাফর আবেগ-ভরে উত্তর দিলেন,—"মহারাজ! আর তো মন ব্যথিত নয়! আর তো আমি চোরের ন্যায় আত্ম-অভিসন্ধি গোপন করিয়া আত্মগ্লানি-বিষে জর্জ্জরীভূত নহি! কাল প্রভাতে আপনাকে যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহার অল্প পূর্ব্বেই আমার জ্ঞানসঞ্চার হয়। কাহার প্ররোচনায় কোন্ অপকর্ম্ম করিয়া, কিরূপ ফলভাগী হইয়াছি, সেই সময় সকলই আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করি।"

নন্দকুমার কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। মীরজাফর কি সূত্রে কি কথা কহিতেছেন—কিছুই বুঝিতে না পারায়, তাহা জানিবার জন্য নন্দকুমারের আগ্রহ হইল। কিন্তু সে সময় সে ভাব প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে বুঝিয়া, নবাবকে সান্ত্বনা-দান-ছলে কহিলেন,—"আপনি এখন একটু বিশ্রাম করুন। সারাদিন উপবাসী আছেন; এখন আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

মীরজাফর অধীর-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"মহারাজ!—কষ্ট আবার কি? আমার সকল কষ্টই দূর হইয়াছে। তবে কি করিয়া আমার কষ্ট দূর হইল, তাহাই একটু বলিতেছি। বলিতে আর অল্প মাত্র বাকী আছে। একটু স্থির হউন।"

নন্দকুমার।—"আপনি যত ক্ষণ থাকিতে বলেন, আমি তত ক্ষণই থাকিবার জন্য প্রস্তুত আছি। আপনার কষ্ট না হইলেই হইল। ভাল, কি বলিতেছেন,—বলুন!"

মীরজাফর বলিতে লাগিলেন,—"গত কল্য প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে তন্দ্রাঘোরে আমি এক অপরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। রোগের যন্ত্রণায়, কত কি বিভীষিকায়, সারারাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই। জাগিয়া জাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অবশেষে আমি ভগবানকে স্মরণ করিতেছিলাম। মহারাজ!—বলিতে কি, জীবনে আমি আর কখনও তেমন আন্তরিকতার সহিত ভগবানকে স্মরণ করি নাই। জীবনে সেই আমার প্রথম আকুল আহ্বান। ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে, শেষ রাত্রে আমার একটু তন্দ্রা আসে। সেই তন্দ্রাঘোরে আমি নানারূপ বিভীষিকা দেখিতে পাই। প্রথমে এক মহিষারূঢ় বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দণ্ড-হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে কহিলেন,—'পাপিষ্ঠ! অনেক দিন তোর পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু নরকেও তোর স্থান নাই; তাই এত দিন তোকে লইতে পারি নাই। তোর জন্য এখন নূতন নরক প্রস্তুত। এইবার তোকে সেখানে যাইতে হইবে।' আমি তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, বিনয়-নম্র-বচনে কৃপাপ্রার্থী হইলাম। কিন্তু তিনি রোষকষায়িতলোচনে

আমার প্রতি তীব্রদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন,—'পাপমতি পিশাচ! তুই তোর আপন প্রভুর সহিত যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিস্, অনন্ত কোটী বৎসরেও তোর সে পাপের শাস্তির শেষ নাই।' আমি বলিতে গেলাম,—'আমি কি করিব! দোষ—ক্লাইবের! পাপিষ্ঠ ক্লাইবই আমায় এই প্রভুদ্রোহিতায়—স্বদেশদ্রোহিতায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল।' দণ্ডধর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বলিলেন,—'তুই না স্বীকার পাইলে, ক্লাইব তোর কি করিতে পারিত? দোষ তোরই; সুতরাং ক্লাইবের পাপের দণ্ডও তোকে ভোগ করিতে হইবে।' আমি ক্লাইবের উদ্দেশে গালি-বর্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন, সেই দণ্ডধর পুরুষ, দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক, আমার মস্তকের উপর নির্দ্দয়-ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কাঁদিতেকাঁদিতে, 'খোদা—খোদা—খোদা! তুমি আমায় রক্ষা কর—আমি আর তোমার অবাধ্য হইব না'—এই বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলাম। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার তন্দ্রাভঙ্গ হইল। আমার প্রতিহারীরা জাগিয়া উঠিল। স্বপ্ন বলিয়া আমি সকল কথাই উড়াইয়া দিলাম।"

মহারাজ নন্দকুমার অধিকতর আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর কি হইল?"

মীরজাফর।—"তার পর ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, আমি পুনরায় নিদ্রার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই আবার আমার তন্দ্রা আসিল। আবার আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণাপন্ন হইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলাম—'ভগবন! আর যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। একবার

আমায় চরণে স্থান দাও। আমি আর তোমার অবাধ্য হইব না।' সেই সময়, আমি দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু কে যেন আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল,—'মীরজাফর! তোমার আয়ুঃকাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। তুমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।' আমি আবার আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া বলিলাম,—'আমি প্রস্তুত আছি। আপনি যেই হউন, আমায় চরণ-প্রান্তে স্থান দান করুন।' অদৃষ্ট-কণ্ঠের বাণী উত্তর দিল,—'তোমার অনুতাপ-আর্ত্তনাদ শুনিয়া, জগজ্জননী তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন। মীরজাফর! তুমি দেবীর শরণাপন্ন হও।' আমি কাতর-কণ্ঠে কহিলাম,—'আপনি কে, আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যদি দয়া করিয়া আসিয়াছেন, আমায় পথ প্রদর্শন করুন।' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাইলাম,—'মহারাজ নন্দকুমারের নিকট তোমার শান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিও। তিনিই তোমার শান্তির পথ দেখাইয়া দিবেন।' সে যেন দৈববাণী! দৈববাণী আরও বলিল,—'আর তিন দিন মাত্র তোমার জীবন-কাল। যদি সমর্থ হও, ইহার মধ্যে আপন কর্ত্তব্য-পথ অবধারণ করিয়া লইও।' ইহার পরই আমার সম্পূর্ণরূপ নিদ্রাভঙ্গ হয়।"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যে কাল বঙ্গ-সিংহাসনের এবং আমাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, স্বপ্নে সে কথা কিছু শুনিয়াছিলেন কি?"

মীরজাফর।—"শুনিয়াছিলাম বলিয়াই তো আপনাকে বলিয়াছিলাম—মহারাজ সাবধান!—আপনার ভবিষ্যৎ বড়ই অমঙ্গলময়।"

নন্দকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দৈববাণী আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন?"

মীরজাফর।—"মহারাজ!—মাপ করিবেন, সে কথা আর বলিব না। স্থূল মাত্র এই জানিবেন,—আমার জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার পদগৌরব সমস্ত নষ্ট হইবে। ক্লাইবই আসুন, আর যেই আসুন,—যাহারই ভরসায় বুক বাঁধিয়া থাকুন,—কেহই আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া, মীরজাফর আপন বক্তব্য কহিতে আরম্ভ করিলেন; কহিলেন,—"নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই আপনাকে ডাকাইয়া পাঠাই। বিষয়-কর্ম্মের কথাবার্ত্তা শেষ হওয়ার পর, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—'মহারাজ! আমার উপায় কি হইবে?—আমি মরণেও কি শান্তিলাভ করিতে পারিব না?' তাহাতে আপনি আমায় পরামর্শ দিয়াছিলেন,—'মা-কিরীটেশ্বরীর শরণাপন্ন হউন; তাঁহার চরণামৃত পান করুন;—আপনার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।' মহারাজ!—সত্যই তাই। দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করার পর হইতে আমার ব্যাধির যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়াছে। এই সন্তপ্ত দেহ এখন ক্রমশঃ যেন শান্তিধারায় স্নিগ্ধ হইতেছে। কত ক্ষণে পূর্ণ-শান্তি পূর্ণ-স্নিগ্ধতা লাভ করিব—এখন কেবল সেই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। মহারাজ!—আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আর অল্পক্ষণ এখানে অপেক্ষা করেন, হয় তো আমার কবর পর্য্যন্ত দেখিয়া যাইতে পারেন?

মহারাজ নন্দকুমার চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"সে কি! আপনি কি বলেন? মার কৃপায় আপনি আরোগ্য

হইবেন, যার কৃপায় আপনি শান্তিলাভ করিবেন। আপনি অকারণ কেন অমঙ্গল ডাকিয়া আনেন?"

মীরজাফর বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"মহারাজ! এখন অমঙ্গলই আমার মঙ্গল। এখন মরণই আমার শান্তি।"

এই বলিয়া, নন্দকুমারকে আর একবার আসিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন; বলিলেন,—"শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত্তে আপনাকে একবার দেখিতে পাইলে আমার বড়ই তৃপ্তি হইবে।"

পুনঃপুনঃ নবাব কেন তাঁহাকে আর একবার সাক্ষাৎ করিতে বলিতেছেন, নন্দকুমার তাহার কোনই কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—"নবাবের শরীরের অবস্থা ভাল নহে। তাই বোধ হয় নাজমকে নবাবী প্রদান-সম্বন্ধে পাকাপাকি কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিবেন; আর সেই জন্যই আমায় আসিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

সে কাজ যে পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে,—নন্দকুমার তাহা তো জানিতেন না! যাহা হউক, সেই কথা মনে করিয়াই নন্দকুমার উত্তর দিলেন,—"সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি নিজামতে উপস্থিত থাকিব। যখনই প্রয়োজন হইবে, সংবাদ পাঠাইবেন; আমি আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।"

নন্দকুমার চলিয়া গেলেন। মীরজাফর বাঙ্গালার ভূত-ভবিষ্যৎ নানা ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িলেন।

* * *

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### প্রতিফল।

"Out on thee, villain! Wherefore dost thou mend me?"

—*Shakspeare.*

নাটোর-রাজ্যের বিরুদ্ধে যাঁহারা দরবার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিয়ামৎ খাঁর বাড়ীতে নিয়ামৎ খাঁর প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন। নিয়ামৎ খাঁ নবাবের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাঁহারা সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের কত আশা—কত ভরসা! নিয়ামৎ খাঁ যেদিন সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে রাজ্যপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে আর কোনই দ্বিধা ভাব নাই। তাই নিয়ামৎ খাঁ যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা আহ্লাদ-সহকারে কহিলেন,—"আপনাকে বড়ই কষ্ট দিতেছি। আর বোধ হয় আপনাকে ঘোরাঘুরি করিতে হইবে না।"

নিয়ামৎ খাঁ কোনই উত্তর না দিয়া, গম্ভীরভাবে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুকগণের মনে হইল,—"বহু কষ্ট স্বীকারে কার্য্যোদ্ধার করিয়াছেন; বোধ হয় ক্লান্তি বোধ হইতেছে। বিশ্রামান্তে এখনই আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবেন।'

আগন্তুকগণ অনেক ক্ষণ সেই প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু নিয়ামৎ খাঁ আর আসিলেন না। বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া আগন্তুকগণ দুই তিন বার তাঁহাকে বাহিরে আসিবার জন্ত

সংবাদ পাঠাইলেন। তৃতীয় বারে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"আপনারা এখন যান।"

আটগ্রামের হলধর মৈত্র, রঘুনন্দনের আত্মীয়গণের পক্ষে তদ্বির করিতে আসিয়াছিলেন। অনেকটা রাখালের প্ররোচনায় তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য রাখালও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। নিয়ামৎ খাঁর ভৃত্যের উত্তর শুনিয়া, একটু বিস্মিত হইয়া, হলধর মৈত্র কহিলেন,—"আমরা প্রায় সারা দিন বসিয়া আছি। খাঁ সাহেবকে তুমি একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল। একটী কথা কহিয়াই আমরা চলিয়া যাইব।"

ভৃত্য।—"আমি সকল কথাই বলিয়াছি। এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।"

হলধর মৈত্র পুনরায় বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু ভৃত্য চটিয়া উঠিয়া উত্তর দিল,—"কেন এখানে মিছে গণ্ডগোল কর্‌ছেন? আজ আর খাঁ-সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। আর বিরক্ত ক'র্‌বেন না; এখন সরে পড়ুন।"

হলধর মৈত্র বুঝিলেন—ভৃত্য কিছু বক্‌শিসের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল; তাহা পায় নাই বলিয়াই বোধ হয় এরূপ উত্তর দিতেছে। তিনি ভৃত্যকে শান্ত করিবার জন্য কহিলেন,—"তোমার বক্‌শিসের জন্য ভাবনা নেই। এই নেও—তোমায় আগেই তা দিচ্ছি।"

এই বলিয়া, হলধর মৈত্র ভৃত্যের হস্তে দুইটি টাকা প্রদান করিলেন। ভৃত্যের মুখে একটু আনন্দের ভাব প্রকাশ পাইল। সে একটু হাসিয়া কহিল,—"তা আপনাদের

খেয়েই মানুষ! আপনারা দেবেন না তো আর কে দেবে! বলুন—খাঁ সাহেবকে গিয়ে কি বল্‌তে হবে? আমি বেশ করে এবার তাঁকে সব বলে আস্‌ছি।"

হলধর!—"খাঁ-সাহেব একবার যা'তে বাইরে আসেন, তুমি বাপু, সেই ব্যবস্থাটী কোনরকমে করে দেও।"

"যে আজ্ঞে হুজুর!"—এই বলিয়া ভৃত্য পুনরায় খাঁ-সাহেবের নিকট গমন করিল। ভৃত্য তাঁহাকে কি বলিল বা না বলিল, হলধর মৈত্র প্রভৃতি তাহা অবশ্য জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন—খাঁ-সাহেব তখন বিপরীত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। বাহিরে আসিয়াই, হলধর মৈত্র প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া, নিয়ামৎ খাঁ কহিলেন,—"জুয়াচোর! বদ্‌মায়েস! জুয়াচুরীর আর জায়গা পাও-নি? এখনই আমার বাড়ী থেকে দূর হ'।"

হলধর মৈত্র প্রভৃতি ভাবিলেন—নিয়ামৎ খাঁ বুঝি আর কাহারও উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতেছেন! সুতরাং একটু সঙ্কোচের ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিয়ামৎ খাঁ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পুনরপি বলিতে লাগিলেন,—"রমজান! রমজান! এ জুয়াচোর বেটাদের গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেও তো?"

এবার আর মৈত্র মহাশয় প্রভৃতির কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। তথাপি হলধর মৈত্র বিনীত-স্বরে কহিলেন,—"খাঁ-সাহেব! আপনি এত রাগ করিতেছেন কেন?"

নিয়ামৎ খাঁ।—"আমার সঙ্গে প্রতারণা! তোদের শূলে দেওয়া হয়-নি, এই তোদের ভাগ্যি বলে মানিস।"

হলধর।—"সে কি বলেন খাঁ-সাহেব? আপনি যা বলেছেন, আমরা তো তাই করেছি! আমাদের যথাসর্ব্বস্ব আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি; আপনি কেন অমন কথা বল্‌ছেন?"

নিয়ামৎ খাঁ।—"বলব না! মুখে বল্‌চি, এখনও কাজে দেখান হয়-নি। একটু পরেই এখন দেখ্‌তে পাবি।"

মৈত্র মহাশয়ের মনে হইল—নিয়ামৎ খাঁ বোধ হয় নগদ আরও কিছুর প্রত্যাশা করেন। তাই তিনি বলিতে গেলেন,—"আমাদের আর তো কিছু নেই খাঁ-সাহেব! আমাদের যা-কিছু ছিল, সবই আপনাকে দেওয়া হ'য়েছে। রাজ্য আমাদের অধিকারে এনে দিতে পারেন, তারও তো অর্দ্ধেক আপনাকে দিতে সম্মত আছি!"

নিয়ামৎ খাঁ অধিকতর রুক্ষস্বরে গালাগালি দিয়া উঠিলেন।

আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নিয়ামৎ খাঁর সহিত তাঁহাদের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। তদবধি একাল পর্য্যন্ত নিয়ামৎ খাঁ সর্ব্বদাই 'আপনি, মহাশয়' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেন। আজ হঠাৎ তাঁহার এ পরিবর্ত্তন কেন হইল? হলধর মৈত্র প্রভৃতি কেহই এ পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অন্য সময় হইলে, এ অপমান হয় তো তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু আজ নিরুপায়! সুতরাং হলধর মৈত্র পুনরায় বিনীত স্বরে কহিলেন,—"আপনি কেন এত রাগ করিতেছেন? আপনার পরামর্শে আমরা যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি! আপনি যে আজও বলেছেন—'তোমাদের ন্যায্য দাবী, তোমরা নিশ্চয়ই বিষয়ে অধিকার লাভ করিবে।' এখন তবে কেন অমন কথা কহিতেছেন?"

নিয়ামৎ খাঁ।—"আমার আশ্রয় পেয়েছিলে ব'লে এখনও তোদের শূলে দেওয়া হয়-নি। তোরা জানিস্—তোদের প্রতি নবাবের কি কড়া হুকুম জারি হয়েছে! শূলে দেওয়া হবে—তোদের শূলে দেওয়া হবে।"

এই বলিয়া নিয়ামৎ খাঁ আবার ডাকিলেন,—"রমজান! বেটাদের বেঁধে ফেলতো আগে!"

রমজান অগ্রসর হইল। "যো হুকুম খোদাবন্দ!"—বলিয়া সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। নিয়ামৎ খাঁ রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"এ বেটারা জুয়াচোর—বদ্‌মায়েস্! এরা শূলের আসামী! এদের বেঁধে এখনই কারাগারে পাঠাতে হবে।"

রমজান মিঞা বিকট মুখভঙ্গী-সহকারে হলধর মৈত্র প্রভৃতিকে বাঁধিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। হলধর মৈত্র প্রভৃতি সকলেই কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন; কহিলেন,—"আমাদের অপরাধ হ'য়েছে। আপনি ক্ষমা করুন। এখন আমরা যা'তে প্রাণে প্রাণে দেশে ফিরে যেতে পারি, তার ব্যবস্থা করে দেন।"

নিয়ামৎ খাঁ একটু নরম ভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত-ক্রমে রমজান মিঞা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নিয়ামৎ খাঁ বলিতে লাগিলেন,—"এখনও তোরা যদি প্রাণ বাঁচাতে চাস্, এক এক জন এক এক দিকে পলায়ন কর। হয় তো এতক্ষণ নবাবের পাইকগণ তোদের বাসা ঘেরাও করে বসেছে! যদি প্রাণ বাঁচাতে চাস্, সেদিকে পর্য্যন্ত আর যাস্-নে! পালা—পালা—এক এক জন এক এক দিকে পালা।"

তাহাই ঘটিল। যিনি যেদিকে পাইলেন, প্রাণ-ভয়ে পলাইতে

লাগিলেন। হলধর মৈত্র দলভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। আপনাদের বাসার দিকে যাইয়া আপন-আপন পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার—কাহারও আর সাহসে কুলাইল না।

এই হইতে রাখাল পিতার সঙ্গ-ভ্রষ্ট হইল। ইচ্ছা করিলে, সে অনায়াসে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বাড়ী ফিরিতে তাহার আর প্রবৃত্তি হইল না। প্রধানতঃ সেই উৎসাহ দিয়া পিতাকে নাটোর-রাজের বিরুদ্ধে দরবার করিতে মুর্শিদাবাদে আনিয়াছিল। প্রধানতঃ তাহারই উদ্যোগে ষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, বাড়ী ফিরিতে তাহার আর প্রবৃত্তি হইল না। সে মনে মনে কহিল,—"যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, ইহার শেষ কোথায় আমায় দেখিতে হইবে।" রাখালের সকল রাগ সকল অভিমান, কুমার রামকৃষ্ণের উপর গিয়া পতিত হইল। রাখাল আপনা-আপনিই কহিল,—"রামকৃষ্ণ! তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন,—শীঘ্রই তাহার পরীক্ষা হইবে! তুমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও।"

সকলে চলিয়া গেলে, নিয়ামৎ খাঁ ভাবিতে লাগিলেন,—"বাঁচা গেল! খুব কৌশলে বেটাদের টাকাগুলা আত্মসাৎ করা গিয়েছে! খুব কৌশলে বেটাদের তাড়িয়ে দেওয়া গিয়েছে! আগেই তো আমার জানা ছিল,—এতে কিছু হবে না! তবে ফাঁকতালে কতকগুলা টাকা পাওয়া যাবে, তাই আমি একাজে হাত দিয়েছিলাম! তবে তাই ব'লে আমি যে নিমকহারামি করেছি, তা কেউ বল্‌তে পার্‌বে না। নবাবের মেজাজ ভাল ছিল না—নবাব শুন্‌লে না; আমি তার কি কর্‌ব!".

হতাশে গৃহ-প্রত্যাগমন-কালে হলধর মৈত্র ভাবিতে লাগিলেন —"সব পণ্ড হ'ল! নিয়ামৎ খাঁ এমন বিশ্বাসঘাতক! রঘুনন্দনের আত্মীয়দিগকে এত করিয়া বশে আনিলাম!—এত করিয়া প্রলুব্ধ করিলাম! নিয়ামৎ খাঁ সব পণ্ড করিয়া দিল! তাহারাও সর্ব্বস্বান্ত হইল; আমিও সর্ব্বস্বান্ত হইলাম! পরিণাম এই ঘটিল? নিয়ামৎ খাঁ পূর্ব্বে যদি আমায় ইঙ্গিতেও কোনও দুর্ভরসার কথা কহিত! নন্দকুমারও তো কৈ কখনও আমায় নিরুৎসাহ করেন নাই! সকলেই কি প্রবঞ্চনা করিল? এখন, এ মুখ লইয়া আমি দেশে ফিরিব কি প্রকারে! হরিদেব রায় একেই আমায় বিদ্রূপ করে! আমায় এমনভাবে অপদস্থ অপমানিত হইয়া দেশে ফিরিতে হইল—সে যদি জানিতে পারে, তাহার টিট্‌কারীর আর অবধি থাকিবে না! আমি কি করি? কোথায় যাই? আমি অকারণ নাটোর-রাজের শত্রুতাচরণ করিলাম! প্রতিফল—প্রতিফল—প্রতিফল! —হাতে হাতে পাইলাম!"

* * *

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## ইতিকথা।

"So once it would have been,—'tis no more;
I have submitted to a new control;
A power is gone, which nothing can restore;
A deep distress has humanised my soul."

—*Wordsworth.*

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী নবাব মীরজাফর ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মণি বেগমের পুত্র নাজম-উদ্দৌলা মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বাঙ্গালার মসনদ লইয়া এ সময়ে বিশেষ একটা গণ্ডগোল বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। এক দিকে, বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক-উদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য তাঁহার আত্মীয়-অন্তরঙ্গগণ চেষ্টা পাইতেছিলেন; অন্য দিকে, মীরণের এক শিশু-পুত্রকে বঙ্গ-সিংহাসন প্রদান করিবার পক্ষে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। এ দিকে মণি বেগম, সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, নাজম-উদ্দৌলার জন্য আট-ঘাট বাঁধিয়া লইতেছিলেন।

মণি বেগম বুঝিয়াছিলেন,—'টাকায় সব হইতে পারে!' নবাবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই তাই তিনি রাজকোষ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এখন টাকার জোরে তিনি একে একে সকল কাজ হাসিল করিয়া লইতে লাগিলেন।

মধুচক্র-পার্শ্বে যেমন মধুলোভী মক্ষিকার দল ঘেরিয়া বসে, মণি

বেগমের ধন-সম্পদের পার্শ্বেও তদ্রূপ নানা-জনে নানা-মূর্ত্তিতে ঘেরিয়া বসিল। মীরজাফরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর তরফ হইতে "কলিকাতা কাউন্সিলের" সদস্যগণ মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপনীত হইলেন। ষড়যন্ত্রে ও ভয়-প্রদর্শনে রাজকোষের অর্থাপহরণ-পক্ষে কাহারও কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটি রহিল না। স্পেন্সার নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ-পুঙ্গব এই সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর গবরণর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই ব্যাপারে তিনিও আসিয়া মুর্শিদাবাদ সরগরম করিয়া তুলিলেন। ফলে, মণি বেগমের তহবিল হইতে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড (এখনকার হিসাবে প্রায় একুশ লক্ষ টাকা) বাহির হইয়া গেল। কাউন্সিলের সদস্যগণ পরস্পর সেই টাকা বণ্টন করিয়া লইলেন।

নিজামত-কিল্লায় নাজম-উদ্দৌলার অভিষেক-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। মিডিল্‌টন্‌-প্রমুখ-কাউন্সিলের সদস্যগণ দরবারের শোভা সম্বর্দ্ধন করিলেন। ফ্রান্সিস সাইক্স,—রেসিডেণ্ট অর্থাৎ কোম্পানীর প্রতিনিধি-রূপে দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নানা-প্রকারে নবাবের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দিলেন। নবাবের যে 'খাস' সৈন্য ছিল, আঠার লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয়-হ্রাসের উদ্দেশ্যে, সাইক্স সেই সৈন্যদলকে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করাইলেন। নবাব নাজম-উদ্দৌলাকে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন,—"রাজ্য-শাসনের দুশ্চিন্তায় আপনার আর বিব্রত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আপনি নিশ্চিন্ত-মনে সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করুন; আমরা আপনার জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।" ফলতঃ, এই সূত্রে বন্দোবস্ত হইল,—'নবাব ৫৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৬১ টাকা বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন; মহম্মদ রেজা খাঁ, দুর্ল্লভরাম এবং

জগৎশেঠ রাজকার্য্য পরিদর্শন করিবেন; সিপাহীদিগের বেতন এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যয়ের ভার মহম্মদ রেজা খাঁর উপর ন্যস্ত থাকিবে; সৈয়ফ-উদ্দৌলা সাত হাজার টাকা, মোবারক-উদ্দৌলা পাঁচ হাজার টাকা, মীরণের নাবালক পুত্র পাঁচ হাজার টাকা এবং বেগম ও অন্যান্য পরিবারবর্গ ছয় হাজার টাকা বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।' এই উপলক্ষে সাইক্স, নবাবের নিকট হইতে এক শত ছয়টী পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। পরগণা কয়টী—নবাবের বিশেষ লাভের সম্পত্তি ছিল। এই সূত্রে আরও ব্যবস্থা হইল,—'বাঙ্গালার জমীদারগণ সকলেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করিবেন। নবাব বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার থাকিবেন বটে; কিন্তু রাজ্য-রক্ষার জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী সৈন্যদল পোষণ করিবেন; সৈন্যদল-রক্ষায় বা সৈন্যদল পরিচালনায় নবাবের কোন হাত থাকিবে না। সৈন্যদল-পরিপোষণের সাধারণ ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম—এই তিনটী চাকলা, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে প্রদত্ত হইল। বিপদে-আপদে যত দিন অধিক সংখ্যক সৈন্য-রক্ষার প্রয়োজন হইবে, তত দিন নবাব-সরকার হইতে অতিরিক্ত আরও পাঁচ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইল। মুর্শিদাবাদেই নবাবের রাজধানী রহিল বটে; কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর প্রতিনিধি-রূপে এক জন ইংরেজ নবাব-দরবারে উপস্থিত থাকিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, নবাব মীরজাফর, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে কলিকাতায় টাকশাল স্থাপন করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে সেই মুদ্রা নবাবের রাজ্যেও অব্যাহত-ভাবে প্রচলিত

হইবার ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে মুদ্রা প্রস্তুত হইত এই সময় সেই ব্যবস্থা রদ হইল।' এক কথায়, মীরজাফরের সময় যে ক্ষমতাটুকুও গ্রহণ করিতে অবশিষ্ট ছিল, নাজম-উদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইবার সময়, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী সর্ব্বতোভাবে সে ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিলেন। নবাব রহিলেন, কিন্তু নবাবী রহিল না; নাম রহিল, কিন্তু পদার্থ উড়িয়া গেল।

জানুয়ারী মাসে নবাব মীরজাফরের মৃত্যু হইল; তাহার পাঁচ মাস মধ্যেই পুনরায় ক্লাইব আসিয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। মহারাষ্ট্রদিগের সহিত পুনঃপুনঃ সংঘর্ষে, অধিকন্তু গৃহ-বিবাদে, দিল্লীর সম্রাট্ এক্ষণে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই ক্লাইব তাহা উপলব্ধি করিলেন। মোগলদিগের শাসন-কালে, মোগল-সম্রাটের নিয়োজিত সুবাদারগণ এক এক প্রদেশের প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের অধীনে এক জন করিয়া দেওয়ান থাকিতেন। দেশের রাজস্ব-সংগ্রহের ভার—সেই দেওয়ানের উপর ন্যস্ত থাকিত। দেওয়ান, রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া দিল্লীর কোষাগারে প্রেরণ করিতেন। ক্লাইবের এখন সঙ্কল্প হইল,—'সেই দেওয়ানী-ভার বাদসাহের নিকট হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নামে গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্গালার নবাব্ নামে-মাত্র সুবেদার্ থাকেন, থাকুন; কিন্তু বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর ভার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত হউক।' এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, ক্লাইব, সম্রাট্ সাহ-আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অযোধ্যার নবাবের সহিত বিবাদ-উপলক্ষে সম্রাট্ তখন এলাহাবাদে উপস্থিত ছিলেন। এলাহাবাদে গিয়া, সম্রাটের নিকট হইতে

ক্লাইব অভিলষিত দেওয়ানী-সনন্দ লাভ করিলেন। নবাব নাজম উদ্দৌলার অভিষেকের সময়, কাউন্সিলের সদস্যগণ যেরূপ সন্ধি-বন্দোবস্ত ধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন, বাদসাহের নিকট হইতে ক্লাইব তাহা পাকা করিয়া আনিলেন। ফলে, নবাব এখন সর্ব্ববিষয়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য রহিলেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাবের ২৯শে এপ্রিল, কোম্পানীর তরফে ক্লাইব প্রথম 'পুণ্যাহ' করেন। মতিঝিলে মহাসমারোহে সেই পুণ্যাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট সম্রাট্ সাহ-আলমের নিকট হইতে ক্লাইব দেওয়ানী-সনন্দ লাভ করেন; নবাব নাজম-উদ্দৌলা কর্ত্তৃক ৩০শে সেপ্টেম্বর সেই সনন্দ অনুমোদিত হয়। তৎপরে, সেই দেওয়ানী-সনন্দের বলে, মাত্র ৫৩ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া, নবাবের দুই কোটী ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা রাজস্বের এবং তিন কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী গ্রাস করিয়া বসেন। কিন্তু নবাব নাজম-উদ্দৌলা তখন তাহাতেই আনন্দে গদগদ হইয়াছিলেন; ক্লাইবকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন,—"এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। যত ইচ্ছা নর্ত্তকী লইয়া এখন অনায়াসে নৃত্য-গীত করিতে পারিব।"

এইরূপে নবাবের হস্ত হইতে বঙ্গদেশের শাসন-ক্ষমতা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত হয়। ভান্সিটার্ট বিলাত যাইবার সময় নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই মন্তব্যের ফলে, নন্দকুমারের প্রতি ক্লাইব বিরূপ হইয়া যান। ক্লাইব ফিরিয়া আসিলে নন্দকুমার নবাব-সংসারে আধিপত্য-বিস্তার করিবেন মনে করিয়াছিলেন;

এই সূত্রে তাঁহার সে আশা-মূল উৎপাটিত হয়। ক্লাইবের অনুগ্রহ-লাভে তিনি যতই চেষ্টা পাইতে থাকেন; ক্লাইব ততই তাঁহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন।

এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে, নবাব নাজম-উদ্দৌলা ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। এ সময় মণি বেগম ক্লাইবের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। সুতরাং নাজমের মৃত্যুর পরও মোবারক অথবা মীরণের পুত্র নবাবী-পদ প্রাপ্ত হইলেন না। মণি বেগমের কৌশলে, মণি বেগমের দ্বিতীয় পুত্র সৈয়ফ-উদ্দৌলা বাঙ্গালার মসনদ লাভ করিলেন। মণি বেগমের উপর কর্ত্তৃত্বাধিকার ন্যস্ত হইল। মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্ল্লভরাম এবং জগৎশেঠ যেভাবে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, সেইভাবেই রাজ-কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই সময় (১৯শে মে) ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সহিত নূতন নবাবের আবার এক নূতন সন্ধি-সর্ত্ত ধার্য্য হইল। সেই সন্ধি-সর্ত্তে নবাবের বৃত্তির পরিমাণ আরও কমিয়া গেল। এই হইতে ৪১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১ শত ৩১ টাকা নয় আনা মাত্র নবাবের বার্ষিক বৃত্তি বরাদ্দ হইল। সেই বৃত্তি হইতে ১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮ শত ৫৪ টাকা এক আনা নবাব-পরিবারবর্গের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ এবং ২৪ লক্ষ ৭ হাজার ২ শত ৭৭ টাকা আট আনা নিজামত বিভাগের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয়।

এই সকল ব্যবস্থার পর, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব পুনরায় বিলাত চলিয়া যান। তখন কাউন্সিলের প্রধান সদস্য ভেলরেষ্ট বাঙ্গালার গবরণর-পদ প্রাপ্ত হন। তিনি দুই বৎসর মাত্র গবরণর-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ভেলরেষ্ট

কলিকাত যাত্রা করিলে, কার্টিয়ার সাহেব কাউন্সিলের সভাপতি ও গবরণর-পদ লাভ করেন। কার্টিয়ারের গবরণর-পদ-প্রাপ্তির সম-সময়ে নবাব সৈয়ফ-উদ্দৌলা বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন কিছু দিন মণি বেগমের কর্তৃত্ব লোপ পায়। বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক সেই সময় নবাবী-পদ লাভ করেন। মোবারক-উদ্দৌলার নবাবীর সময়, কার্টিয়ার যখন বাঙ্গালার গবরণর ছিলেন,—সেই সময়, বঙ্গদেশ 'ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে' উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হয়। সেই লোমহর্ষণ ভীষণ দুর্ভিক্ষে, সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ, বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ নরনারী প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষের চিত্র স্মৃতি-পথে উদয় হইলে, এখনও প্রাণ বিদীর্ণ হয়। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের সময় রেজা খাঁ বাঙ্গালার এবং সেতাব রায় পাটনার 'ডেপুটী নবাব' ছিলেন। এক দিকে দারুণ অজন্মা;—তাহার উপর রাজস্ব-আদায়ে ভীষণ প্রজাপীড়ন! বর্দ্ধিত-হারে রাজস্ব যোগাইবার জন্য প্রজা খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এদিকে রেজা খাঁ সেই সকল খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেন। ফলে, ১৭৭০-১৭৭১ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে) দুর্ভিক্ষ-দাবানলে দেশ দগ্ধীভূত হয়। এই দুর্ভিক্ষ-প্রকোপে বাঙ্গালার কত গ্রাম জনশূন্য বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, কত জনপদ শ্মশানের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল,—তাহার ইয়ত্তা হয় না। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর দূরদৃষ্টির অভাবে, কয়েক-জন স্বার্থপর রাজকর্ম্মচারীর স্বার্থ-সাধনের ফলে, ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে বাঙ্গালার যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল, ইতিহাসের অঙ্কে চির দিন সে বিবরণ রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া থাকিবে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, কার্টিয়ার পদত্যাগ করেন; ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবরর্ণর হইয়া আসেন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কুঠির কেরাণী-রূপে হেষ্টিংস বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করেন। পলাশী-যুদ্ধের পর, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, তিনি মুর্শিদাবাদে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর রেসিডেণ্ট-রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস ইংলণ্ডে চলিয়া যান। শেষ-জীবন ইংলণ্ডেই অতিবাহিত করিবেন,—তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অদৃষ্ট-চক্র আবার তাঁহাকে এদেশে ফিরাইয়া লইয়া আসে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ-রূপে ভারতে আসিয়া, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবরণর-পদ লাভ করেন। বাঙ্গালার অবস্থা হেষ্টিংস সমস্তই অবগত ছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের বিশৃঙ্খলার সময়, কাশীমবাজার রাজবংশের আদি-পুরুষ কান্ত বাবুর সহায়তায় পলায়ন করিয়া তিনি প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। মীরজাফরের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে মণি বেগমের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছিল।

হেষ্টিংস আসিয়া বাঙ্গালার গবরণর-পদে সমাসীন হইবা মাত্র, মণি বেগমের অদৃষ্ট আবার সুপ্রসন্ন হয়। হেষ্টিংসের অনুগ্রহে মণি বেগম পুনরায় নবাবের অভিভাবিকা নির্ব্বাচিতা হন। মোবারক-উদ্দৌলা—বব্বু বেগমের পুত্র। বব্বু বেগম তখনও জীবিত ছিলেন। তথাপি তাঁহার পুত্রের অভিভাবক নির্ব্বাচিত হইলেন—তাঁহার সপত্নী মণি বেগম। কি কারণে বব্বু বেগমের পরিবর্ত্তে মণি বেগমকে নবাবের অভিভাবিকা নিযুক্ত করা হয়, তাহা বড়ই রহস্যমূলক।

গবরণর-পদ প্রাপ্ত হইয়াই হেষ্টিংস দেখিতে পাইলেন,—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী ঋণগ্রস্ত; সেই ঋণ-পরিশোধের জন্য ডিরেক্টর-সভা বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। হেষ্টিংস ব্যয়-হ্রাসের ও আয়-বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ব্যয়-হ্রাস সম্বন্ধে প্রথমেই নবাবের বৃত্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। মোবারক-উদ্দৌলাকে নবাবী পদ প্রদান করিবার সময়, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখের সন্ধি-সর্ত্তে নবাবের বৃত্তির পরিমাণ কমিয়া কমিয়া ক্রমে ৩১ লক্ষ ৮১ হাজার ৯ শত ৯১ টাকা নয় আনায় দাঁড়াইয়াছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হেষ্টিংস সেই বৃত্তি অর্দ্ধেকে পরিণত করিলেন। অর্থাৎ তখন হইতে বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকা মাত্র সর্ব্বপ্রকারে নবাবকে বৃত্তি দেওয়া হইবে—ব্যবস্থা হইল। এক সময়ে নবাবের নায়েব-নাজিমগণ—প্রাদেশিক রাজস্ব-সংগ্রাহকগণ—যে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, এই সময় হইতে নবাবের ভাগ্যে সেই বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় "রেভিনিউ অফিস" অর্থাৎ রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিলেন। দুর্লভরামের পুত্র রাজা রাজবল্লভ কোম্পানীর রাজস্ব-আদায়ের তত্ত্বাবধায়ক-পদে নিযুক্ত হইলেন। বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগ সমস্তই কলিকাতায় উঠিয়া আসিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এই হইতে নামতঃ ও কার্য্যতঃ উভয়তঃ এ দেশের রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন। "কোম্পানীর মুল্লুক" নাম এই সময় হইতেই বিঘোষিত হইতে লাগিল।

বাঙ্গালার জমীদারগণ এত দিন মুর্শিদাবাদের নবাবকে দেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানিতেন। এই হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-

কোম্পানীকে দেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদিগকে মানিয়া লইতে হইল। এত দিন তাঁহারা আপন আপন জমিদারীতে যে ক্ষমতা পরিচালন করিতেছিলেন, এইবার তাঁহাদের সে ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া আসিতে লাগিল। পূর্ব্বে জমিদারগণ, আপন-আপন প্রজাদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার করিতে পারিতেন। জমীদারদিগের কারাগার ছিল; তাঁহাদের আদেশে অপরাধীর অর্থদণ্ড হইত, অথবা অপরাধী কারাদণ্ড ভোগ করিত। অপরাধীর প্রাণদণ্ড-দানেও তখন কোনও কোনও জমীদারের ক্ষমতা ছিল; তবে সময় সময় সেই প্রাণ-দণ্ডের বিষয় নবাবের মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইত। কিন্তু হেষ্টিংস, জমীদারদিগের সে সকল ক্ষমতা লোপ করিয়া দিলেন। তাঁহার উদ্যোগে জেলায় জেলায় এক এক জন সাহেব কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন; জেলায় জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারালয়-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

এই সূত্রে নাটোর-রাজ্যের ক্ষমতাও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসে। নাটোরের কারাগার উঠাইয়া দিবার চেষ্টা হয়। মহারাণী ভবানীর জমিদারীর কতক কতক অংশ হেষ্টিংস কাড়িয়া লইয়া অপরকে প্রদান করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন করিতে থাকেন। অধিক কি, মহারাণী ভবানীর রাজধানী নাটোর-সহরের বক্ষের উপর ক্রমশঃ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বিচারালয় পর্য্যন্ত স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হয়। পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহারাণী ভবানী ভবিষ্যতের যে চিত্র মানস-পটে দর্শন করিয়াছিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে, তাহাই এখন প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### সুন্দরী-সম্মিলনে।

"সুন্দরি!

ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিবাবসানে চ্ছায়েব পুরোমূলং বনস্পতিঃ।"

—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

কয়েক বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তনই সাধিত হইয়াছে। মহারাণী ভবানী সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কখনও বারাণসীতে, কখনও বড়নগরে গঙ্গাতীরে, কখনও বা অন্য কোন তীর্থস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশাল নাটোর-রাজ্যের শাসন-ভার কুমার রামকৃষ্ণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কুমার এখন আর 'কুমার' নাই;—কুমার এখন 'মহারাজ' নামে অভিহিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষণের কতই তারতম্য ঘটিয়াছে। কুমার এখন বিষয়ী, কুমার এখন সংসারী, কুমার এখন রাজপদবী-ধারী; কুমার এখন পারিষদ-পরিবৃত, কুমার এখন বিষয়-সুখাসক্ত, কুমার এখন মোহিনীর মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ;—কুমার এখন নব-যৌবনের নব-তরঙ্গে ভাসমান। যখন বাহিরে থাকেন, পারিষদগণের তোষামোদ-বাক্যে প্রাণ ভরপূর হইয়া উঠে। যখন অন্দরে আসেন, সুন্দরীর রূপ-সাগরে নিমগ্ন হন। বিষয়-কর্ম্ম বড় একটা দেখিতে হয় না;—চন্দ্রনারায়ণ, রুদ্রনারায়ণ প্রমুখ ঠাকুর মহাশয়গণই সে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। অন্য চিন্তা হইতে চিত্তকে ফিরাইয়া লইয়া সংসারের

প্রতি আসক্তি উৎপাদনের জন্য কয়েক বৎসর হইতে কুমারের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থাই বিহিত হইয়া আছে। সংসার, কুমারের অষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন বাঁধিয়া বসিয়াছে।

কুমার!—তুমি নয় বন্ধন মোচন করিতে চাহিয়াছিলে?

সংসার এক একবার কুমারের প্রতি ভ্রূকুটি-কুটিল-দৃষ্টি করিয়া যেন উপহাস করিতেছে,—"কেমন!—কুমার, তুমি নয় বন্ধন মোচন করিতে চাও? তুমি এতই বিহ্বল—এতই আত্মহারা—সে চিন্তা পর্য্যন্ত এখন ভুলিয়া গেলে?"

কিন্তু কে শুনিবে? কুমারের কর্ণ কি আর কুমারের আছে!—সে যে কিশোরীর কিঙ্কিণী-নিক্কণের পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে!

সংসার কুমারের চক্ষের সমক্ষে বন্ধনের শত-যন্ত্রণাময় চিত্র উপস্থিত করিতেছেন। কিন্তু কে দেখিবে?—কুমারের নয়ন কি আর কুমারের আছে!—সে যে সুন্দরীর রূপসুধা-পানে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে!

মন! কুমারের সে মন এখন কোথায়? কুমার এখন, কখনও ভাবিতেছেন,—"সুন্দরি! তুমি এত সুন্দর!" কখনও ভাবিতেছেন,—"সুন্দরী আমায় কত ভালবাসে; আমি তারে কত ভালবাসি!"

পরিখার পার্শ্বে যে বৃক্ষমূলে বসিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুমার ভাবিতেছিলেন,—"বন্ধন-মোচন কি প্রকারে সম্ভবপর?" —আজ তাহারই অনতিদূরে পুষ্পোদ্যানে বসিয়া তিনি ভাবিতেছেন,—"আমার সুন্দরী কত সুন্দর!" সেদিন স্নিগ্ধচন্দ্রালোকে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই; বায়ু-বিচালিত পরিখার বীচি-বল্লরীতে

তাঁহার চিত্ত মুগ্ধ করিতে পারে নাই; উদ্যানের কুসুম-সম্ভারে যে অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি উছলিয়া আছে, তৎপ্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই! কিন্তু আজ?—আজ তাঁহার নিকট সকলই সুন্দর—সকলই মনোরম! আবার সকলের তুলনায়, তাঁহার সুন্দরী—আরও সুন্দর—আরও মনোহর!

কুমার প্রস্ফুট চন্দ্রালোকের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন—সুন্দর অতি-সুন্দর মনে হইতেছে। কিন্তু সুন্দরীর রূপের সহিত তুলনা করিতে গিয়া আপন-মনে হাসিয়া হাসিয়া কহিতেছেন,—"চাঁদ! তুমি যতই সুন্দর হও, আমার সুন্দরীর নিকট তুমি হারি মানিয়াছ।" উদ্যানে,—বেলা, মল্লিকা, যূথী, চামেলী,—প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক জ্যোৎস্নালোকে হাসিতেছে। কুমার রামকৃষ্ণ, এক-একবার তাহাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিতেছেন; আর মনে মনে কহিতেছেন,—"সুন্দরীর হাসি আরও কত সুন্দর! এই ফুলের হাসি—সে হাসির কাছে কিছুই নয়।" পরিখার জলে চাঁদের আলো—শুভ্রবসনমণ্ডিত চারু-মনোহর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে; মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোলে জলরাশি নাচিতেছে—দুলিতেছে—খেলিতেছে; তাহাতে কারুখচিত রত্নাভরণের সৌন্দর্য্য উছলিয়া উঠিতেছে। কিন্তু, সেদিকে চাহিয়া, সে ভাব উপলব্ধি করিয়া, কুমার হাসি-হাসি-মুখে কহিতেছেন,—"মসৃণ মসলিন-মণ্ডিত দেহে সুন্দরী আমার কত সুন্দর! সূক্ষ্ম বসনাঞ্চল ভেদ করিয়া সুন্দরীর যে রূপের ছটা বিকাশ পায়, তেমন রূপ কি সংসারে আছে?" প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্যের প্রতি কুমার লক্ষ্য করিতেছেন, সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের নিকট সকলই হীনপ্রভ বলিয়া মনে হইতেছে।

সুন্দরী ও রামকৃষ্ণ।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

এইভাবে বসিয়া বসিয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গেল। সুন্দরী শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যার পর তিনি পুষ্পোদ্যানের দিকে গমন করিয়াছেন; এখনও পর্য্যন্ত কি তিনি সেইখানেই বসিয়া আছেন? সুন্দরী বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পুষ্পোদ্যানের প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিলেন। দেখিলেন—সত্যই তো! উদ্যানে মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত বেদীর উপর রামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। জ্যোৎস্নালোকে দেহ পরিস্নাত হইতেছে। কুমারের গৌরবর্ণে আর সেই চন্দ্রমালোকে কেমন মোহনে-মধুরে মিশিয়া গিয়াছে। কুমার—নীরব নিস্পন্দ সংজ্ঞাশূন্য। সুন্দরীর মনে হইল,—যেন মহাযোগী মহাদেব যোগমগ্ন রহিয়াছেন।

দ্বিতলে শয়ন-প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠের অব্যবহিত দক্ষিণে নিম্নে পুষ্পোদ্যান। প্রকোষ্ঠের গাত্র বহিয়া বিস্তৃত সোপানাবলি সেই পুষ্পোদ্যানে অবতরণ করিয়াছে। তদ্দ্বারা পুষ্পোদ্যানে ও শয়ন-প্রকোষ্ঠে কি যেন এক অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

ধীরে ধীরে, মৃদুপাদবিক্ষেপে, সেই সোপানাবলি অতিক্রম করিয়া, সুন্দরী নিম্নে অবতরণ করিলেন। কুমার রামকৃষ্ণ অট্টালিকার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন। কখনও পরিখার জলরাশির নর্ত্তন-কুর্দ্দনের প্রতি, কখনও জ্যোৎস্না-পরিস্নাত আকাশের নৈশ-শোভার প্রতি, কখনও বা উদ্যানের বিবিধ বিচিত্র কুসুম-সমূহের মৃদু-হাস্যের প্রতি, লক্ষ্য করিতেছিলেন; আর কখনও বা, নয়ন নিমীলন করিয়া, সুন্দরীর মুখ-কমল ধ্যান করিতে করিতে বিভোর হইয়া পড়িতেছিলেন। এমন সময়, সোপানাবলি অবতরণ করিয়া, ধীরে ধীরে

নিকটে আসিয়া, সুন্দরী পশ্চাৎ হইতে কুমারের চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন।

কুমার সুন্দরীর ধ্যানেই মগ্ন ছিলেন। কল্পনায় সুন্দরীর স্পর্শানুভূতি অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময়ে সুন্দরী আসিয়া কমল-কর-স্পর্শে যখন তাঁহার চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন; কুমার আপনা-আপনিই বলিয়া উঠিলেন,—"সুন্দরী! সুন্দরী!" সুন্দরী আসিয়া চক্ষু চাপিয়া ধরিয়াছেন, আর কুমার তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন,—এই জন্যই যে তিনি "সুন্দরী—সুন্দরী" বলিয়া চমকিয়া উঠিলেন, তাহা নহে। তাঁহার কল্পনা, তাঁহার চিন্তা, সুন্দরীর সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তকে বিহ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। তাই তাঁহার বাক্যে "সুন্দরী—সুন্দরী" এই আনন্দোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইল। সুন্দরী চক্ষু ছাড়িয়া দিলেন। কুমার বাহুপাশে সুন্দরীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন।

মস্তকোপরি রজত-জ্যোৎস্না হাসিরাশি ছড়াইয়া দিতেছে। পার্শ্বে পরিখার স্ফটিক-স্বচ্ছ সলিলে পূর্ণিমার চন্দ্র লুকাচুরি খেলিতেছে। মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোলে কুসুম-সৌরভে দিক আমোদিত করিতেছে। প্রকৃতি—স্নিগ্ধ, শান্ত, মধুরিমাময়।

অনেক ক্ষণ—অনেক ক্ষণ—উভয়ে উভয়ের মুখপানে নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। চারি চক্ষে মিলন হইল। পরস্পর পরস্পরের সৌন্দর্য্য-মোহে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কুমার দেখিলেন—সুন্দরীর রূপের সীমা নাই। সুন্দরী দেখিলেন—তাঁহার প্রাণেশ্বর সকল সৌন্দর্য্যের আধার-স্থল। কুমার দেখেন—সুন্দরীর কমনীয় কান্তি। সুন্দরী দেখেন—কুমারের সৌন্দর্য্য-বিভূতি।

অনেক ক্ষণ একই ভাবে কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে, চাহিতে চাহিতে, বিহ্বল হইয়া, কুমার কহিলেন,—"সুন্দরী! তুমি এত সুন্দর! আমার মনে হয়, আমি দিবারাত্রি তোমার মুখপানে চাহিয়া থাকি।"

সুন্দরী ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা নতমুখী হইলেন।

চিবুক-স্পর্শে সুন্দরীর মুখখানি উত্তোলন করিয়া কুমার আবার কহিলেন—"তোমার এই সুন্দর মুখখানি কেবলই দেখিতে সাধ হয়। সুন্দরি!—কেন দিন আসে?—কেন অন্তরায় ঘটে? কেন তোমায় আমায় সারা দিনরাত্রি একত্র থাকিতে পাই না!"

সুন্দরী মনে মনে কহিলেন,—"নাথ! এ যে আমারই মনের কথা! অন্তর্য্যামি!—তুমি কি আমার মন বুঝিবার জন্য আমায় পরীক্ষা করিতেছ?" কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না।

কুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুন্দরি! তুমি কেন সর্ব্বদা আমার কাছে আস-না? এখন তো মা এখানে নাই!—তবে কেন এত সঙ্কোচ বোধ কর? আমি সন্ধ্যার পর হইতে তোমার প্রতীক্ষায় এখানে আসিয়া বসিয়া আছি। তুমি এত দেরিতে এলে?"

সুন্দরী আর নিরুত্তর থাকিতে পারিলেন না। পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়া উত্তর না পাইয়া পতি পাছে ক্ষুণ্ণ হন,—তাই উত্তর দিলেন। যেন বীণা-স্বরে ঝঙ্কার উঠিল। সুন্দরী কহিলেন,—"নাথ! দেবতার চরণ-দর্শনে দাসীর কি কখনও অসাধ হয়? দেবতাকে হৃদয়ে রাখিয়া হৃদয় শান্তিলাভ করিবে,—এর চেয়ে সংসারে আর কি আনন্দ আছে? তবে যে সর্ব্বদা—"

কুমারের ভাল লাগিল না। কুমার কহিলেন,—"আমি ও-সব কথা শুনিতে চাহি না। সুন্দরী!—তুমি বল—আমায় কতটুকু ভালবাস!"

সুন্দরী কি উত্তর দিবেন? হিন্দু-রমণী আপন পতি-দেবতাকে কত ভালবাসেন,—ভাষায় কি তাহা ব্যক্ত করা সম্ভবপর?

সুন্দরী উত্তর দিতে পারিলেন না।

কুমার আবার কহিলেন,—"সুন্দরি! বল—আমায় ভাল-বাস! বল—বল—আমার প্রাণভরা ভালবাসা!"

সুন্দরীকে উত্তর দিতে হইল। কিন্তু সুন্দরী সে উত্তর দিতে পারিলেন না। সুন্দরী উত্তর দিলেন,—"নাথ!—নাথ! কি বলিব? তুমি যে আমার হৃদয়ের দেবতা!"

প্রেম-বিহ্বলা সুন্দরীর নয়ন-প্রান্তে প্রেমাশ্রু-সঞ্চার হইল।

কুমার আবেগভরে কহিলেন,—"সুন্দরি! সুন্দরি! আমি আর কিছু চাহি না। বল--ভালবাসি!"

"ভালবাসি!" সুন্দরী বলিবার চেষ্টা পাইলেন,—"ভাল-বাসি!" কিন্তু কণ্ঠস্বর কণ্ঠে আবদ্ধ রহিল। সে স্বর অতিক্রম করিয়া, সুন্দরীর কণ্ঠে নূতন স্বর উঠিল,—"ভক্তি করি।"

কিন্তু কুমারের কর্ণ—সে স্বর শুনিবার জন্য তো প্রস্তুত নয়! কুমার কহিলেন,—"সুন্দরি! তবে তুমি ভালবাস না?"

"সে কি নাথ! সে কি বল!" সুন্দরীর অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। সুন্দরী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন,—"ভালবাসি।"

সুন্দরি!—আবার বল!—আবার বল!—আবার বল!—"আমি ভালবাসি।" কুমার রামকৃষ্ণ তোমার সুধামাখা-কণ্ঠে শুধুই শুনিতে চান, তুমি বল—"আমি ভালবাসি।"

কুমার কহিলেন,—"ভালবাস!"

সুন্দরী উত্তর দিলেন,—"ভালবাসি!"

এক বার, দুই বার, তিন বার!—সুন্দরী যত বার বলিলেন, কুমার তত বার শুনিবার জন্য আগ্রহ-প্রকাশ করিলেন। উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত, সেই ভাবে—সেই চিন্তায়—সেই কথায়, বিভোর হইয়া রহিলেন।

সংসারের প্রতি কুমারের অনাসক্তির ভাব দেখিয়া, কুমারকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য, মহারাণী ভবানীর সহিত চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতির যে পরামর্শ হইয়াছিল,—এখন তাহারই ফল ফলিয়াছে। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া সুন্দরীর প্রেম-পাশে কুমারকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যেদিন কুমারের বিবাহ-বিষয়ে পরামর্শ হয়, তাহার পর দিন হইতেই পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে থাকে। দুই মাস মধ্যেই অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা সুন্দরীর ন্যায় মনোমোহিনী পাত্রী স্থির করেন। রাজসাহী-জেলার বীরকুৎসা-গ্রামে মজুমদার-দিগের বাস। বীরকুৎসার মজুমদারগণ বরেন্দ্র-শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তাঁহারা সিংদিয়াড়গ্রামী। এতাবৎকাল তাঁহারা কষ্ট-শ্রোত্রিয়-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সুন্দরী—সেই বংশের সুন্দরী কন্যা। বংশমর্য্যাদার প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহ দিতে হইলে, হয় তো বীরকুৎসার মজুমদারদিগের গৃহে কুমার রামকৃষ্ণের বিবাহে আপত্তির কথা উঠিতে পারিত। কিন্তু সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-প্রভায় সে অন্তরায় দূরীভূত হয়। সুন্দরীর আকৃতি, গঠন ও লক্ষণ প্রভৃতি দেখিয়া, সুন্দরীর সহিত কুমারের পরিণয়-কার্য্য ধার্য্য হইয়া যায়। পরন্তু, সেই বিবাহের ফলে, বীরকুৎসার

মজুমদারগণ 'শুদ্ধ শ্রোত্রিয়' মধ্যে পরিগণিত হন। সুন্দরীর এত রূপ—সুন্দরীর এত সৌন্দর্য্য!

রূপের প্রভাবেই সুন্দরী আজি 'সুন্দরী' নামে পরিচিতা। সুন্দরীর প্রকৃত নাম সুন্দরী নহে। সুন্দরীর নাম ছিল—জগদম্বা। সুন্দরীর নাম ছিল—শিবসুন্দরী। কিন্তু বিবাহের পর হইতে সুন্দরীর সে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। নাটোর-রাজধানীতে আসিয়া অবধি সুন্দরী 'সুন্দরী' নাম প্রাপ্ত হন। রাজ-সংসারের অপরাপর সকলের নিকট অথবা প্রতিবাসী আত্মীয়গণের নিকট তিনি অবশ্য 'বধূরাণী' নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁহারা অনেকেই সুন্দরীর পূর্ব্বনামও অবগত নহেন;—সুন্দরী নামেরও বিষয় প্রায় বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। কিন্তু কুমার রামকৃষ্ণ সুন্দরীকে সুন্দরী বলিয়াই জানেন, সুন্দরী বলিয়াই সম্বোধন করেন, সুন্দরী বলিয়াই বিভোর হইয়া আছেন।

অনেকটা বয়ঃপ্রভাবেও এই বিভোরতা আনয়ন করিয়াছে। কুমারের বয়ঃক্রম এখন দ্বাবিংশ বর্ষ উত্তীর্ণ-প্রায়। সুন্দরী ষোড়শী। এ বয়সে, এ মিলনে, মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটে নাই কি? তাই—এ দেখে ও-কে, ও দেখে এ-কে!—দেখিয়া দেখিয়া, দেখার সাধ আর পূরণ হয় না!

দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে—রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। পূর্ণিমার চন্দ্র, মস্তক উল্লঙ্ঘন করিয়া, পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িলেন। সুন্দরী, এক এক বার চাঁদের দিকে, আর এক এক বার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, চাঁদের হাসিকে ম্লান বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন। সুন্দরী, এক এক বার চাঁদের স্নিগ্ধতার বিষয় অনুভব করিয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া,

সেই মুখের নিকট চাঁদের স্নিগ্ধতাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিতেছিলেন। এই ভাবে—বিহ্বল-প্রাণে চাঁদের পানে চাহিতে চাহিতে, সহসা এক বার সুন্দরীর সংজ্ঞা-সঞ্চার হইল। সুন্দরী বুঝিলেন—'নিশামণি অস্তাচলে গমন করিতেছেন। আর অধিক ক্ষণ বসিয়া থাকিলে, পতির কষ্ট হইতে পারে।' তাই পতিকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিল। আপনি একটু বিশ্রাম করিবেন—চলুন। প্রভাতে আপনার কত কাজ আছে।"

কুমার রামকৃষ্ণ অন্যরূপ বুঝিলেন। তাঁহার মনে হইল—'বুঝি সুন্দরীর কষ্টবোধ হইতেছে।' তাই কহিলেন,—"সুন্দরি! আমি বুঝিতে পারি নাই। তোমার কষ্ট হইতেছে? চল, শয়ন-গৃহে গমন করি।"

সুন্দরীর কতই লজ্জাবোধ হইল। সুন্দরীর তো একটুও কষ্ট হয় নাই! সুন্দরী শুধুই স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার বিশ্রামের জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু সুন্দরী সে কথা কহিতে পারিলেন না।

কুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কুমারের মনে হইল,—'সুন্দরী ভালবাসে না!' কিন্তু কুমার আপন-মনে আপনা আপনিই কহিলেন,—"সুন্দরি! তুমি না ভালবাস, আমার ভালবাসায় আমি তোমায় প্রাণের ভিতর বাঁধিয়া রাখিব।"

সুন্দরীরও সেই ভরসা! সুন্দরীর হৃদয়েও সেই স্বর বাজিয়া উঠিল। সুন্দরীও মনে মনে কহিলেন,—"আমার হৃদয়ের দেবতা! প্রেম-ভক্তির প্রাণপাত পূজায় আমি তোমায় তুষ্ট রাখিব। কথায় উত্তর কি আর দিব?"

সুন্দরীর তাই উত্তর দেওয়া হইল না। কুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বাহু-ডোরে সুন্দরীকে বেষ্টন করিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে শয়ন-প্রকোষ্ঠের দিকে পদ-সঞ্চার করিলেন। তখন দুই জনেরই হৃদয়ে এক চিন্তা; কিন্তু দুই জনেই নির্ব্বাক। তখন দুই জনেরই হৃদয়ে একই শব্দ—একই ধ্বনি; কিন্তু কাহারও মুখে কোনই অভিব্যক্তি নাই।

সুন্দরী ভাবিতেছেন—"নাথ! আমার হৃদয়-মন্দিরে তুমি চির-অধিষ্ঠিত। আমার প্রেম-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিতে চিরদিন তোমার পূজা করিব। আমা ছাড়া তুমি কোথায় যাইবে—কোথায় থাকিবে?"

কুমারের হৃদয়েও যেন তাহারই প্রতিধ্বনি!—"সুন্দরি! তুমি দূরে গমন করিতে চাহিলেও, আমার হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। দিবাবসান-কালে বৃক্ষের ছায়া যেমন বনস্পতির মূল পরিত্যাগ করিতে পারে না, আমার হৃদয়েও তোমার সেইরূপ অবস্থিতি জানিবে।"

* * *

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### বিষয়াসক্তি।

"ওরে মন, কি ব্যাপারে এলি!
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া,
লাভে মূলে হারাইলি।"

—রামপ্রসাদ।

প্রভাতে কুমার বহির্ব্বাটীতে আসিতেছেন। তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় পারিষদগণ পূর্ব্ব হইতেই বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন।

সকলেই বৈঠকখানায়; কিন্তু কালীশঙ্কর কেন বাহিরে দাঁড়াইয়া?

কুমার যে পথ দিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমন করেন, সেই পথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কালীশঙ্কর অপেক্ষা করিতেছেন। কুমার বহির্ব্বাটীতে পদার্পণ করিবা-মাত্র কালীশঙ্কর দ্রুত-গতিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তার পর অতি-মৃদুস্বরে তিনি কুমারকে কি বলিলেন।

কুমারের আর বৈঠকখানায় প্রবেশ করা হইল না। কালী-শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিলেন। যাঁহারা বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। বোধ হয় কোনও কারণ-বশতঃ অন্দর হইতে বাহিরে আসিতে কুমারের বিলম্ব হইতেছে—এই মনে করিয়া, তাঁহারা আপন-আপন কথা লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন।

কুমারের সহিত কালীশঙ্করের অনেক ক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা

চলিতে লাগিল। কালীশঙ্কর প্রথমেই কহিলেন,—"আপনার ইষ্ট-সাধনের জন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনার সংসারে প্রবেশ করিয়াছি। ভবানীর মন্দিরে যেদিন প্রথম আপনার আশ্রয় প্রাপ্ত হই, সেদিন আপনার নিকট অকপটে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম। সে সকল কথা হয় তো আপনার একটু একটু স্মরণ থাকিতে পারে।"

রামকৃষ্ণ।—"ভাই! তোমার কথা চিরদিন মনে জাগরূক থাকিবে। আমার হিতসাধনে সেই দিন হইতে যেভাবে তুমি জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, আমি প্রাণে প্রাণে তাহা অনুভব করি। তোমার ন্যায় বিশ্বস্ত বন্ধু রাজ-সংসারে অল্পই আছে। বিষয়-কর্ম্ম-সম্পর্কে তোমার উপদেশ সর্ব্বদাই আমি গ্রহণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। যে কোনও বিষয়ে তোমার যে কোনও কথা বলিবার আছে, আমায় নিঃসঙ্কোচে বলিতে পার। আমি অবশ্যই তোমার কথা শুনিব।"

কালীশঙ্কর কহিলেন,—"আমার যে সকল কথাই আপনাকে শুনিতে হইবে,—এমন স্পর্দ্ধা আমার মনে কখনও হয় নাই। আমি আপনার সেবক,—আমি আপনার আদেশ-পালক ভৃত্য মাত্র। তবে যে আপনি আমায় 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করেন, আমার কথা শুনিতে চাহেন, সে আপনার করুণার পরিচয়। নহিলে, আমি কোন্ কীটাণুকীট, আপনার পদতলে স্পৃষ্ট হইবারও অযোগ্য।"

রামকৃষ্ণ।—"ও-সব কথা কেন বল ভাই! তোমায় আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি।"

কালীশঙ্কর।—"ও-সব কথা কেন বলি? যেদিন আমি এক মুষ্টি অন্নের জন্য আপনার দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া আসিয়া-

ছিলাম, যেদিন আমি সংসার-সাগরে পড়িয়া কূল-কিনারা না পাইয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সেদিনের আপনার দয়ার কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব কি? জীবনে হতাশ হইয়া, আমি ভবানী-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলাম; সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, দুর্ব্বহ জীবন-ভার লইয়া সংসারে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। এমন সময়, আমার প্রতি আপনার গুরুস্থানীয় মহামান্য গোপীনাথ ঠাকুরের কৃপা-দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। সে অনুগ্রহ না পাইলে, আমি কি কখনও আপনার চরণ-তলে উপনীত হইতে পারিতাম? আপনি যখন ভবানীপুরে মায়ের মন্দিরে গমন করেন, আপনার সঙ্গে পঞ্চসহস্রাধিক মথুরাবাসী সৈন্য ছিল; অন্যান্য লোক-জনও অসংখ্য। সে ক্ষেত্রে, বড় বড় আমীর-ওমরাহ আসিয়াই আপনার সাক্ষাৎ পাইত না। কিন্তু আমাকে যে আপনি সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়াছিলেন, সে কি আপনার কম অনুগ্রহ? সেই অনুগ্রহের জন্যই তো আমি আপনার চির-দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। আপনার হিত-সাধনই এখন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।”

রামকৃষ্ণ।—“ভাই! আমি কি তোমায় চিনিতে পারি নাই? আমি যে এখন নিশ্চিন্ত-মনে তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারি! ইহার অধিক আর কি বলিব? যাহা হউক, বিষয়-কর্ম্ম-সম্পর্কে তুমি কি বলিতে চাও, আমায় বল।”

কালীশঙ্কর সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় আপন কথাই কহিতে লাগিলেন; আবার বলিলেন,—“দেবীর মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।

আপনার ইষ্ট-সাধনই এখন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। উহাই আমার জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছি। এ ভিন্ন জগতে আমি আর কিছু জানি না, জানিবারও আমার প্রয়োজন নাই।"

কালীশঙ্কর যতই অন্য কথা কহেন, কুমারের মন ততই আসল কথা জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়। কুমার আবারও তাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই! কাদিহাটী আর ভূষণা-পরগণা সম্বন্ধে তুমি কি বলিতেছিলে? প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য আমার বড় ঔৎসুক্য হইয়াছে।"

কালীশঙ্কর।—"আমি যত দূর সংবাদ পাইয়াছি, ঐ দুই পরগণায় ঘোর ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। খাজনা একটী পয়সা আদায় নাই; মাঝে মাঝে প্রজাবিদ্রোহের সংবাদ আসিতেছে।"

রামকৃষ্ণ।—"এ সংবাদ আমি তো কৈ এত দিন কিছুই শুনি নাই? ঠাকুর মহাশয়কে এখনই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

কালীশঙ্কর একটু বিচলিত হইলেন; কহিলেন,—"জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন; কিন্তু—"

"কিন্তু" বলিয়াই কালীশঙ্কর চুপ করিয়া রহিলেন। কুমার অধিকতর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ভাই!—কি বলিতেছিলে? বলিতে বলিতে, চুপ করিলে কেন?"

কালীশঙ্কর সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ করিয়া উত্তর দিলেন,—"না—থাক! সে কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই।"

রামকৃষ্ণ।—"তুমি এখনও আমার নিকট সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ করিতেছ? তুমি কি এখনও আমাকে অবিশ্বাস কর?"

কালীশঙ্কর যেন শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"আপনাকে

অবিশ্বাস! তা'হলে যে আমার নরকেও স্থান হ'বে না! তবে যে বলিতে সঙ্কোচ-বোধ করিতেছিলাম, তাহার কারণ অন্যরূপ। রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর মহাশয় সাক্ষাৎ দেবতা; তাঁহার দেব-প্রকৃতি; কুটিল মনুষ্যের কূট-চক্রে তিনি লক্ষ্য করিবেন কেন? তিনি সকলকেই সাধুপ্রকৃতি বলিয়া মনে করেন। তিনি সকলের সহিতই দেবতার ন্যায় ব্যবহার করেন। বিষয়-কর্ম্মে তাঁহার অনাসক্তি। বিষয়-কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতে হইলে, কেবল পরোপকার ব্রতধারী দেব-প্রকৃতি হইলেই চলে কি? বিষয়-ক্ষেত্রে নানা-প্রকৃতির লোকের সহিত নানা-প্রকার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।"

রামকৃষ্ণ।—"তবে কি ঐ দুই পরগণার বিশৃঙ্খলার বিষয় ঠাকুর মহাশয় কিছুই অবগত নহেন?"

কালীশঙ্কর।—"সে কথাই বা আমি কেমন করিয়া বলিতে পারি!"

রামকৃষ্ণ।—"এ বিষয় ঠাকুর মহাশয়কে কিছু জিজ্ঞাসা করিব কি?"

কালীশঙ্কর।—"সে আপনার অভিরুচি। জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে কেবল লজ্জা দেওয়া হইবে। ঠাকুর মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে, আপনার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত হইতেছে। তাঁহার ব্যবস্থায় যদি কোনও ক্রটি দাঁড়াইয়া থাকে, সে ক্রটির বিষয় উল্লেখ করিতে গেলে, তিনি ক্ষুন্ন হইবেন না কি?"

রামকৃষ্ণ।—"তাহা হইলে, কি করা কর্ত্তব্য?"

কালীশঙ্কর।—"আমিও তো তাহাই ভাবিতেছি! তেমন বিশ্বস্ত লোক তো কাহাকেও দেখিতে পাই না!"

রামকৃষ্ণ।—"দুই একটী বিশ্বস্ত লোক পাইলেই বা কি করিতে পারি? যেরূপ বিশৃঙ্খলার কথা বলিতেছ, যেরূপ প্রজা-বিদ্রোহের বিষয় শুনিতেছি, তাহাতে দুই একটী লোকেই বা কি করিতে পারিবে?"

কালীশঙ্কর।—"লোকের মত লোক একটী হইলেও কাজ চলিতে পারে। সামান্য কিছু অর্থ লইয়া, আপনার কোনও বিশ্বস্ত লোক সেখানে যদি গমন করেন, তিনি অনায়াসে প্রজা-গণকে বশে আনিতে পারেন। পরগণার দুই একটী মণ্ডলকে বশে আনিতে পারিলেই কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা আছে। প্রজা উচ্ছৃঙ্খল হইলে কি করিয়া জমিদারী রক্ষা করিতে হয়, আমার বয়স অল্প হইলেও, আমি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। ঐ ভূষণা-পরগণাই যখন রাজা সীতারাম রায়ের রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল, আমার পিতামহ কিছু দিন ভূষণা-পরগণায় নায়েবী করিয়াছিলেন। সেই সময় মুসলমান প্রজারা বিদ্রোহী হয়। কিন্তু তিনি কি কৌশলেই ভূষণায় শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন! তাঁহার নিকট যখনই আমি সেই সকল কথা শুনিতাম, তখনই আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে, সকল দিকে সমান দৃষ্টি রাখার আবশ্যক হয়।"

রামকৃষ্ণ।—"জমীদারীর কাজ-কর্ম্মে তোমার তো বেশ অভিজ্ঞতা আছে দেখ্ছি।"

কালীশঙ্কর।—"পিতা-পিতামহ চিরজীবন জমীদারীর কাজ-কর্ম্মই করিয়া গিয়াছেন! নিতান্ত দুর্ভাগ্য হইলেও, তাঁহাদের বংশধর তো বটে!—পিতৃপিতামহাগত স্বাভাবিক জ্ঞানটুকুও পাইব না কি?"

কুমার মনে মনে কি একটু চিন্তা করিলেন। পরক্ষণেই কহিলেন,—“এ বিষয় আমি সন্ধ্যার সময় আবার তোমার সহিত পরামর্শ করিব।”

অতঃপর উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন। কালীশঙ্কর আর কাহারও সহিত দেখা না করিয়া আপনার বাসার দিকে রওনা হইলেন। কুমার রামকৃষ্ণ চিন্তাক্লিষ্ট-হৃদয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, বৈঠকখানা হইতে একটা বিকট হাস্য-ধ্বনি উত্থিত হইয়া তাঁহার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল। কুমার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিবা-মাত্র সে হাস্যধ্বনি থামিয়া গেল। সকলেই কুমারের প্রতি যথা-যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

বৈঠকখানার মধ্যস্থলে, কুমারের আসনের সম্মুখে, গৈরিক-বসনধারী জনৈক ব্রহ্মচারী বসিয়া ছিলেন। কুমারের পারিষদগণ সেই ব্রহ্মচারীকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন। কথাবার্ত্তায় ব্রহ্মচারীতে সময়ে সময়ে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। সকলেই তাই তাঁহাকে লইয়া পরিহাস করিতেছিলেন

* *
*

## নবম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ কি উন্মাদ ?

"কুভার্য্যাঞ্চ কুমিত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্।
কুবন্ধুঞ্চ কুদেশঞ্চ দূরত পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

—গরুড়পুরাণম্।

কুমারকে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া, ব্রহ্মচারী প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন,—"আপনিই মহারাজ? পাপকে সংসার হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা কিছু করিতে পারিয়াছেন কি? সেই কথা জানিবার জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।"

ব্রহ্মচারী কি বলিতেছেন—কুমারও বুঝিতে পারিলেন না, পারিষদগণেরও তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল না।

কুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া, ব্রহ্মচারী পুনরায় কহিলেন,—"আমায় পাগল বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু আমি পাগল নই। আমার প্রশ্ন প্রলাপ বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু প্রলাপ নয়। আমি আপনার রাজ্যে বাস করিতে আসিয়াছি। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার রাজ্য হইতে পাপকে দূরীভূত করিতে পারিয়াছেন কি?"

কুমার নির্ব্বাক নিরুত্তর। কুমার একদৃষ্টে ব্রহ্মচারীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী আবার কহিলেন,—"মহারাজ! নিরুত্তর কেন? আমার দারুণ সংশয়; আমি সেই জন্য আপনার নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছি। আপনি পুণ্যস্বরূপিণী মহারাণী ভবানীর

বংশধর ; আপনার রাজ্য হইতে আপনি কি পাপকে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই ?"

রামকৃষ্ণ আর নিরুত্তর থাকিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি কারণ এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার কি প্রার্থনা আছে, আমায় স্পষ্ট করিয়া বলুন। যদি আমার অসাধ্য না হয়, আমি সে প্রার্থনা পূরণ করিব।"

ব্রহ্মচারী।—"আপনি কি তবে মনে করিতেছেন—আমি ভিক্ষার্থী হইয়া আপনার দ্বারে আসিয়াছি ? তাহা যদি মনে করিয়া থাকেন, সে আপনার ভ্রম।"

রামকৃষ্ণ।—"তবে আপনি কি জন্য ওরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন ?"

ব্রহ্মচারী।—"আমি শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি, রাজার পাপে প্রজা কষ্ট পায়। আমার নিজের জীবনে আমি সে পরীক্ষা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। আমি যে জীবনে কখনও কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছি, আমার স্মরণ হয় না। কিন্তু গুরুতম দণ্ড ভোগ করিয়াছি। কেন—কাহার পাপে আমায় এ দণ্ড ভোগ করিতে হইল ? আমি বেশ বুঝিয়াছি, রাজার পাপেই আমার সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে !"

"রাজার পাপ !"—কুমার শিহরিয়া উঠিলেন।

ব্রহ্মচারী অশ্রুগদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"আমার অষ্টম বর্ষীয় শিশুপুত্র রঘুনাথ—আমার জীবনের ধ্রুবতারা রঘুনাথ—আমার হৃদয়-মরুভূমির শান্তি-প্রস্রবণ রঘুনাথ—আমার কোন্ পাপে আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেল ? শাস্ত্রমতে পুত্রহন্তা

পুত্রশোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমি তো কৈ কখনও কোনও পিতার ক্রোড় হইতে তাঁহার শিশুপুত্রকে বিচ্ছিন্ন করি নাই! তবে কেন আমার এমন ঘটিল?”

কুমার বুঝিলেন,— পারিষদগণ বুঝিলেন,—ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে পাগল হইয়াছেন। সুতরাং সকলেই ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা পাইলেন।

কিন্তু সে সান্ত্বনা-বাক্যে ব্রহ্মচারী কর্ণপাত করিলেন না। তিনি একই ভাবে আপন কথাই কহিয়া যাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী কহিতে লাগিলেন,—“সান্ত্বনা দিয়া আমায় কি ভুলাইবার চেষ্টা পাইতেছেন? আমার সান্ত্বনা—এ জীবনে আর হইবার নহে। আমার সোণার সংসার ছিল। পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা—আমার সোণার সংসার ছিল। কিন্তু সকলই নিশ্বাসে উড়িয়া গেল! কার পাপে? আমি এমন কি পাপ করিয়াছিলাম,—যাহার ফলে এরূপ অঘটন সংঘটন হইল! আমার প্রাণপুতুলি রঘুনাথ—যে দিন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, সেই দিন হইতেই গৃহিণী উন্মাদিনী। কয়েক দিন তাঁহাকে সাবধানে সাবধানে রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তারপর হঠাৎ এক দিন তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন, আর খুঁজিয়া পাইলাম না। পুত্রশোকে মুহ্যমানা হইয়া, তিনি এখন জীবিত কি মৃত,—কিছুই বলিতে পারি না।”

বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণে, কুমার প্রাণের ভিতর দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ নির্ব্বাক হইলে, কুমার কহিলেন,—“আপনি বড়ই শোক পাইয়াছেন দেখিতেছি।”

ব্রহ্মচারী আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার কাহিনী কতটুকুই বা শুনিয়াছেন! আমার কন্যা ও পুত্রবধূ—দুইটী প্রস্ফুটিত সোণার কমল—আমার স্বচ্ছ-নির্ম্মল সংসার-সরোবর আলো করিয়া ছিল। এক দিন, হঠাৎ তাহারা বৃন্তচ্যুত হইল। কি কুক্ষণে, কাল-স্বরূপিণী কালাদিঘীতে তাহারা গা ধুইতে গেল; কিন্তু আর বাড়ী ফিরিল না! কোন্ পাপে, কাহার পাপে,—বলিতে পারেন কি?"

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাঁহারা কোথায় গেলেন? তাঁহারা কি জলমগ্ন হইলেন? তাঁহাদিগকে কি হাঙ্গরে কুম্ভীরে গ্রাস করিল?"

ব্রহ্মচারী উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"কি হইল, কে বলিতে পারে! কিন্তু তাহারা আর ফিরিল না। কত সন্ধান করিলাম; কিন্তু তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার পুত্র ও জামাতা—তাহাদিগের সন্ধানে সেই যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, তাহারাও আর ফিরিয়া আসে নাই। কোন্ পাপে, কাহার পাপে,—এরূপ ঘটিল?"

পারিষদবর্গের মধ্য হইতে অরূপনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি কি রূপনগরের কৃষ্ণনাথ রায়ের কথা কহিতেছেন? অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সংসারের এইরূপ একটী দুর্ঘটনার বিষয় আমার পিতার নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম। আপনি কি সেই ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেছেন? আপনার কন্যা, জামাতা, পুত্র, পুত্রবধূ, গৃহিণী,—এ পর্য্যন্ত কাহারও কোনও সংবাদ পান নাই কি? রূপনগরের বাড়ীতে এখন তবে আপনার কে আছে?"

ব্রহ্মচারী অধিকতর বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"রূপনগর? কোথায় রূপনগর? রূপনগরের এখন তো আর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! তেমন সমৃদ্ধিশালী গ্রাম—এখন ধূ-ধূ প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। কখনও যে সেখানে গ্রাম ছিল, কখনও যে সেখানে লোকের বসতি ছিল,—এখন আর তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমার পরিজনবর্গ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া একে একে চলিয়া যাওয়ার পর, আমি তাহাদের সন্ধান করিতে গিয়াছিলাম। কয়েক মাস পরে, বিফল-মনোরথ হইয়া, যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলাম, দেখিলাম,—গ্রামের চিহ্ন মাত্র নাই, গ্রামখানি যেন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে!"

সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনুপনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গ্রামখানা উড়িয়া গেল! এ আপনি কি বলিতে-ছেন? এ কথা কৈ কখনও তো শুনি নাই!"

অন্যতর পারিষদ গৌরীকান্ত কহিলেন,—"লোকটা পাগল হইয়াছে।"

ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন,—"পাগল? পাগলই বটে! মহারাজ বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়াও সে সংবাদ অবগত নহেন,—তাই আমি পাগল! আপনারা কি জানেন না—এক একটী রাষ্ট্র-বিপ্লবে কত পল্লী, কত গ্রাম উৎসন্ন যায়? আপনাদের কি মনে পড়ে না,—নবাব মীরকাসেমের সহিত ইংরেজের যখন মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, মীরজাফর যখন সসৈন্যে মীরকাসেমের অনুসরণ করেন, ভীষণ গর্জ্জনে বিপুল বাহিনী যখন গিরিয়ার প্রান্তরাভিমুখে ধাবমান হয়,—কত গ্রাম, কত পল্লী উৎসন্ন গিয়াছিল? রূপনগর সেই সময় ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। সেই পথে

পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যদল যখন পরিচালিত হয়, গ্রাম ছাড়িয়া, বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া, রূপনগরবাসীরা—যে যেদিকে পায়, পলায়ন করে। শুনিতে পাই, এক দিন এক দল সৈন্য সেই গ্রামে অবস্থান করিয়াছিল। তাহারই ফলে, রূপনগরের অস্তিত্ব চিতোরে লোপ পাইয়াছে। যদি বিশ্বাস না হয়, পরন্তু যদি চক্ষুষ্মান্ হন, একবার চাহিয়া দেখুন,—রূপনগরের কি দশা ঘটিয়াছে!"

কুমার রামকৃষ্ণ কহিলেন,—"রূপনগর! রূপনগর কি এখন নাই? রূপনগরের রায়েরা তবে এখন কোথায়?"

ব্রহ্মচারী।—"রূপনগরের রায়েরা?—রায়েরা আর নাই! যিনি ছিলেন, তাঁহার সে পরিচয় এখন লোপ পাইয়াছে। রূপনগর এখন শ্মশান।"

অনুপনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নামই কি তবে কৃষ্ণনাথ রায়?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন,—"কৃষ্ণনাথ রায়ের নাম লোপ পাইয়াছে। আমি সেই কৃষ্ণনাথ রায়ের প্রেতাত্মা। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? আমি মহারাজকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, মহারাজ তাহার উত্তর দেন।"

মহারাজ কহিলেন,—"আপনি পুনঃপুনঃ এরূপ প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

ব্রহ্মচারী।—"জিজ্ঞাসা করিতেছি—প্রাণের জ্বালায়! জিজ্ঞাসা করিতেছি—'পাপের রাজ্যে আর বাস করিব না বলিয়া!' যে রাজার রাজ্য পাপ-পরিপূর্ণ, সেখানে কোনক্রমেই প্রজার শান্তি নাই। আমি যে অহর্নিশ অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছি, তাহার

কারণ আর কি হইতে পারে? আমি পাপের রাজ্যে বাস করিয়াছিলাম বলিয়া, সেই জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি।"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন আপনি তবে কি চান?"

ব্রহ্মচারী।—"আমি জানিতে চাই, আপনার রাজ্যে পাপ আছে কি না? যদি আপনি পাপকর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা না হন, যদি আপনার ধর্ম্মরক্ষার প্রতি দৃষ্টি থাকে, আমি আপনার রাজ্যে বাস করিব মনস্থ করিয়াছি।"

ব্রহ্মচারীর সহিত মহারাজের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিবা-মাত্র মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; পরিশেষে সাষ্টাঙ্গে তাঁহার চরণতলে প্রণত হইলেন। অপরাপর সকলেও যথারীতি অভিবাদন করিতে লাগিলেন। প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই ব্রহ্মচারীকে সম্বোধন করিয়া রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনিই কি ব্রহ্মচারী? আপনিই কি নিষ্পাপ স্থান অন্বেষণ করিতেছেন? যদি ব্রহ্মচারী হন, আপনার আবার স্থানাস্থানের প্রয়োজন কি? আপনার নিকট সকল স্থানই তো নিষ্পাপ হইতে পারে! ব্রহ্মচারী হইয়াও আপনার এরূপ সংশয়-প্রশ্ন—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! আপনি অনায়াসে যে-কোনও বিল্ববৃক্ষ-মূলে বাস করিতে পারেন।"

ব্রহ্মচারী।—"আমার সঙ্কল্প—যে রাজার রাজ্যে পাপ আছে, আমি সে রাজার রাজ্যে বাস করিব না।"

রুদ্রনারায়ণ।—"পাপ পৃথিবীর কোথায় নাই? এই কলি-কালে আপনি পাপশূন্য স্থান সন্ধান করিতেছেন! আপনার

ন্যায় ভ্রান্তবুদ্ধি কেহ দ্বিতীয় নাই! ব্রহ্মচারী হইয়াও আপনার এ জ্ঞানটুকুর সঞ্চার হইল না?"

ব্রহ্মচারী।—"মহারাজ রামকৃষ্ণের রাজত্ব তবে কি পাপশূন্য নহে?"

রুদ্রনারায়ণ।—"সে কথা কেমন করিয়া বলিতে পারি!"

ব্রহ্মচারী।—"তবে আর আমার এ রাজ্যে বাস করা হইল না। যে রাজ্য পাপ-পরিপূর্ণ, যে রাজ্যের রাজা রাজ্য হইতে পাপকে বিদূরিত করিবার জন্য যত্নবান্ নহেন, যে রাজ্যে ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য রাজা আত্মপ্রাণ তুচ্ছ-জ্ঞান করিতে পারেন না,—সে রাজ্যে বাস করিতে নাই। আমি চলিলাম। আর তিলার্দ্ধ এখানে অবস্থান করিব না।"

ব্রহ্মচারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরেরও ইচ্ছা, ঐ ব্রহ্মচারী-বেশী উন্মাদ ব্রাহ্মণকে কোনপ্রকারে কুমার রাম-কৃষ্ণের নিকট হইতে অপসৃত করেন। সুতরাং রুদ্রনারায়ণ কহিলেন,—"রাজধানী কি কখনও পাপশূন্য হয়? এখানে নিত্য পাপানুষ্ঠান—পরদার, নরহত্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি নিত্য সংঘটিত হইয়া থাকে। আপনার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ স্থান নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য। নিষ্পাপ স্থান অনুসন্ধান করিতে হইলে, আপনাকে বনবাস-আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপনি বনবাসী হউন।"

ব্রহ্মচারী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ রামকৃষ্ণের রাজ্যও পাপ-পরিপূর্ণ! যদি তাই হয়, কাজেই আমায় বনবাস-আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।"

ব্রহ্মচারী প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিলেন। রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর ইঙ্গিতে এক জন পরিচারকের উপর সেই ব্রহ্মচারীর পরিচর্য্যার

ভার অর্পণ করিলেন। মহারাজের নিকট ব্রহ্মচারী আশ্রয় পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যায় কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে—ঠাকুর মহাশয়ের ইঙ্গিতে তাহার ব্যবস্থা হইয়া গেল। পক্ষান্তরে পুরী-রক্ষক কর্ম্মচারীকে তিনি বলিয়া দিলেন,—"এরূপ-ভাবে যে-সে আসিয়া কুমারকে সর্ব্বদা বিরক্ত না করে, আপনি তৎপ্রতি একটু দৃষ্টি রাখিবেন।"

ব্রহ্মচারী চলিয়া গেলেন। রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরও চলিয়া গেলেন। এদিকে বৈঠক ভঙ্গ হইল। কুমার রামকৃষ্ণের কিন্তু তখন আর কোনও কথাই ভাল লাগিল না। কেবল এক এক বার বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"তবে কি আমার রাজ্য পাপ-পরিপূর্ণ? আমি কি আমার রাজ্য হইতে পাপকে বিতাড়িত করিতে পারিব না?"

* * *

নারদ-নদে বজরা-বক্ষে রামকৃষ্ণ।

## দশম পরিচ্ছেদ।

"ধর্ম্ম রক্ষা কর!"

"ধর্ম্ম অবতার, কি ধর্ম্ম রাখিলে তার।"

—মধুকান।

"কিসে এ রাজ্য হইতে পাপ দূরীভূত হয়? কি করিলে আমি রাজধর্ম্ম পালন করিতে পারি? অত্যাচারীর অত্যাচার-নিবারণে আমি তো কখনও পরাঙ্মুখ নহি! সাধুর সম্মান-রক্ষায়, ধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষায়, আমি তো কখনও অবহেলা করি নাই! তবে আমার রাজ্য কেন পাপ-পরিপূর্ণ?"

সান্ধ্য-সমীরণ সেবনে বহির্গত হইয়া, নারদ-নদের উপর বজরায় বসিয়া, কুমার রামকৃষ্ণ এক মনে একই চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। আজ আর পারিষদবর্গ কাহাকেও সঙ্গে আনেন নাই। আজ একাকী জল-ভ্রমণে আসিয়াছেন। নারদ-নদের মধ্য দিয়া মন্থর গতিতে বজরা চলিয়াছে। বজরার ছাদে বসিয়া, কুমার একমনে ভাবিতেছেন,—"আমি কি ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিব না? আমি কি পাপের দণ্ডবিধানে সমর্থ হইব না?"

সহসা নদীর পরপারে শব্দ উঠিল,—"মহারাজ!—ধর্ম্মরক্ষা করুন! মহারাজ!—ধর্ম্মরক্ষা করুন!"

শব্দ বজ্রধ্বনিবৎ কুমারের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল। কুমার চাহিয়া দেখিলেন—এক যুবাপুরুষ বজরার সঙ্গে সঙ্গে

ছুটিতেছেন, আর তটভূমি প্রকম্পিত করিয়া চীৎকার করিতেছেন —"মহারাজ!—ধর্ম্মরক্ষা করুন! মহারাজ!—ধর্ম্মরক্ষা করুন!"

কুমার বজরাখানিকে তীরে লাগাইতে আদেশ করিলেন। মাঝিরা বজরা তীরে লইয়া গেল। বজরা যতই নিকটস্থ হইতে লাগিল, যুবক চীৎকার করিয়া ততই কুমারের কৃপা-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি হইয়াছে? আপনি কি বলিতেছেন?"

যুবক কহিলেন,—"আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার জাতিধর্ম্ম যাইতে বসিয়াছে। আপনি রাজা, আপনি আমার জাতিধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

রামকৃষ্ণ।—"আপনার নিবাস?"

যুবক।—"আমার নিবাস কোথাও নাই। আজ কয়েক বৎসর হইতে আমি পথে পথে ফিরিতেছি। পূর্ব্বে নিবাস ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা নাই।"

রামকৃষ্ণ।—"কেহ কি আপনার বাস উচ্ছেদ করিয়াছে? কে আপনার প্রতি অত্যাচার করিল?"

যুবক।—"কে করিয়াছে, কি করিয়া বলিব! আমি বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম—আমার বাড়ী-ঘর কোথায় উড়িয়া গিয়াছে; আমার পিতামাতা অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন; আমার একটি স্নেহের ভাই ছিল, সেটাকেও আমি আর দেখিতে পাইলাম না!"

রামকৃষ্ণ।—"আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? কোথা হইতে আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন?"

যুবক।—"সে অনেক কথার কথা। তত কথা শুনিতে গেলে, আপনার ধৈর্য্য থাকিবে না। এখন আমি যাহা প্রার্থনা

জানাইতেছি, সেই প্রার্থনা পূরণ করুন;—আমার জাতিধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

রামকৃষ্ণ।—"আপনার কি হইয়াছে, খুলিয়া বলুন। যদি সাধ্যাতীত না হয়, অবশ্যই আমি আমার সহায়তা করিব।"

যুবক।—"আপনি রাজা, আপনি ধার্ম্মিক। তাই আজ আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমার স্ত্রী আর ভগ্নী—দুই জনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রামের প্রান্তভাগে পুষ্করিণীতে গা ধুইতে গিয়াছিল। দুই জন মুসলমান সৈনিক-পুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি অনেক করিয়া তাহাদের সন্ধান পাইয়াছি। আপনি যদি আমার সহায় হন, তাহাদের উদ্ধার-সাধন হয়, নরপিচাশদ্বয় শাস্তি পাইতে পারে।"

রামকৃষ্ণ।—"কবে এ ঘটনা ঘটিয়াছে? কি করিলে তাঁহাদের উদ্ধার-সাধন সম্ভবপর?"

যুবক।—"মহারাজ! সে অনেক দিনের কথা। আজ কয় বৎসর-কাল ক্রমাগত আমি তাহাদের সন্ধানে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে জঙ্গলে-জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শয়ন নাই, বিশ্রাম নাই—আমি দিবা-নিশি তাহাদেরই সন্ধানে ফিরিতেছি। প্রথমে আমি যেদিন বাড়ী হইতে বহির্গত হই, আমার এক জন সঙ্গী ছিলেন। বৎসরাবধি তিনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক দিন হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি—সঙ্গী আমার সঙ্গে নাই। তিনি কোথায় গেলেন, পাতি পাতি করিয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।"

ছুটিতেছেন, আর তটভূমি প্রকম্পিত করিয়া চীৎকার করিতেছেন —"মহারাজ!—ধর্ম্মরক্ষা করুন! মহারাজ!—ধর্ম্মরক্ষা করুন!"

কুমার বজরাখানিকে তীরে লাগাইতে আদেশ করিলেন। মাঝিরা বজরা তীরে লইয়া গেল। বজরা যতই নিকটস্থ হইতে লাগিল, যুবক চীৎকার করিয়া ততই কুমারের কৃপা-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি হইয়াছে? আপনি কি বলিতেছেন?"

যুবক কহিলেন,—"আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার জাতিধর্ম্ম যাইতে বসিয়াছে। আপনি রাজা, আপনি আমার জাতিধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

রামকৃষ্ণ।—"আপনার নিবাস?"

যুবক।—"আমার নিবাস কোথাও নাই। আজ কয়েক বৎসর হইতে আমি পথে পথে ফিরিতেছি। পূর্ব্বে নিবাস ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা নাই।"

রামকৃষ্ণ।—"কেহ কি আপনার বাস উচ্ছেদ করিয়াছে? কে আপনার প্রতি অত্যাচার করিল?"

যুবক।—"কে করিয়াছে, কি করিয়া বলিব! আমি বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম—আমার বাড়ী-ঘর কোথায় উড়িয়া গিয়াছে; আমার পিতামাতা অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন; আমার একটি স্নেহের ভাই ছিল, সেটীকেও আমি আর দেখিতে পাইলাম না!"

রামকৃষ্ণ।—"আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? কোথা হইতে আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন?"

যুবক।—"সে অনেক কথার কথা। তত কথা শুনিতে গেলে, আপনার ধৈর্য্য থাকিবে না। এখন আমি যাহা প্রার্থনা

জানাইতেছি, সেই প্রার্থনা পূরণ করুন;—আমার জাতিধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

রামকৃষ্ণ।—"আপনার কি হইয়াছে, খুলিয়া বলুন। যদি সাধ্যাতীত না হয়, অবশ্যই আমি আমার সহায়তা করিব।"

যুবক।—"আপনি রাজা, আপনি ধার্ম্মিক। তাই আজ আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমার স্ত্রী আর ভগ্নী—দুই জনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রামের প্রান্তভাগে পুষ্করিণীতে গা ধুইতে গিয়াছিল। দুই জন মুসলমান সৈনিক-পুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি অনেক করিয়া তাহাদের সন্ধান পাইয়াছি। আপনি যদি আমার সহায় হন, তাহাদের উদ্ধার-সাধন হয়, নরপিচাশদ্বয় শাস্তি পাইতে পারে।"

রামকৃষ্ণ।—"কবে এ ঘটনা ঘটিয়াছে? কি করিলে তাঁহাদের উদ্ধার-সাধন সম্ভবপর?"

যুবক।—"মহারাজ! সে অনেক দিনের কথা। আজ কয় বৎসর-কাল ক্রমাগত আমি তাহাদের সন্ধানে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে জঙ্গলে-জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শয়ন নাই, বিশ্রাম নাই—আমি দিবা-নিশি তাহাদেরই সন্ধানে ফিরিতেছি। প্রথমে আমি যেদিন বাড়ী হইতে বহির্গত হই, আমার এক জন সঙ্গী ছিলেন। বৎসরাবধি তিনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক দিন হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি—সঙ্গী আমার সঙ্গে নাই। তিনি কোথায় গেলেন, পাতি পাতি করিয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।"

মহারাজ বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"এখন আমায় কি করিতে হইবে, বলুন।"

যুবক।—"আমার স্ত্রীকে ও ভগ্নীকে উদ্ধার করিতে হইবে। পাপীর দণ্ড-বিধান করিতে হইবে। আর, ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে হইবে।"

রামকৃষ্ণ।—"আপনার স্ত্রী ও ভগ্নী এখন কোথায়? আপনি কোনও সন্ধান পাইয়াছেন কি?"

যুবক।—"কয় বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া, আজ তিন দিন হইল, আমি তাহাদের সংবাদ পাইয়াছি। আহা!—তাহারা এখন কি যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছে! মহারাজ!—নর-রাক্ষস মুসলমান-সৈনিক-পুরুষদ্বয় আমার স্ত্রীকে ও ভগ্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আবদ্ধ রাখিয়াছে, ভীষণ-ভাবে পীড়ন করিতেছে। মহারাজ!—সংবাদ পাইলাম, তাহারা যবন-কারাগারে অনাহারে অবস্থিতি করিতেছে। সময় সময় দুরন্তগণ তাহাদিগকে পীড়ন করিতেছে, কত প্রকার ভয় দেখাইতেছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন-জলে তাহাদের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। মহারাজ!—আর সহ্য হয় না! আপনি চলুন,—তাহাদের উদ্ধার-সাধন করুন। এখনও তাহারা মুর্শিদাবাদেই অবস্থান করিতেছে। আমি শুনিতে পাইলাম, আগামী মঙ্গলবার তাহাদিগকে কলিকাতায় হেষ্টিংস সাহেবের নিকট উপঢৌকন-স্বরূপ পাঠান হইবে।"

মহারাজ উত্তর দিলেন,—"নবাবকে এ বিষয় জানান হয় নাই কেন? নবাবের রাজত্বে, কোম্পানীর শাসনাধীন প্রদেশে, আমি কি করিতে পারিব?"

যুবক।—"আপনি কি করিতে পারেন? আপনি যে

সতী-শিরোমণি পুণ্যময়ী মহারাণী ভবানীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন! আপনার চক্ষের সমক্ষে দুইটী সতী-রমণীর সতী-ধর্ম্ম নষ্ট হইবে;—আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না? তবে কে পারিবে মহারাজ?—কাহার নিকট যাইব? আমি অনেক দূর হইতে আপনার নাম শুনিয়া আসিয়াছি। আপনি রক্ষা না করিলে, কে আর রক্ষা করিবে? মহারাজ!—ধর্ম্ম যায়, মান যায়, প্রাণ যায়—রক্ষা করুন। হিন্দুর ধর্ম্ম—হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"

যুবকের বাক্যে মহারাজের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। মহারাজ কহিলেন, আপনি আমার বজরায় আসুন। আপনার বক্তব্য বিস্তারিত অবগত হইয়া পরামর্শ করিয়া আমি কর্ত্তব্য স্থির করিব। আপনি স্থির হউন। আমার সাধ্য-মতে চেষ্টার ক্রটি হইবে না।"

যুবক কহিলেন,—"মহারাজ! বিলম্ব হইলে আর তাহা-দিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

মহারাজ উত্তর দিলেন,—"যাহাতে অবিলম্বে কার্য্যোদ্ধার হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা হইবে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

যুবক বজরায় উঠিলেন। বজরার নাবিকগণ আশ্চার্য্যান্বিত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল—'কে এ যুবক!' রুক্ষ-কেশ, মলিন-বসন, অস্থির-দৃষ্টি, চিন্তাপরিক্লিষ্ট বদন-মণ্ডল,—'কে এ যুবক!' আকৃতি ভদ্র-সন্তানের ন্যায়, কিন্তু বেশ-ভূষা বিমলিন; যুবক এক-বস্ত্র পরিহিত; সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধুসরিত; মস্তকের কেশ দিয়া ধূলা উড়িতেছে;—'কে এ যুবক!' সেই মলিনবেশধারী যুবককে মহারাজ আদর করিয়া আপনার বজরায় উঠাইয়া

লইলেন। বজরা পাইল-ভরে রাজধানী-অভিমুখে চলিতে লাগিল। 'বজরার ক্ষিপ্র-গতিতে জল-মধ্যে' যে কল-কল্লোল উঠিল, তাহাতেও যেন প্রশ্ন হইল,—'কে এ যুবক!'

বজরায় উঠিয়া, যুবক মর্ম্মভেদী স্বরে আপন কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে, এক এক বার তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। বলিতে বলিতে, এক এক বার অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বলিতে বলিতে, এক এক বার তাঁহার বাক্যে কুমারের হৃদয় উদ্দীপনায় নাচিয়া উঠিল। কুমার যতই সে কাহিনী শুনিতে লাগিলেন, ততই ক্ষোভে রোষে বিচলিত হইলেন; তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"যেমন করিয়াই হউক, ব্রাহ্মণকন্যাদ্বয়ের উদ্ধার-সাধন ও পাপীর দণ্ড-বিধান করিতে হইবে।"

* * *

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রান্ত-পথে।

"Out of breath to no purpose, and very busy about nothing."

—*Addison.*

যুবককে সঙ্গে লইয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমেই রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পরামর্শ চলিল। আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় শুনিয়া, সকল ঘটনাই অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল; সুতরাং রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর কথাটা একেবারেই উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইলেন। এত কাল পরে যুবতীদ্বয়ের সন্ধান পাইলেও, তাহাদের উদ্ধার-সাধন—অসম্ভব বলিয়া তাঁহার মনে হইল। যদি তাহারা মুসলমানের হস্তেই পড়িয়া থাকে, এত দিন তাহাদের ধর্ম্ম-রক্ষা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং তিনি কুমারকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যুবকের কাতরোক্তিতে কুমারের প্রাণ এতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কথা কহিতে সাহসী হইলেন। তিনি বিনীত-স্বরে ঠাকুর মহাশয়কে কার্য্যের গুরুত্বের বিষয় বুঝাইবার জন্য চেষ্টা পাইলেন।

কোনও বিষয়ে কুমারের এতাদৃশ আগ্রহ,—ইতিপূর্ব্বে

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর আর কখনও দেখেন নাই। সুতরাং কুমার পাছে ক্ষুণ্ণ হন—এইজন্য, নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্বেও, তিনি কুমারের অভিপ্রায়ে সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন। তবে প্রথমে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন,—সে কার্য্যের জন্য কুমারের নিজের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই; নবাবের নিকট লোক পাঠাইয়া, অথবা আবশ্যক বুঝিলে তিনি স্বয়ং মুর্শিদাবাদ গমন করিয়া, যুবতীদ্বয়ের বিষয় তত্ত্ব লইবেন। কিন্তু কুমারের মন তাহাতে শান্ত হইল না। কুমার কহিলেন,—"যুবক যে কথা বলিতেছে, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। ফল হউক বা না হউক, কর্ত্তব্য-বোধে এ বিষয়ে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যক। আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনি অনুমতি দেন, আমি কল্য প্রভাতেই মুর্শিদাবাদ গমন করি। সেখানে বড়নগরের বাটীতে মা আছেন, আপনার পিতৃদেব পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয় আছেন; তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে পারিব। আমার প্রার্থনা, এ শুভসঙ্কল্পে আপনি আমার সহায় হউন।"

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর মনে মনে ভাবিলেন,—"এ সময়ে হঠাৎ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ, প্রকৃত তথ্য না জানিয়া, এক জন অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের বাক্যে নির্ভর করিয়া, নাটোরাধিপতির কি কোন বিষয়ে নবাব-সরকারে দরবার করিতে যাওয়া সমীচীন?" রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর প্রকাশ্যে কহিলেন,—"ভাল, যদি তুমি নিতান্তই যাওয়ার আবশ্যক অনুভব কর, শুভদিন শুভলগ্ন দেখিয়া যাত্রা করা বিধেয়। আমি জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতকে ডাকাইয়া এখনই দিন-লগ্ন স্থির করিতেছি। এ যাত্রায় শুভদিন শুভলগ্ন বিশেষ প্রয়োজন।"

কুমার সে কথায় আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। রুদ্র-নারায়ণ ঠাকুর, জ্যোতির্ব্বিদ ডাকাইয়া, দিন-লগ্ন স্থির করিবার উদ্দেশ্যে ব্যস্ত-ভাব প্রকাশ করিলেন। কুমার আশ্বস্ত হইয়া প্রাসাদাভিমুখে রওনা হইলেন। যেরূপ দিন-লগ্ন ধার্য্য হয়, রাত্রিতেই কুমারকে তাহা জানান হইবে—স্থির হইল। রুদ্র-নারায়ণ ঠাকুর, এক দিকে জ্যোতির্ব্বিদকে ডাকাইয়া চারি দিন পরে যাত্রার দিন নির্দ্দেশ করিয়া লইলেন;—অন্য দিকে গোপনে গোপনে দুই জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে মুর্শিদাবাদ পাঠাইয়া, তাঁহাদের দ্বারা যুবতীদ্বয়ের নিগূঢ় সন্ধান লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিলেন। সে কয় দিন নাটোর-রাজধানীতেই যুবকের অবস্থানের ব্যবস্থা হইল।

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কুমার যখন প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, সেই সময় পুনরায় কালীশঙ্করের সহিত কুমারের সাক্ষাৎ হইল। কালীশঙ্কর অনেক ক্ষণ হইতে কুমারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু কুমারকে সে ভাব বুঝিতে দিলেন না। কাদিহাটী ও ভূষণা পরগণার বন্দোবস্ত-বিষয়ে প্রভাতে কুমারের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সেই পরামর্শ ধার্য্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; অথচ, তদ্বিষয়ে তিনি যে নিঃস্বার্থ—তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে কথা প্রথমে কিছুই উত্থাপন করিলেন না।

কালীশঙ্করকে দেখিয়াই কুমারের কিন্তু সে কথা মনে পড়িল। দেওয়ানজীর দপ্তরে সন্ধান লইয়াও ঐ দুই পরগণার বিশৃঙ্খলার বিষয় কুমার এখন জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং আপনা হইতে কালীশঙ্করকে ডাকিয়া লইয়া পরামর্শের জন্য

প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পুনরায় অনেক ক্ষণ ধরিয়া তদ্বিষয়ে পরামর্শ চলিল। কুমার বুঝিলেন,—পরগণাদ্বয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে এক জন বিশ্বস্ত উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে সেখানে পাঠান একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কুমার ভাবিয়া ভাবিয়া সেরূপ কোনও কর্ম্মচারী খুঁজিয়া পাইলেন না। রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন; কালীশঙ্করেরও সে বিষয়ে আপত্তি ছিল। যাহা হউক, কুমার এক্ষণে কালীশঙ্করকে কহিলেন,—"আমি তো ভাই, তেমন বিশ্বস্ত লোক খুঁজিয়া পাইতেছি না। ঠাকুর মহাশয়কে না জানাইয়া এ বিষয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করা,—আমার তো অসাধ্য বলিয়া মনে হইতেছে।" কালীশঙ্কর কহিলেন,—"অসাধ্য বলিয়া মনে হওয়ার কি কারণ দেখিতেছেন? লোকের অভাবই বা কেন মনে করিতেছেন? এই যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অধম—এ অধমও এ বিষয়ে আপনার আদেশ-পালনে অসমর্থ নহে।"

কুমারেরও তাহাই মনে হইতেছিল। তিনি এক এক বার সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। কালীশঙ্করের উত্তর শুনিয়া, কুমারের উৎসাহ হইল। কুমার কহিলেন,—"তুমি যদি যাও ভাই, তাহার অধিক আমার ভরসার কথা আর কি হইতে পারে? তবে ঠাকুর-মহাশয়কে আমি এ বিষয় জানাইলে হানি আছে কি?"

কালীশঙ্কর।—"আমার মতে, এখন তাঁহাকে কোনও কথা না জানানই শ্রেয়ঃ। যদি কিছু কাজ করিয়া আসিতে পারি, তখন জানাইলেই চলিবে। এখন মাত্র দেওয়ানজীকে জানাইয়াই আপনি আমাকে পাঠাইয়া দেন। আগে কাজ, পরে অন্য কথা।"

কুমার প্রথমে মনে মনে কি একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেন। পরিশেষে কহিলেন,—"ভাল, তাহাই হইবে। কালই তোমার রওনা করিবার ব্যবস্থা করিব।"

বলিলেন বটে, কিন্তু বলিবা-মাত্রই মনটা আবার যেন কেমন-কেমন করিয়া উঠিল। ঠাকুর মহাশয় বিপদে-আপদে সকল বিষয়েই কর্ত্তৃস্থানীয়। নাটোর-রাজ্যের তিনিই এখন কর্ণধার। তাঁহাকে না জানাইয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, কালীশঙ্করকে বিষয়-কর্ম্মের তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করা,—সঙ্গত হইল কি? এক একবার কুমারের প্রাণের ভিতর এইরূপ সংশয়-প্রশ্ন উপস্থিত হইল। কিন্তু সে সংশয় অধিক ক্ষণ মনোমধ্যে স্থান পাইল না। কুমার আপন মনেই সে সংশয়ের মীমাংসা করিয়া লইলেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া আপনা-আপনিই কহিলেন,—"যখন কালীশঙ্করকে পাঠাইব বলিয়া স্থির করিয়াছি, তখন আর অন্য ভাবনায় কাজ কি? এখন ঠাকুর মহাশয়কে যদি জানাইতে যাই, জানাইতে গেলে তিনি যদি আপত্তি করেন, আমার কথার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে। সুতরাং যেরূপ পরামর্শ হইয়াছে, গোপনে গোপনে সেইমত কার্য্য করাই এখন শ্রেয়ঃ।"

সেই পরামর্শই ধার্য্য হইল। কালীশঙ্কর প্রথমে কাদিহাটী পরগণায় রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কালীশঙ্করকে বিদায় দিয়া কুমার অন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইবেন,—এমন সময়ে রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের নিকট হইতে মুর্শিদাবাদ-যাত্রার দিন-স্থির সম্বন্ধে সংবাদ আসিল। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত দিন-স্থির করিয়া দিয়াছেন, মঙ্গলবার দ্বি-প্রহরে শুভলগ্নে যাত্রা করা বিধেয়। তিনি আরও জানাইয়া পাঠাইয়াছেন,—'সেই

রাত্রেই তিনি মুর্শিদাবাদে এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিবেন। কর্ম্মচারী সেখানে গিয়া পূর্ব্ব হইতে সন্ধানাদি লইতে থাকিবে। আবশ্যক হইলে, তাঁহার পিতৃদেব চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ও তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবেন।'

এখনও চারি দিন অপেক্ষা করিতে হইবে! কুমার ভাবিলেন,—"যুবক যাহা বলিয়াছে,—তাহা যদি সত্য হয়, আমরা মুর্শিদাবাদে গিয়া যুবতীদ্বয়ের হয় তো কোনও সন্ধান পাইব না!" কিন্তু আবার ইহাও ভাবিলেন—"অদিনে অশুভক্ষণেই বা কি করিয়া যাত্রা করিতে পারি! সুতরাং এ বিষয়ে ঠাকুর মহাশয় যাহা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার অন্যথা-সাধন কর্ত্তব্য নহে। তবে আমরা মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যুবতীদ্বয়কে যেন কলিকাতায় পাঠান না হয়, সেইরূপ কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারা যায় না কি? ঠাকুর মহাশয় যখন তাঁহার পিতৃদেবকে জানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তখন সে ব্যবস্থা নিশ্চয় হইবে। তবে সেই কথাটা তাঁহাকে আর এক বার না হয় ভাল করিয়া স্মরণ করাইয়া আসি।"

কুমারের তখন আর অন্দরে প্রবেশ করা হইল না। কুমার পুনরায় রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

* * *

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### সঙ্কল্প-সাধনে।

"————On, ye brave,

Who rush to glory, or the grave!"

——*Champbell.*

চিন্তার উদ্দাম তরঙ্গে কুমারের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। আজি আর সংসারের কোনও সামগ্রীই কুমারের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। এমন যে সুন্দরী,—যে সুন্দরীকে দেখিলে কুমার তন্ময় হইয়া যান,—পৃথিবীর সর্ব্বস্ব বিস্মৃত হন,—সে সুন্দরীও আজি তাঁহার চঞ্চল-চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ নহেন।

কুমার আজ কেন অন্যমনা? সুন্দরী নিকটে আছেন, সুন্দরীর বীণা-কণ্ঠে বীণা-ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতেছে;—তবু কেন কুমার চঞ্চল-চিত্ত?

অনেক ক্ষণ—অনেক ক্ষণ লক্ষ্য করিয়া, সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রাণেশ্বর! আজ কেন আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি।" সুন্দরীর মনে হইল,—সুন্দরী বুঝি কোনও অপরাধ করিয়াছেন! সুন্দরীর মনে হইল—সুন্দরীর সেবায় বুঝি কোনও ত্রুটি হইয়াছে! সুন্দরী তাই সঙ্কুচিতা হইয়া কহিলেন,—"নাথ! দাসী কি চরণে কোনও অপরাধ করিয়াছে!"

কুমার অন্যমনা ছিলেন। প্রথম প্রশ্ন কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ

করিয়াও হৃদয়ে প্রতিঘাত করিতে পারে নাই। কিন্তু সুন্দরী যখন দ্বিতীয় বার কহিলেন,—"নাথ! দাসী কি চরণে কোনও অপরাধ করিয়াছে?"—সে প্রশ্ন কুমারের হৃদয়ে বিষম ব্যথা প্রদান করিল। কুমার ব্যথিত-স্বরে কহিলেন,—"সুন্দরি! কেন এমন কথা কহিলে! আমি যে তোমা-গত প্রাণ!"

সুন্দরীর আবার মনে হইল—সুন্দরী ওরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছেন। সুন্দরী তাই বিনীত-স্বরে উত্তর দিলেন,—"নাথ! অপরাধ হইয়াছে। আপনাকে বিষণ্ণমনা দেখিয়াই ওরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেন—কেন আজ আপনি এত বিষণ্ণ আছেন?"

কুমার উদ্বেগভরে কহিলেন,—"সুন্দরি! কি আর বলিব? কি আর উত্তর দিব? তোমায় ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাই—"

কুমারের কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইল। সুন্দরীর মনে হইতে লাগিল,—"ইহা অপেক্ষা সুন্দরীর মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হইল না!" সুন্দরী ব্যাকুল হইয়া কহিলেন,—"আমায় ছাড়িয়া যাইবেন! কোথায় যাইবেন? আমি প্রাণ থাকিতে যাইতে দিব না।" সুন্দরী আপন কমল-করে কুমারের চরণযুগল চাপিয়া ধরিলেন।

কুমার বাষ্পাকুল কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"সুন্দরি! আমি কি সাধ করিয়া তোমায় ছাড়িয়া যাইতে চাই? দারুণ সঙ্কটে পড়িয়াছি; উপায় নাই; তাই—"

"দারুণ সঙ্কট!"—সুন্দরীর কর্ণে আবার নূতন শেল বিদ্ধ হইল। সুন্দরীর শরীর কাঁপিতে লাগিল। সুন্দরী কম্পান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সঙ্কটের কথা কি বলিতেছেন?

আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! অভাগিনীর মন্দভাগ্য, তাই কি অভাগিনীর জন্য কোনও নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল? এমন কি সঙ্কট—যে তজ্জন্য আমায় ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিতেছেন! তবে কি আমার মরণ হইলে, আপনার সে সঙ্কট দূর হইতে পারে?"

সুন্দরী বড়ই উতলা হইয়াছেন দেখিয়া, কুমার প্রবোধ-বাক্যে কহিলেন,—"সুন্দরি! কি কথায় তুমি এ কি ভাব উপলব্ধি করিলে! তুমি কেন উতলা হইতেছ? তোমার, কি দোষ! তুমি কেন অনর্থক বৃথা অনুশোচনায় মনকে ব্যথিত করিতেছ?"

সুন্দরী।—"তবে কেন আমায় ছাড়িয়া যাইবেন বলিতেছেন? এমন কি সঙ্কট উপস্থিত যে, আমায় না ছাড়িলে সে সঙ্কটে উদ্ধারের আশা নাই?"

কুমার।—"একটী গুরুতর কার্য্যের জন্য দিন-কয়েক আমায় স্থানান্তরে যাইতে হইবে। সে কয় দিন তোমায় দেখিতে পাইব না। তাই বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি,—কেমন করিয়া তোমায় ছাড়িয়া থাকিব—সুন্দরি!"

সুন্দরী আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় যাইবেন? কি জন্য যাইবেন? দাসী কি জানিবার অধিকারী নয়!"

কুমার।—"আমার প্রাণের প্রাণ—আমার হৃদয়ের হৃদয়! আমার কোন্ কথা তোমার নিকট অব্যক্ত আছে—সুন্দরি? তোমায় না জানাইয়া আমি কোনও কাজ করি কি? তোমায় জানাইব বলিয়াই—তোমার সহিত পরামর্শ করিব বলিয়াই—আমি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি।"

সুন্দরী।—"তবে বলিতে এত সঙ্কোচ-বোধ করিতেছেন কেন?—হৃদয় এত উদ্বেলিত কেন?"

কুমার।—"হৃদয় এত উদ্বেলিত কেন—সে কি ভাষায় বুঝান যায়—সুন্দরি? মনে পড়ে কি সুন্দরি!—তোমায় আমায় যেদিন শুভমিলন হয়,—সেই চারি চক্ষের শুভ-মিলন! মনে পড়ে কি সুন্দরি!—সেইশুভ দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রাণ-বিনিময়,—একের প্রাণে অন্যের বিলয়! তার পর, আরও মনে পড়ে কি সুন্দরি!—বিবাহের পর এই কয়েক বৎসর কাল কেমন একই-ভাবে একই-প্রাণে চকোর-চকোরীর মত দুটীতে দুটীর মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটাইয়া আসিয়াছি! এখন সহসা—সেই মিলনে বিচ্ছেদ ঘটিবে!—দুই দিনের জন্য হউক, দুই মুহূর্ত্তের জন্য হউক,—সেই মিলন ভঙ্গ হইবে! এ কি স্মরণ করিতেও প্রাণ বিদীর্ণ হয় না—সুন্দরি! তবু তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ—প্রাণ উদ্বেলিত কেন?"

সুন্দরী।—"তবে কেন এ মিলন ছিন্ন করিতে চান? তবে কেন আমায় ছাড়িয়া যাইবেন বলিতেছেন? আমি আপনাকে যাইতে দিব না—আমি আপনাকে ছাড়িব না।"

সুন্দরী পতির চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিলেন। করুণকণ্ঠে কহিলেন—"আমায় ছাড়িয়া আপনি কোথায় যাইবেন? আমি আপনাকে কোথাও যাইতে দিব না।"

কুমার কহিলেন,—"সুন্দরী! আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমায় ছাড়িয়া যাইতে চাই? কর্ত্তব্য—আমার কর্ত্তব্য—আমায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। ধর্ম্ম—আমার ধর্ম্ম—আমায় যাইবার জন্য অহ্বান করিতেছেন।"

সুন্দরী।—"আপনি এ কি বলিতেছেন? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! আপনার কর্ত্তব্য-পথে, আপনার ধর্ম্ম-পালনে, দাসী—সহধর্ম্মিণী ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইবার অধিকারিণী নহে কি? তবে আপনি আমায় ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া ভাবিতেছেন কেন? আপনি যেখানেই যাউন, যেখানেই থাকুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব।"

কুমার।—"সঙ্গে রাখিবার সুবিধা বুঝিলে, সে সুবিধা আমি কি কখনও পরিত্যাগ করিতাম? তোমায় ছাড়িয়া এক দণ্ড থাকিতে হইলে, আমার প্রাণ মুহ্যমান হয়! সেই তোমায়, কত দিন ছাড়িয়া থাকিতে হইবে—কিছুই স্থির নাই! ভাবিতেও হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসে! কিন্তু কর্ত্তব্য-সাধন—স্বধর্ম্ম-পালন—উপায় নাই!"

সুন্দরী।—"কর্ত্তব্য-পালনে স্বধর্ম্ম-সাধনে সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে! এমন কি কর্ত্তব্য—এমন কি স্বধর্ম্ম, দাসী জানিতে পারে না কি? নাথ!—প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে; যদি বাধা না থাকে, আমায় সকল বিষয় বুঝাইয়া বলুন।"

কুমার।—"সুন্দরি!—বুঝাইবার কিছুই নাই। তুমি যদি একবার শোন—কি জন্য আমি কোথায় যাইতে চাই, নিশ্চয় বলিতে পারি, তোমার হৃদয়েও উদ্দীপনার অনল-প্রবাহ প্রবাহিত হইবে। তুমি হিন্দু-নারী; সতীর মাহাত্ম্য তোমার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। তুমি রাজার মহিষী; রাজার রাজ-ধর্ম্মও তুমি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছ। ভাল, তোমাকেই জিজ্ঞসা করি, তুমিই উত্তর দেও দেখি—এ ক্ষেত্রে আমার কি কর্ত্তব্য?—এ ক্ষেত্রে আমার কি ধর্ম্ম? দুইটী

হিন্দু-মহিলা—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ ও দুহিতা—দুই জন মুসলমান সৈনিক-পুরুষের চক্রান্তে কারাগারে আবদ্ধ! পাষণ্ড সৈনিক-পুরুষদ্বয় সেই দুই ব্রাহ্মণ-মহিলার অমূল্য সতীত্ব-রত্ন অপহরণ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত! যদি আর দুই দিন বিলম্ব হয়, না-জানি অভাগিনীদের কি সর্ব্বনাশই সাধিত হইবে! আমি রাজা,—আমার নিকট এই সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে! এখন আমি কি করিব? এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য কি? সুন্দরি!—তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি—বল. আমার কর্ত্তব্য কি?"

সুন্দরী সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"কর্ত্তব্য? মহারাজ!—জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কর্ত্তব্য কি? এ কর্ত্তব্য কি আর বলিয়া দিতে হয়? কর্ত্তব্য—প্রাণ পণ করিয়া সতী রমণীর উদ্ধার-সাধন!"

সুন্দরি! সুন্দরি! তুমি কি ,সেই সুন্দরী? তুমি নয় কমনীয়তায় নবনীত-সমা! তুমি নয় স্নিগ্ধ-শান্ত জ্যোৎস্নালোক! তুমি নয় মর্ত্ত্যে মন্দাকিনীর স্নেহধারা! তোমার এ কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন? সেই তুমি—তুমি এমন বজ্রের ন্যায় কঠোর! সেই তুমি—তুমি এমন মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় দীপ্তরাগ! সেই তুমি—তুমি এমন আগ্নেয়-গিরির অনল-প্রবাহ! বড় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

কুমার চাহিয়া দেখিলেন—সুন্দরীর নয়নদ্বয় যেন ধক্‌ধক্ জ্বলিতেছে! কুমার চাহিয়া দেখিলেন—সুন্দরীর মুখমণ্ডল রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। কুমার চাহিয়া দেখিলেন—ভুবন-মোহিনী যেন খর্পরধারিণী সংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

কুমারের হৃদয়ে উদ্দীপনার অগ্নি-সঞ্চার হইল। সুন্দরীর উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে কুমার বলিয়া উঠিলেন,—"সুন্দরি! তুমি

সত্য বলিয়াছ ! সতী রমণীদ্বয়ের উদ্ধার-সাধনে আমার প্রাণ-পণ চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।"

সতী রমণীদ্বয়ের উদ্ধার-সাধনে পতি প্রাণপণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীও কহিলেন,—"আপনার শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ হউক। আমি ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।"

ক্ষণপরে সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ-কন্যারা কোথায় আবদ্ধ আছেন? তাঁহাদের উদ্ধার-সাধনের জন্য আপনার নিজের যাওয়ার কি প্রয়োজন?"

কুমার।—"তাঁহারা আছেন—মুর্শিদাবাদে—নবাবের কারা-গারে। জোর-জবরদস্তি করিয়া তাঁহাদের উদ্ধার-সাধন সম্ভবপর নহে। আমি নিজে গিয়া যদি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করি, আমার অনুরোধে নবাব তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন। তাই আমি মুর্শিদাবাদ যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।"

সুন্দরী।—"নবাব যদি আপনার কথা গ্রাহ্য না করেন!—আপনার অনুরোধে ব্রাহ্মণ-কন্যাদ্বয়কে যদি ছাড়িয়া না দেন!"

কুমার।—"ভগবান যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহাই ঘটিবে। ঈশ্বর না করুন, যদি তেমনই হয়, নবাবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে।"

সুন্দরীর প্রাণটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। সুন্দরী কহিলেন,—"নবাবের সহিত বিরোধ করিবেন?"

কুমার।—"নহিলে আর উপায় কি আছে!"

সুন্দরী।—"নবাবের সহিত বিরোধের কথায় প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠে।"

কুমার।—"এখন আর সুন্দরি!—নবাবের সে ক্ষমতা নাই। কোম্পানীর নিকট নবাবের হাত-পা বাঁধা। নবাব যদি আমার অনুরোধে কর্ণপাত না করেন, আমি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের সহায়তা-গ্রহণ-পক্ষে চেষ্টা পাইব?"

সুন্দরী।—"সে কি রকম?"

কুমার।—"আমি সংবাদ পাইয়াছি, নবাব সেই যুবতীদ্বয়কে কলিকাতায় পাঠাইবেন। হেষ্টিংস সাহেব এখন কোম্পানীর কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন। নবাব যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, আমি হেষ্টিংস সাহেবের নিকট গিয়া প্রার্থনা জানাইব। তাহাতেও যদি ফল না হয়,—"

সুন্দরী।—"কি করিবেন?"

কুমার।—"শেষ সম্বল—বল-প্রয়োগ! বল-প্রয়োগে ব্রাহ্মণ-মহিলাদ্বয়ের উদ্ধার-সাধন করিব।"

সুন্দরী।—"নবাবের সঙ্গে বিরোধ! কোম্পানীর সঙ্গে বিরোধ! কি হবে নাথ!"

সুন্দরী ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িলেন।

কুমার কহিলেন,—"অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।"

কুমার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সুন্দরীর মনে হইল—"একবার বলি, না—বিরোধে প্রয়োজন নাই। যদি সহজে কার্য্যোদ্ধার হয়, হউক; না হয়, প্রতিনিবৃত্ত হউন।" কিন্তু বলি-বলি করিয়াও মন সঙ্কুচিত হইল। ব্রাহ্মণ-মহিলাদ্বয়ের ধর্ম্মরক্ষা অপেক্ষা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অধিক আর কি হইতে পারে?—পরক্ষণেই এই কথা

মনে হইল। সুতরাং সুন্দরী আর কোনও আপত্তি করিতে পারিলেন না।

কুমার হতাশ-ব্যঞ্জক-স্বরে কহিলেন,—"যায় যাবে, সব যাবে। ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে হইবে।" এই বলিয়া কুমার, সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন সুন্দরি!—তুমি কি বল? এ বিষয়ে তোমার তো আর কোনও দ্বিধা নাই?"

সুন্দরী।—"এ বিষয়ে—এ সঙ্কল্পে আমার কি আর দ্বিধা থাকিতে পারে! হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দু রক্ষা না করিলে, কে রক্ষা করিবে? ব্রাহ্মণ-মহিলার ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলেও পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

এই বলিয়া সুন্দরী কহিলেন,—"তবে আমার একটী প্রার্থনা যদি রক্ষা করেন! প্রার্থনা,—আপনি আমায় যদি মুর্শিদাবাদে সঙ্গে লইয়া যান!"

কুমার।—"সুন্দরি! তুমি কি পাগল হইয়াছ? তোমায় কোথায় লইয়া যাইব! শুধু মুর্শিদাবাদ হইলেও তোমায় বড়নগরের প্রাসাদে রাখিতে পারিতাম। কিন্তু কখন কোথায় থাকিব, তাহার তো ঠিক নাই! কখনও মুসলমানের শিবিরে, কখনও হয় তো ইংরেজের দরবারে,—আমায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। সে অবস্থায়, তোমায় কি সঙ্গে রাখা সম্ভবপর?"

সুন্দরী বাষ্পাকুল কণ্ঠে কহিলেন,—"নাথ! আপনাকে ছাড়িয়া যে আমি এক দণ্ড থাকিতে পারি না! আপনাকে এক দণ্ড না দেখিলে আমি যে চারিদিক অন্ধকার দেখি!"

কুমার বাহুপাশে সুন্দরীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিলেন,

—"তুমি কি বলিতেছ—সুন্দরি! তোমায় একদণ্ড না দেখিলে, আমার নিকট জগৎ শূন্যময় বোধ হয়।"

উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। সুন্দরী মনে মনে কহিলেন,—"বিধাতা! কেন এ বিপদে ফেলিলে? আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে, আমায় এই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে?"

কুমারের হৃদয়েও যেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি উঠিল। কুমারও মনে মনে কহিলেন,—"জানি-না, বিধাতা কেন এই ভীষণ পরীক্ষা-পারাবারে আমায় নিক্ষেপ করিলেন!"

সেই ভাবে—সেই চিন্তায়—সে রাত্রি অতিবাহিত হইল। কখনও হতাশার গভীর আঁধারে যুগপৎ উভয়ের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। কখনও বা কর্ত্তব্য-পালন স্বধর্ম্ম-সাধন-জনিত আত্মপ্রসাদের ভাবী আলোকে হৃদয় পুলক-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুই জনে দুই জনের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। রাত্রি কি ভাবে কাটিয়া গেল, কেহই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

* * *

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### ঘটনা-স্রোত।

"Man proposes, God disposes."

—*Proverb.*

কুমার রামকৃষ্ণ আজি মু[illegible] যাত্রা করিবেন। সারি সারি বজরা ও নৌকা সজ্জিত হইয়াছে। বজরার ও নৌকার উপর ভারে ভারে দ্রব্যজাত রক্ষিত হইতেছে। সঙ্গে যাইবার জন্য বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী ও প্রহরিগণ প্রস্তুত রহিয়াছে।

মহারাজের খাস বজরায় নিশান উড়িয়াছে। বজরার অগ্রে ও পশ্চাতে নৌকার উপর মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে। বজরার চারি পার্শ্বে রক্ষিপোতসমূহ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এদিকে, শোভাযত্রার শোভা-সন্দর্শনের নিমিত্ত, পরিখার পরপারে লোকারণ্য হইয়াছে।

শুভক্ষণে শুভমুহূর্ত্তে কুমার অন্দর হইতে যাত্রা করিলেন। শুভক্ষণে শুভমুহূর্ত্তে বিদায়াশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া সুন্দরীর প্রেমপাশ ছিন্ন করিলেন। শুভক্ষণে শুভমুহূর্ত্তে কুমার জয়কালীর মন্দিরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। শুভক্ষণে শুভমুহূর্ত্তে মায়ের নির্ম্মাল্যপুষ্প বিল্বপত্র প্রভৃতি উত্তরীয়-অঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন। শুভক্ষণে শুভমুহূর্ত্তে দেবীর খড়্গ হইতে সিন্দুর-বিন্দু গ্রহণ করিয়া ললাটে লেপন করিলেন। শুভক্ষণে শুভমুহূর্ত্তে উদ্দেশে মা-ভবানীর চরণে প্রণিপাত জানাইলেন।

শুভক্ষণে শুভমুহূর্ত্তে শুভযাত্রা করিয়া বজরার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ইতিমধ্যে শশব্যস্তে রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কুমার ব্যস্ত-সমস্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত-পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

কুমারকে মুর্শিদাবাদ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত দেখিয়া, রুদ্র-নারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"কুমার! এইমাত্র মুর্শিদাবাদ হইতে আমার প্রেরিত কর্ম্মচারী প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। আমার পিতৃদেব পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্র পাঠ করিলেই সকল বিষয় জানিতে পারিবে। চল, বজরার উপর বসিয়া পত্র দেখাইতেছি।"

এই বলিয়া, কুমারকে সঙ্গে লইয়া, রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর বজরায় আরোহণ করিলেন। বজরায় উভয়ের উপযুক্তরূপ বসিবার আসন সজ্জিত ছিল। দুই জনে সেই আসনে উপবেশন করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

* * *

এদিকে, কুমার বিদায় গ্রহণ করিলে, সুন্দরী বিষণ্ণ-মনে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলই শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। হৃদয় শূন্য,—শয়ন-গৃহ শূন্য, সেই জনকোলাহলপূর্ণ রাজসংসার শূন্য,—এমন কি সমগ্র জগৎ-সংসারই সুন্দরীর নিকট শূন্য বলিয়া প্রতীত হইল।

কিছুই ভাল লাগিল না। এমন যে সহচরী—বাল্যের ক্রীড়া-সঙ্গিনী সহচরী—শোকে-তাপে সান্ত্বনাদায়িনী সহচরী—সেই সহচরীকেও আজ আর তাঁহার ভাল লাগিল না। পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে আসিবার সময়, সুন্দরীর বাল্য-সঙ্গিনী সহচরী

তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। শ্বশুরালয়ে গিয়া মন পাছে অস্থির হয়—সেই জন্য সুন্দরীর পিতামাতা সহচরীকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সহচরীও আজি তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর করিতে পারিতেছে না।

সুন্দরীর কত আদরের কাকাতুয়া পাখীটী আজিও কুমারের ন্যায় মধুমাখা-স্বরে "সুন্দরি! সুন্দরি!" বলিয়া ডাকিতেছে; সেই পাখীর সেই যে স্বরে সুন্দরী উন্মাদিনী হইয়া উঠিত, সেই পাখীর সেই স্বর আজি যেন সুন্দরীর কর্ণে বিষ-বাণ বিদ্ধ করিতেছে। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে সুদীর্ঘ একখানি দর্পণ—কক্ষ-প্রাচীরের ঊর্দ্ধদেশ হইতে কক্ষতল পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল। "সুন্দরি! সুন্দরি!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, কুমার যখন প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে পদার্পণ করিতেন;—পাখীও সেই স্বরে সুন্দরীকে আহ্বান করিত;—সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর-বিলম্বিত দর্পণে কুমারের মোহন ছবি প্রতিফলিত হইত।

কিন্তু আজি কাকাতুয়ার স্বরে বিচলিত হইয়া সুন্দরী যখন দর্পণে কোনই প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না,—কাকাতুয়ার উপর দারুণ বিরক্ত হইলেন। সহচরী পার্শ্বে বসিয়া প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে গেলেন; সুন্দরী সেদিকে কর্ণপাত করিলেন না।

অনেক ক্ষণ এই ভাবেই কাটিয়া গেল। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরী সহচরীকে কহিলেন,—"সহচরি! বলিতে পারিস্,—কোন্ পাপে নারীজন্ম হয়?—কোন্ পাপে এই জ্বালা সহ্য করিতে হয়?"

সহচরী ধীরে ধীরে উত্তর দিল,—"দিদি! তুমি একটুতেই বড় উতলা হও! পতি কার না বিদেশে যায়? বিশেষতঃ,

মহারাজ কয় দিনের জন্যই বা বিদেশে গিয়াছেন! যাতায়াতে যে কয় দিন লাগে! তিনি যাবেন, আর নবাবের সঙ্গে দেখা ক'রেই ফিরে আসবেন।"

সুন্দরী।—"তুই জানিস্ না সহচরি!—কি অবস্থায়, কোন্ কাজে, তিনি মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন! যদি নবাব তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করেন, দারুণ বিপদের সম্ভাবনা।"

সহচরী।—"আমি সব জানি—সব শুনিয়াছি। কিন্তু দিদি! তুমিই তো বলে থাক—সৎকার্য্যে ভগবান সহায় হন। মহারাজ যে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সাফল্য-লাভ নিশ্চয়ই হইবে;—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র আশঙ্কার কারণ নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, মহারাজ শীঘ্রই শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।"

সুন্দরী।—"তাই হোক্, সহচরি!—তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হউক, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হউন;—আমি ষোড়শোপচারে মা-জয়কালীর পূজার ব্যবস্থা করিব। মা অভয়া কি আমায় অভয়-দান করিবেন না?"

সহচরীর কণ্ঠে যেন প্রতিধ্বনি উঠিল,—"মা অভয়া নিশ্চয়ই অভয়-দান করিবেন।"

এমন সময়, সহসা মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কুমার যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তোরণ-দ্বারে নহবতে যে সুরে যে বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছিল, পুনরায় সেই সুরে সেই বাদ্য বাজিয়া উঠিল। এদিকে পরিচারিকাগণের কণ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠিল,—"মহারাজ ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

* * *

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### ভুলিবার নয়!

"It is their maxim, Love is love's reward."

—*Dryden.*

একি স্বপ্ন! একি প্রহেলিকা! এখনও প্রহর অতীত হয় নাই—মহারাজ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছেন! এখন তাঁহার ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা কি! তবে কি তাঁহার মুর্শিদাবাদ যাওয়া স্থগিত রহিল!

সুন্দরী সহচরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"সহচরি! একবার দেখ্ দেখি বোন্,—সংবাদ সত্য কিনা!"

বলিতে বলিতে, কুমার আসিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে, কুমার প্রকোষ্ঠ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সহচরী উঠিতে না উঠিতে, কাকাতুয়া ডাকিয়া উঠিল,—"সুন্দরি! সুন্দরি!"

এবার কাকাতুয়ার কণ্ঠস্বর যেন মিষ্ট বলিয়া মনে হইল। এবার দর্পণের প্রতি চাহিবা-মাত্র সুন্দরী দেখিতে পাইলেন,—কুমারের প্রতিকৃতি দর্পণে প্রতিফলিত হইল।

সুন্দরী ও সহচরী অনন্যমনা হইয়া কথা কহিতেছিলেন। সুতরাং প্রকোষ্ঠের দ্বার-দেশে কুমারকে মুহূর্ত্ত-ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু, কাকাতুয়ার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে, দর্পণের প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, সুন্দরী ও সহচরী উভয়কেই সঙ্কোচের

ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। সহচরী অন্য দ্বার দিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া গেল।

কুমারের প্রত্যাগমনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সুন্দরী, কুমারকে কি-যেন-কি জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। মেঘ-নির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় সুন্দরীর সুন্দর মুখখানি তখন কতই সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

কিন্তু সুন্দরী কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই কুমার কহিলেন,—"সুন্দরি! আমার আর মুর্শিদাবাদ যাওয়ার আবশ্যক হইল না। সেখান হইতে ঠাকুর মহাশয়ের পত্র আসিয়াছে। যে ব্রাহ্মণ-কন্যাদ্বয়ের উদ্ধারের জন্য আমি মুর্শিদাবাদ যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাঁহারা মুর্শিদাবাদে নাই।"

সুন্দরী।—"তবে তাঁহারা কোথায়? মুসলমানেরা তাঁহা-দিগকে কোথায় লইয়া গেল?"

কুমার।—"মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে আদৌ অপহরণ করে নাই। অপহরণের সংবাদ অতিরঞ্জিত। তবে তাঁহারা যে কোথায়, ঠাকুর মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি সন্ধান লইতেছেন। সন্ধান পাইলেই আমাদিগকে তাহা জানাইবেন।"

সুন্দরী।—"ভালই হইয়াছে। তিনি যখন সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-কন্যাদ্বয়ের উদ্ধার-সাধন হইবে।"

কুমার।—"আমিও তাই ভরসা করি।"

এই বলিয়া, কুমার পালঙ্কের উপর উপবেশন করিলেন। সুন্দরীর হাত ধরিয়া, পার্শ্বে বসাইয়া, মৃদুহাস্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা সুন্দরি! বল দেখি, এত ক্ষণ আমরা কোথায় ছিলাম?"

সুন্দরী উত্তর দিতে পারিলেন না। কুমার কহিলেন,—"প্রতি দিন আমি যেখানে থাকি, যে গণ্ডীর মধ্যে প্রতিদিন অবস্থান করি, বিদায়ের পর এই কয় দণ্ড কাল আমি সেখানেই বিচরণ করিতেছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—বল দেখি, তোমায় আমায় কত দূর ব্যবধানে পড়িয়া গিয়াছিলাম? মনে হইতেছিল,—বুঝি আর সাক্ষাৎ হইবে না। মনে হইতেছিল—বুঝি কত দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি!"

সুন্দরী মনে মনে কহিলেন,—"তাই বটে! এত নিকটে ছিলে নাথ!—তবু কত দূরে মনে হইতেছিল! বিচ্ছেদের বিভীষিকা কি ভীষণ!"

সুন্দরীকে নিরুত্তর দেখিয়া, কুমার আবার কহিলেন,—"যদিও দূর বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু তুমি আমার হৃদয়েই অবস্থিত ছিলে। আমি দেবীর মন্দিরে গিয়া যখন প্রণাম করিলাম, তখনও মনে হইল, তুমি আমার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া আছ। যাত্রার প্রতি পদসঞ্চারে তোমাকেই দেখিয়াছি, তোমাকেই মনে পড়িয়াছে। আবার কবে ফিরিয়া আসিব, কবে আসিয়া আবার তোমায় এমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিব,—কেবল তাহাই তখন মনে হইতেছিল!"

বলিতে বলিতে, কুমার সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল, দেখি—সুন্দরি! এত ক্ষণ তুমি আমার বিষয় কি ভাবিতেছিলে?"

সুন্দরী কি উত্তর দিবেন? সেই ধ্যান!—সেই জ্ঞান! সেই চিন্তা!—সেই ভাবনা! কিন্তু সুন্দরী বাক্যের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না।

সুন্দরী কহিলেন,—"আপনার বিদায় গ্রহণের পর আমি

কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলাম, কিছুই বলিতে পারি না। আমি কেবল চারিদিক শূন্য—শূন্যময় দেখিতেছিলাম।"

কুমারের প্রাণে কি-যেন-কি সংশয়-মেঘের উদয় হইল। কুমার কহিলেন,—"সুন্দরি!—এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমি আমায় বিস্মৃত হইলে?"

সুন্দরী ছলছল-নেত্রে কুমারের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই একাগ্র-দৃষ্টিতেই যেন কত কথা প্রকাশ পাইল। মনে হইল, তাঁহার সেই ইন্দীবর নয়নযুগল যেন বলিতেছে—"কখনও কি বিস্মৃত হইতে পারি! ঐ দেবমূর্ত্তি কি কখনও বিস্মৃত হওয়া যায়?" হিন্দুরমণী আপন পতি-দেবতাকে কি কখনও বিস্মৃত হইতে পারে? শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে, দর্শনে, অদর্শনে, জ্ঞানে, অজ্ঞানে,—হিন্দুরমণীর প্রাণের ভিতর তাঁহার পতি-দেবতা যে চির-বিরাজমান!

কখনও কি বিস্মৃত হওয়া যায়? সুন্দরীর মনে যে প্রশ্ন, কুমারের মনেও সেই প্রশ্ন!—সে তো ভুলিবার নয়!

* * *

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### পত্রে কি ছিল?

"Thou know'st if best bestowed or not;
And let Thy will be done."

—*Pope.*

মানুষ এক পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ঘটনা-স্রোত তাহাকে অন্য পথে লইয়া যায়। তাই এত আয়োজন করিয়াও মহারাজ রামকৃষ্ণের মুর্শিদাবাদ-যাত্রার উদ্যম-উৎসাহ ব্যর্থ হইয়া গেল।

যাত্রা করিয়া, বজরায় উঠিয়া, কুমার প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। কেন? ঠাকুর মহাশয়ের পত্রে কি লেখা ছিল?

পত্রে কালাদীঘির দুর্ঘটনার বিষয় লিখিত ছিল। পত্রে লিখিত ছিল—'আলিজান ও মহম্মদী বেগ নামক দুই জন সৈনিক পুরুষ কালাদীঘির ঘাটে দুইটি হিন্দু-মহিলার প্রতি অত্যাচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা যুবতীদ্বয়ের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই যুবতীদ্বয় দীঘির জলে ঝম্প প্রদান করে। তাহাতে আলিজান ও মহম্মদী বেগের অশ্বদ্বয় ছুটিয়া পলাইয়া যায়। আরোহিশূন্য অশ্বদ্বয় শিবিরে ফিরিয়া আসিলে, সেনাপতি তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অনুসন্ধানে আলিজান ও মহম্মদী বেগের দুষ্ক্রিয়ার কথা প্রকাশ পায়। তাহারা কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা করিয়াছিল বলিয়া, নবাব তাহাদের প্রতি দণ্ড-বিধান করেন। যুবতীদ্বয়ের কোনই সন্ধান

পাওয়া যায় নাই। মুর্শিদাবাদের কারাগারে যুবতীদ্বয়ের আবদ্ধ থাকার বিষয়েও প্রমাণাভাব। সুতরাং কুমারের এখানে আসিবার কোনই আবশ্যক নাই। অন্যান্য স্থানেও যুবতীদ্বয়ের সন্ধান লওয়া হইতেছে। যদি সন্ধান পাওয়া যায়, পরে জানান যাইবে।'

পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইয়া, রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন, —"এ অবস্থায় এখন আর মুর্শিদাবাদ যাওয়ার কোনই প্রয়োজন দেখি না। মহারাণী সেখানে আছেন, আমার পিতৃদেব সেখানে আছেন; তাঁহারা সেখানে থাকিতে, তাঁহাদের চোখের উপর, কখনই এমন গর্হিত কর্ম্ম হইতে পারিবে না।"

কুমার কহিলেন,—"যেরূপ সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে মুর্শিদাবাদ যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ-কন্যাদ্বয়ের যখন কোনই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, তখন আর আমার সেখানে গিয়াই বা কি ফল আছে!"

কুমার মনে মনে কহিলেন,—"যদি মুর্শিদাবাদে না রহিলেন, ব্রাহ্মণ-কন্যাদ্বয় কোথায় গেলেন? দীঘিতে জাল ফেলিয়াও যখন তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, তখন তাঁহারা নিশ্চয় জীবিত আছেন। যুবকের কথাবার্ত্তায় অন্ততঃ তাহাই বুঝিতে পারা যায়। যদি জীবিত থাকেন, কোথায় তাঁহারা?"

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"যখন তাঁহাদের কোনই সন্ধান নাই, তখন তাঁহারা জীবিত কি মৃত কিছুই বলিতে পারি না। তবে এই অবস্থায় মুর্শিদাবাদ যাওয়ার যে কোনই আবশ্যক দেখি না,—তাহা বলাই বাহুল্য।"

কুমারেরও সেই মতে মত হয়।

* * *

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

---

### কে সে সন্ন্যাসী?

"And at the sound it shrunk in haste away,
And vanished from my sight—."

—*Shakspeare.*

কুমার সন্ধ্যা-বন্দনার জন্য দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদের পুরোভাগে দশভুজার মন্দির। কুমার মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দশভুজার সম্মুখে উপবেশন-পূর্ব্বক, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছেন। কুমারের সন্ধ্যাহ্নিক উপলক্ষে অন্যান্য সকলে মহামায়ার মন্দির পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে একজন পুরোহিত মাত্র বসিয়া আছেন। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কুমার নিবিষ্টচিত্তে সন্ধ্যাবন্দনা ও মহামায়ার মন্ত্রমালা জপ করিতেছেন।

সহসা একজন সন্ন্যাসী দশভুজার মন্দিরদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া, প্রথম তোরণদ্বারে কেহই তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল না। দশভুজার মন্দিরে সাধু-সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার।

মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, পুরোহিত—ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া, সন্ন্যাসী কহিলেন,—"আমি একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

পুরোহিত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"এই রাত্রিকালে আপনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন! এ সময় তো আপনি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন না! প্রভাতে আসিবেন,—মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

সন্ন্যাসী।—"কেন? এখন সাক্ষাৎকারের পক্ষে কি অন্তরায় আছে? সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাহাতে আবার সময় অসময় কি?"

পুরোহিত।—"এখন কোনক্রমেই সাক্ষাৎ সম্ভবপর নহে।" মহারাজ পূজা-আহ্নিক করিতেছেন। পূজা-আহ্নিকের পর তিনি আহারাদি করিতে যাইবেন। সুতরাং রাত্রিকালে মহারাজের সাক্ষাৎ-লাভের চেষ্টা বৃথা।"

সন্ন্যাসী।—"এক জন সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন,—আপনি মহারাজকে এই কথাটী এক বার জানাইতে পারেন না কি?"

পুরোহিত।—"মহারাজের নিষেধ আছে। তাঁহার পূজার সময় মন্দিরের মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার আদেশ নাই। তিনি নিবিষ্টচিত্তে মহামায়ার ধ্যান করিতেছেন। আপনি সন্ন্যাসী হইয়া কেমন করিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে চান?"

সন্ন্যাসীর একটু ক্রোধসঞ্চার হইল। সন্ন্যাসী একটু রুক্ষ-স্বরে কহিলেন,—"মহারাজ ধ্যান-মগ্ন আছেন! সাক্ষাতের অবসর হইবে না! সংবাদ দিতে নিষেধ আছে!"

সন্ন্যাসীকে বাধা দিয়া পুরোহিত কহিলেন,—"চুপ করুন। এখানে চীৎকার করিবেন না। মহারাজের জপে বিঘ্ন ঘটিবে।"

সন্ন্যাসী অধিকতর রোষান্বিত হইলেন। উচ্চ চীৎকার করিয়া কহিলেন,—“মহারাজ ! মহারাজ ! আপনি কি জপ করিতেছেন ? আপনি কি ধ্যান করিতেছেন ?”

পুরোহিত, সন্ন্যাসীকে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। অধিক চীৎকার করিলে দ্বারবানগণের সাহায্যে প্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। কিন্তু তদ্রূপ ভীতি-প্রদর্শনে সন্ন্যাসী অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সন্ন্যাসী সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“মহারাজ ! মহারাজ ! কাহার মুখ ধ্যান করিতেছেন ? কাহার অলঙ্কারের বিষয় আপনার জপমালা হইয়াছে ? সহর হইতে নূতন অলঙ্কার ক্রয় করিয়া আনিয়া কি অলঙ্কারে কেমন করিয়া সাজাইলে, মহারাণীর সৌন্দর্য্য কত গুণ বৃদ্ধি পায়, জগদম্বার আরাধনায় বসিয়া, আপনি সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া আছেন ! এই আপনার ধ্যান ?—এই আপনার জপ ?—এই আপনার পূজা ? এই ধ্যানে—এই জপে—এই পূজায় বসিয়া, আপনি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পরাঙ্মুখ ?”

সন্ন্যাসী এতই চীৎকার করিয়া মহারাজকে ধিক্কার দিয়া শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেন যে, তাহাতে দশভূজার মন্দির কাঁপিয়া উঠিল, পুরোহিত কাঁপিয়া উঠিলেন, মন্দির-মধ্যে কুমারীও কাঁপিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসীর বাক্য-স্রোত অনর্গল প্রবাহিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী সমস্বরে কহিতে লাগিলেন,—“মহারাজ ! তুমি নয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ ! তুমি নয় প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর পবিত্র সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছ ? হায় ! তুমি এখনও শিখিলে না,—

এখনও জানিলে না,—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান কি প্রকার! যে পুরুষ মনের বশে ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কর্ম্মরূপ যোগানুষ্ঠান করেন—তিনিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিবার উপযুক্ত উপাদান প্রাপ্ত হইয়াও, তুমি এ কি করিতে বসিয়াছ? তুমি কি মানুষ? সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার তোমার অবসর হইল না?"

সন্ন্যাসীর সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। সন্ন্যাসীর সেই অগ্নিস্রাবী বাক্যাবলী কুমারের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিল। পুরোহিত চিত্র-পুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কুমার, আসন পরিত্যাগ করিয়া, কম্পান্বিত কলেবরে মন্দিরের বাহিরে আসিলেন।

কিন্তু কৈ? কোথা সে সন্ন্যাসী? এ তীব্র তিরস্কার কোন্ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল? কুমারও দেখিতে পাইলেন না; পুরোহিতও আর দেখিতে পাইলেন না! আঁধারে আসিয়া সন্ন্যাসী যেন আঁধারেই মিশিয়া গেলেন।

পুরোহিত্কে সম্বোধন করিয়া কুমার তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর! কে কথা কহিতেছিলেন? তিনি কোথায় গেলেন?"

পুরোহিত বিমূঢ়ের ন্যায় উত্তর দিলেন,—"এঁ.—এঁ—কৈ—তিনি কোথায় গেলেন? এই যে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এখনই তিনি কথা কহিতেছিলেন! এঁ—এঁ—তিনি কোথায় গেলেন!"

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর! আপনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি? তিনি দেখিতে কেমন? তাঁহার বেশ-ভূষাই বা কি প্রকার?"

পুরোহিত।—"মহারাজ! সে এক অপরূপ রূপ। যেমন গঠন, তেমনই রূপ। যদি তিনি সন্ন্যাসী-বেশে না আসিতেন, রাজপুত্র বলিয়া ভ্রম হইত। বিস্তৃত ললাট, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-লেপনে দেহজ্যোতিঃ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রতীত হইতেছে। পাটলবর্ণ জটারাশি কুণ্ডলাকারে বিন্যস্ত হইয়া মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক বসন। এক হস্তে কমণ্ডলু, অপর হস্তে ত্রিশূল। সন্ন্যাসী যুবাপুরুষ।"

পুরোহিত যতই সন্ন্যাসীর রূপের কথা কহিতে লাগিলেন, কুমারের অন্তরাত্মা ততই কাঁপিয়া উঠিল ;—ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"কে সে সন্ন্যাসী!"

কুমার আর অধিক ক্ষণ মন্দিরে অবস্থান করিতে পারিলেন না। পূজা-আহ্নিক অসম্পূর্ণ রহিল। কুমারের হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল। কুমার নিভৃতে পুষ্পোদ্যানের দিকে চলিয়া গেলেন।

কুমার নিভৃতে বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"কে সে সন্ন্যাসী?—তাঁহাকে কি কোথাও দেখিয়াছি? কাহার সে কণ্ঠস্বর?—সে স্বর কি কোথাও শুনিয়াছি?"

কত পুরাণ স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কত অদৃষ্ট-চিত্র মানস-পটে প্রতিভাত হইল। অতীতের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে কুমার কত আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইলেন।

যত দূর দৃষ্টি চলিল, যত ভূত-কথা স্মরণ হইল, সন্ন্যাসীর সহিত কুমারের কোথাও যেন পরিচয় হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতে লাগিল।

মনে পড়িল—শৈশবের কথা! মনে পড়িল—আটগ্রামে সড়কের পথে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎকারের বিষয়! মনে পড়িল—সন্ন্যাসীর উপদেশে পাখীর বন্ধন-মোচন! আরও মনে পড়িল—আরও কত পূর্ব্বের কত স্মরণাতীত কাহিনী! —সে কাহিনী চঞ্চল-ছায়ার ন্যায় হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত হইয়া আবার আপনিই তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

ভাবিতে ভাবিতে, অদৃষ্ট অতীতের কথা স্মরণ করিতে করিতে, কুমার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

* *
*

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## চতুর্থ খণ্ড।

"এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হে মহাবাহো! এইরূপে আত্মাকে অবগত হইয়া, বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্থির করিয়া, কাম-রূপ দুরাসদ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনাশ কর।

* * *

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### অভাব-নিষ্পত্তি।

"The lunatic, the over, and the poet,
Are of imagination all compact:"
—*Shakspeare.*

শিরোমণি মহাশয় বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছেন। মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। ন্যায়বার্ত্তিক, ন্যায়বিন্দু, ন্যায়কন্দলী প্রভৃতি টীকা আলোড়ন করিয়াও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছেন না।

প্রভাতে স্নানাহ্নিক সারিয়া, পুঁথি-পত্র লইয়া বসিয়াছেন; বেলা দ্বি-প্রহর উত্তীর্ণ হইল, এখনও সংজ্ঞা নাই। পদার্থ-তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, তিনি সংসার-তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

এক বার কন্যা আসিয়া কহিল,—"বাবা! চাল বাড়ন্ত! শিষ্য-বাড়ী কখন যাবেন?" সে কথা কানেই প্রবেশ করিল না।

দ্বিতীয় বার পরিচারিকা আসিয়া বলিল,—"মা-ঠাকরুণ আপনাকে এক বার রাজবাড়ী যেতে বল্‌ছেন।" শিরোমণি মহাশয় "আচ্ছা" বলিয়া উত্তর দিয়া আবার নিবিষ্ট-চিত্তে পুঁথির পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিলেন।

অনেক ক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া, গৃহিণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। এবার তিনি সশরীর চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়াই উপস্থিত হইলেন।

শিরোমণি মহাশয় তখন ন্যায়-শাস্ত্রের প্রথম সূত্র আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থোৎপত্তি-ব্যাপারে ব্রতী ছিলেন। তিনি পড়িতে-ছিলেন,—"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানন্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।' আর আপনা-আপনিই বলিতে-ছিলেন,—'নিঃশ্রেয়স-রূপ পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান—এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক।'

এমন সময়ে গৃহিণী আসিয়া, হাত-মুখ নাড়া দিয়া কহিলেন, —"আজ কি কারও খাওয়া-দাওয়া নেই? কেবল তত্ত্ব-জ্ঞান খেয়েই পেট ভ'রবে?"

সকল কথা শিরোমণি মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল না। কেবল 'তত্ত্বজ্ঞান' মাত্র শুনিয়াই তিনি কহিলেন,—"ষোড়শ পদার্থের লক্ষণ-বিচারে ও পরীক্ষা-প্রণালীর আলোচনায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। প্রথম পদার্থ—প্রমাণ; প্রমাণ শব্দের অর্থ—যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়।"

এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় পুঁথি-পত্র উল্টাইতে লাগিলেন। গৃহিণী আসিয়া কি কথা কহিতেছেন, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

গৃহিণী অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া

কহিলেন,—"আজ কি খেয়ে জ্ঞান লাভ হবে, সেটার কোনও উপায় ক'রেছ কি ?"

শিরোমণি মহাশয় পুঁথির প্রতি নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন। সুতরাং বাম হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক গৃহিণীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়া অনন্যমনা হইয়া কহিলেন—"একটু অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"জ্ঞান দুই প্রকার—যথার্থ ও অযথার্থ। রজ্জুকে রজ্জু-বোধ—যথার্থ-জ্ঞান; এবং রজ্জুকে সর্প-বোধ—অযথার্থ জ্ঞান।"

গৃহিণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। পূর্ব্ববৎ রুক্ষ-স্বরে কহিলেন,—"এইবার তোমার যথার্থ জ্ঞান যাতে হয়, তা ক'রছি!" সম্মুখে শিকার পাইলে ব্যাঘ্র যেমন ঝম্প-প্রদান-পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করে, গৃহিণীও তদ্রূপ সেই পুঁথি-পত্রের উপর পতিত হইলেন। শিরোমণি মহাশয়ের চতুর্দ্দিকে স্তূপাকারে পুঁথি-পত্র-গুলি সজ্জিত ছিল। এখন সেই গুলির উপর পতিত হইয়া, গৃহিণী ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"এই ছাই-ভস্মগুলাকে আজ পুড়িয়ে, তবে আমার অন্য কাজ! এই গুলাই যত কষ্টের মুল।" গৃহিণীর মনে হইল,—তাঁহার পতি শিরোমণি মহাশয় যেরূপ দেশ-মান্য পণ্ডিত, পুঁথিপত্রগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়া, তিনি যদি দেশে-বিদেশে গতি-বিধি করেন, পাঁচ জন বড়-লোকের সহিত পরিচয় রাখেন, তাঁহার অন্ন কে খায়! কিন্তু পুঁথিপত্রগুলাই কাল হইয়াছে। এই গুলার মায়াতে আবদ্ধ হইয়াই, তাঁহাকে এত কষ্ট সহিতে হইতেছে।'

হঠাৎ পুঁথিপত্রগুলি লইয়া গৃহিণী টানাটানি করিতেছেন দেখিয়া, শিরোমণি মহাশয়ের সংজ্ঞা হইল।

"কর কি!—কর কি? ছাড়—ছাড়!" এই বলিয়া, তিনি গৃহিণীর হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন।

গৃহিণী আস্ফালন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"না—আজ আর আমি কিছুতেই শুন্‌ব না! এই গুলাই যত অনর্থের মূল!"

শিরোমণি মহাশয় বিনীত-স্বরে কহিলেন,—"কি হ'য়েছে—বলই না ছাই!"

গৃহিণী।—"হ'য়েছে আমার পিণ্ডি! কচি মেয়েটা পর্য্যন্ত এখনও কিছু খেতে পেলে না; উনুনে হাঁড়ি চ'ড়ল না; সে সব দিকে একটু নজর নেই; কেবলই তত্ত্বজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান!"

শিরোমণি।—"এরই জন্যে এত! এত ক্ষণ খুলে ব'ল্‌লেই হ'ত! আমি যাচ্ছি; এখনই সব যোগাড়-যন্ত্র ক'রে নিয়ে আস্‌ছি! তুমি পুঁথিগুলাতে আর হাত দিও না।"

অনেক মিনতি করিয়া, শিরোমণি মহাশয় পত্নীকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। পুঁথিপত্রগুলি সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল। শিরোমণি মহাশয় রাজবাড়ী যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। রাজবাড়ী সেখান হইতে ক্রোশাধিক ব্যবধান।

শিরোমণি মহাশয় রাজবাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, স্কন্ধদেশে উত্তরীয়খানি বিলম্বিত হইয়াছে, এমন সময় একজন বাহক-সহ একখানি নৈবেদ্য লইয়া রামচরণ আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রামচরণ—নাটোর-রাজবাটীর ভৃত্য। নৈবেদ্য লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, রামচরণ কহিল,—"রাণী-মা আজ জয়কালীর মন্দিরে পূজা দিয়াছিলেন। সেই পূজার এই নৈবেদ্য-খানি পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

রাজবাড়ীর নৈবেদ্য—বৃহৎ ব্যাপার। প্রকাণ্ড একখানি

বারকোষের উপর দশ সের পরিমিত আতপ-তণ্ডুল—মন্দিরের ন্যায় শোভমান। তদুপরি একটী 'শোঁয়াতোলা মণ্ডা'—মন্দিরের চূড়ার ন্যায় শোভা পাইতেছে। নারিকেল, শশা, কলা, নেবু, পেঁপে, খেজুর প্রভৃতি নানাবিধ ফল,—বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস, আখ্‌রোট, আঙ্গুর প্রভৃতি নানাবিধ মেওয়া,—বুট, ঘোড়া, মুগ প্রভৃতি পঞ্চশস্য—নৈবেদ্যখানিকে বৃত্তাকারে ঘেরিয়া রহিয়াছে। কেবল এই নৈবেদ্যখানি নহে; নৈবেদ্যের সঙ্গে সঙ্গে, বাহকের মস্তকে, অপর এক খানি বারকোষের উপর, একটী পাত্রে দধি, একটী পাত্রে ক্ষীর, একটী পাত্রে ছানা, একটী পাত্রে সন্দেশ প্রভৃতি সজ্জিত ছিল। তাহার সঙ্গে মহারাণী, শিরোমণি-গৃহিণীর জন্য একখানি পট্টবস্ত্র এবং একটী স্বর্ণ-মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন।

সোপকরণ সেই নৈবেদ্য, পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণ-মুদ্রা আনিয়া রামচরণ যখন সম্মুখে রক্ষা করিল, গৃহিণীর আহ্লাদের আর অবধি রহিল না। গৃহিণী তখন মনে মনে কহিলেন,—"আমার পতি যথার্থ ই দেশের প্রধান পণ্ডিত। ইহাঁর পাণ্ডিত্য সার্থক।"

গৃহিণী নৈবেদ্যের দ্রব্যজাত অন্দরে লইয়া গেলেন।

অন্নের চেষ্টায় শিরোমণি মহাশয়ের আর বাহিরে যাওয়ার আবশ্যক হইল না। তিনি পুনরায় সেই পুঁথি-পত্রের মধ্যস্থলে গিয়া উপবেশন করিলেন। পুঁথি খুলিয়া প্রথমেই দেখিলেন 'প্রমাণের দ্বারা যথার্থ-অযথার্থ-ভেদ উপলব্ধি হয়।' সুতরাং অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন,—'প্রমাণ কি?' ন্যায়শাস্ত্র দেখাইলেন,—'প্রমাণ চতুর্ব্বিধ,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।' প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ-বিষয়ে সূত্রে লিখিত আছে,

'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকার্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যং অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং।' তদ্বিষয়ে মনোমধ্যে নানা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। বুঝিলেন—'প্রত্যক্ষ আবার দুই প্রকার,—সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। ঘট পট যখন ঘট পট নামে অভিহিত, তখন সবিকল্পক জ্ঞান; আর যখন তাহা সাধারণ বস্তু সংজ্ঞা লাভ করে, তখন নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। যাহা প্রমাণ নয়, অথচ প্রমাণবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহা প্রমাণাভাস মাত্র। পদার্থ-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান প্রয়োজন।"

এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিতেছেন;—ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনার সীমা ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; এমন সময়, শ্রীহরি বিদ্যারত্ন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভদ্রপুরে নিমন্ত্রণ যাওয়ার বিষয় কি স্থির হইল? যাইতে হইলে, কালই রওনা হওয়া আবশ্যক।"

শিরোমণি মহাশয় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আপন মনেই কহিতে লাগিলেন,—"পদার্থ? কণাদের মতে—পদার্থ দ্বিবিধ,—ভাব পদার্থ, আর অভাব পদার্থ।"

'অভাব' শব্দটি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় মনে করিলেন,—'যেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই কিছু বলা হইতেছে।' সুতরাং উত্তর দিলেন,—"অভাব বৈ কি? অভাব বলিয়াই তো অত দূর-দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি! আপনারও তো অভাব!"

শিরোমণি মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—"কি বলিলেন? আমার অভাব! আমি জীবন্ত বিদ্যমান—সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রমাণ—আমার অভাব! আপনি ভুল বলিতেছেন।"

বিদ্যারত্ন।—"আমি সে কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছিলাম, আমাদের দারুণ অভাব। সেই অভাব নিবারণের—"

শিরোমণি মহাশয় বাধা দিয়া কহিলেন,—"অভাব বলিয়া কোনও পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। যদিও মহর্ষি কণাদ 'অভাব' পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, সে কেবল কল্পনা মাত্র। ভাবের অভাবই—অভাব। তাহা হইলে 'ভাব' পদার্থ ই পদার্থ পদবাচ্য। অভাব পদার্থের অস্তিত্বাভাব।"

বিদ্যারত্ন।—"আমাদের সাংসারিক অভাবের—"

শিরোমণি মহাশয় পুনরায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"একটু স্থির হউন। আমি যাহা বলিয়া যাই, অগ্রে তাহা অনুধাবন করুন। পশ্চাৎ বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। প্রমাণে প্রতিপন্ন হয়,—অভাবেরই অস্তিত্বাভাব। সুতরাং কি করিয়া অভাব থাকিতে পারে? আমি তো অভাব দেখিতে পাই না!"

বিদ্যারত্ন মহাশয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—যেন তর্ক-যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়েই শিরোমণি মহাশয় ন্যায়ের এই কূট-তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং একটু বিরক্তির স্বরে তিনি কহিলেন,—"আমি জানিতে চাই,—আপনি যাইবেন কি না?"

শিরোমণি।—"কোথায় যাইব?"

বিদ্যারত্ন।—"ভদ্রপুরে মহারাজ নন্দকুমারের বাটীতে!"

শিরোমণি।—"কেন?"

বিদ্যারত্ন।—"সেদিন তো নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছেন?"

শিরোমণি।—"কিসের নিমন্ত্রণ?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কিঞ্চিৎ রোষাবিষ্ট হইলেন; কহিলেন,—

"কিসের নিমন্ত্রণ! জানেন না কি—কিসের নিমন্ত্রণ? মহারাজ নন্দকুমার লক্ষ-ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিবেন। তাহারই উৎসবায়োজন চলিয়াছে। সেই উৎসবোপলক্ষে আপনিও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সেখানে গমন করিলে, অভাব দূর হইবে।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় অতর্কিতভাবে পুনরায় 'অভাব' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। যে 'অভাব' শব্দে এত তর্ক-বিতর্ক, আবার সেই শব্দ উচ্চারণ! শিরোমণি মহাশয় পুনরায় গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন,—"অভাবই নাই; তাহার আবার দূর হইবে কি?"

বিদ্যারত্ন।—"আপনার অভাব নাই? আপনি যাইবেন না?"

শিরোমণি মহাশয় কহিলেন,—"না!"

বিদ্যারত্ন বিরক্ত হইয়া শিরোমণি মহাশয়ের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি মনে মনে কহিলেন, —"এত অহঙ্কার! মহারাজ নন্দকুমারের নিমন্ত্রণে তাচ্ছিল্য!"

বিদ্যারত্ন চলিয়া গেলে, শিরোমণি মহাশয় পূর্ব্ববৎ পুঁথি-পত্র আলোড়নে প্রবৃত্ত হইলেন। সূত্রান্তরে দেখিলেন,—'দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" ভাষ্য পড়িয়া বুঝিলেন,—"নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই মুক্তি; সেই মুক্তিলাভ করিতে হইলে, ত্রিবিধ দুঃখের নিবারণ করিতে হয়; দুঃখ নিবারণ করিতে হইলে, জন্মের নিবারণ করিতে হয়; জন্ম নিবারণ করিতে হইলে, প্রবৃত্তি বিনাশ করিতে হয়; প্রবৃত্তি বিনাশ করিতে হইলে, ত্রিবিধ দোষ অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-মোহ দূর করিতে হয়; দোষ নিবারণ করিতে হইলে, মিথ্যাজ্ঞানের নিবারণ করিতে হয়; মিথ্যাজ্ঞান নিবারণ হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সেই তত্ত্বজ্ঞান-লাভই মুক্তি।"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:o:—

### পরিবর্ত্তন।

"নানৃতং ব্রাহ্মণো ব্রূতে ন হন্তি প্রাণিনং দ্বিজঃ।
ন সেবাং কুরুতে বিপ্রো ন দ্বিজঃ পাপকৃদ্ভবেৎ ॥"

—শিবপুরাণম্।

শিরোমণি মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় আরও নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষ হইতে তিনি বহু ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। যিনিই সে সংবাদ অবগত হইলেন, তিনিই ভদ্রপুরে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

মহরাজ নন্দকুমার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া নিমন্ত্রণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীহরি বিদ্যারত্ন মহাশয়, মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিনিধি-রূপে নিমন্ত্রণ করিতেছিলেন, এবং সকলকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইতে-ছিলেন।

প্রায় সকল গ্রামের সকল ব্রাহ্মণই আগ্রহ-সহকারে নিমন্ত্রণ-রক্ষায় গমন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু এক শিরোমণি মহাশয়ই 'ইতস্ততঃ' করিলেন। বিদ্যারত্নের মনে হইল,—"শিরোমণির মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। নচেৎ, এরূপ একটা বড় নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন কেন?" বিদ্যারত্ন মহাশয় আরও ভাবিলেন,—"শিরোমণি মহাশয় একজন দেশ-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

তিনি না যাইলে, নিশ্চয় তাঁহার খোঁজ পড়িবে। খোঁজ পড়িলে, মহারাজ জানিতে পারিলে, শিরোমণির মুর্শিদাবাদ-অঞ্চলের নিমন্ত্রণ একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।"

এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে, শ্রীহরি বিদ্যারত্ন চণ্ডীপুর-গ্রামের নবকুমার শর্ম্মার ভবনে উপনীত হইলেন। প্রথম যেদিন নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন, গ্রামের সকলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু নবকুমার শর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায়, তাঁহার নিমন্ত্রণের কথা তাঁহার বাটীতেই বলিয়া গিয়াছিলেন। আজ চণ্ডীপুরে আসিয়া প্রথমেই তিনি নবকুমার শর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবকুমার শর্ম্মার সাংসারিক অবস্থা বড় অসচ্ছল ; বিদ্যারত্ন আশা করিয়াছিলেন, এই নিমন্ত্রণে নবকুমার তাঁহার প্রতি বড়ই তুষ্ট হইবেন। তাই প্রথমে তাঁহার বাড়ীতেই গমন করিলেন। কিন্তু এ কি!—নবকুমার শর্ম্মা এ কি কহিলেন?

নবকুমার কহিলেন,—"আমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কেন? নিমন্ত্রণ লইবেন না কেন?"

নবকুমার।—"সে কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই। আমার ইচ্ছা হইল না ; আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম না। এইমাত্র জানিয়া রাখুন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় সহস্রাধিক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ কথা এ পর্য্যন্ত আর কেহই বলেন নাই। এরূপ কথা নবকুমার শর্ম্মার মুখেই এই প্রথম শ্রবণ

করিলেন। সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের একটু কৌতূহল হইল। নবকুমার শর্ম্মা কি জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় পুনঃপুনঃ তাহা জানিতে চহিলেন। অগত্যা নন্দকুমার শর্ম্মা মনোভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কহিলেন,—"কি কারণে আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই, তাহা প্রকাশ করিব না বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি কিছুতেই আমায় নিষ্কৃতি প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং কথাটী রূঢ় হইলেও আমায় বলিতে হইতেছে।"

বিদ্যারত্ন।—"যে কথাই হউক, আপনি অনায়াসে আমাকে বলিতে পারেন। আমা হইতে আপনার কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।"

নবকুমার শর্ম্মা কহিলেন,—"ইষ্টানিষ্টের আশঙ্কা আমি একটুও করি না। তবে কথাটা শুনিতে রূঢ় হইবে বলিয়াই বলিতে সঙ্কোচ-বোধ করিতেছিলাম। আমি যে মহারাজ নন্দকুমারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নাই, তাহার কারণ— মহারাজ স্ববৃত্তিহীন। যে ব্রাহ্মণ যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রভৃতি আত্মবৃত্তি পরিহার-পূর্ব্বক চাকুরি-বৃত্তি গ্রহণ করেন, ব্রাহ্মণ-সমাজে তিনি কখনই শ্লাঘনীয় নহেন।"

শ্রীহরি বিদ্যারত্ন বাধা দিয়া কহিলেন,—"মহারাজ নন্দকুমারের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি আজকাল দ্বিতীয় নাই।"

নবকুমার।—"সে কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না। তবে তিনি যে স্ববৃত্তিত্যাগী, তাহাই বলিতেছি। যে ব্রাহ্মণ চাকুরিজীবী, তিনি তো পতিত ব্রাহ্মণ! আমি পতিত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ-গ্রহণে প্রস্তুত নহি।"

বিদ্যারত্ন।—"মহারাজ নন্দকুমার চাকুরিজীবী?—মহারাজ নন্দকুমার পতিত ব্রাহ্মণ? এ বড় অন্যায় কথা কহিতেছেন!"

নবকুমার।—"ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, আমার বিশ্বাস অনুসারে আমি বলিতেছি। তিনি যখন মুসলমানের বৃত্তি-ভোগী, তখন আমি কোনক্রমেই তাঁহাকে শ্লাঘ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।"

শ্রীহরি বিদ্যারত্ন বুঝিলেন—'তর্কের দ্বারা কোনরূপ ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই।' সুতরাং নানারূপ প্রলোভন-জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি বিদ্যারত্ন কহিলেন,—"মহারাজ নন্দকুমারকে সন্তুষ্ট রাখিলে, সাংসারিক সকল কষ্ট দূরীভূত হইতে পারে।" কিন্তু নবকুমার অটল অচল। তিনি কোনও কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

যাহা হউক, এইরূপ দুই একটী ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত হইলেও, মহারাজ নন্দকুমারের ভবনে লক্ষ ব্রাহ্মণের অভাব হইল না। মহারাণী ভবানী যেরূপ জাঁকজমকের সহিত লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তত দূর না হউক, মহারাজ নন্দকুমারও বিশেষ জাঁক-জমকের সহিত লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

এই উৎসব-ব্যাপারে মহারাজ নন্দকুমারের নিকট শ্রীহরি বিদ্যারত্ন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নিমন্ত্রণ করিয়াও যে সকল ব্রাহ্মণকে তিনি ভদ্রপুরে উপস্থিত করিতে পারেন নাই, বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সম্বন্ধে নন্দকুমারের কর্ণে কত কথাই কতরূপে রঞ্জিত করিয়া তিনি উপস্থিত করিয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের এবং নন্দকুমার শর্ম্মার অনুপস্থিতি-হেতু, শ্রীহরি

বিদ্যারত্ন কহিলেন,—"ঐ দুই ব্রাহ্মণের আস্পর্দ্ধা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। আটগ্রামের হলধর মৈত্রের পুত্রের নিকট শুনিয়াছি, এ বিষয়ে মহারাজ রামকৃষ্ণের একটু ইঙ্গিত আছে। আপনার কাজ যাহাতে পণ্ড হয়, মহারাজ রামকৃষ্ণের নাকি তাহাই ইচ্ছা। তাহা না হইলে, নবকুমার শর্ম্মা কি-না আপনাকে বলেন—পতিত ব্রাহ্মণ!" এই বলিয়া, শ্রীহরি বিদ্যারত্ন নবকুমার শর্ম্মার উদ্দেশ্যে কত কটু-কাটব্য কথা উচ্চারণ করিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার কিন্তু তাহাতে মনে মনে বড়ই ক্ষুন্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল, একবার বলি—'বিদ্যারত্ন তুমি চটিতেছ কেন? নবকুমার শর্ম্মা সত্যই বলিয়াছেন—আমি পতিত ব্রাহ্মণ! পতিত ব্রাহ্মণ না হইলে, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সামান্য পদ-সম্ভ্রমের জন্য আমি আজি যবনের পদলেহন করিব কেন? তাহা না করিলে, পদে পদে আমায় এতাদৃশ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেই বা হইবে কেন?' যাহা হউক, প্রকাশ্যে কহিলেন,—"এখনও উৎসব-সমারোহ শেষ হয় নাই। এ সময় ও-সকল বিষয়ের আলোচনা না করাই শ্রেয়ঃ। কি জানি কিসে কি বিঘ্ন ঘটিতে পারে!"

শ্রীহরি বিদ্যারত্ন কহিলেন,—"আচ্ছা, সময়ান্তরে সকল কথা আপনাকে খুলিয়া বলিব। তবে আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এ ব্যাপারে নাটোরের কিছু টিপ-টাপ আছেই আছে।"

মহারাজ নন্দকুমার উত্তর দিলেন—"এ সকল কথা সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে। এখন আপনি দেখুন—যেন কাহারও পরিচর্য্যার কোনরূপ ত্রুটি না হয়।"

শ্রীহরি বিদ্যারত্ন বলিবার চেষ্টা পাইলেন,—"দোষ নাটোরের।"

মহারাজ নন্দকুমার উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা!" মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"বিদ্যারত্নকে এ কথা কি কেহ শিখাইয়া দিল?" পরক্ষণেই তাঁহার স্মরণ হইল,—"বিদ্যারত্ন হলধর মৈত্রের নাম করিয়াছেন।" সুতরাং বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না।

শ্রীহরি বিদ্যারত্নকে বিদায় দিয়া, নন্দকুমার মনে মনে কহিলেন,—মহারাণী ভবানীর বিরুদ্ধে দুই দুই বার আমি ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলাম। দুই দুই বারই অপদস্থ হইয়াছি। সেই পুণ্যবতীর দীর্ঘনিশ্বাসেই বোধ হয় আমি চির-অশান্তি ভোগ করিতেছি। যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর না! আমি যতদুর জানি, মহারাজ রামকৃষ্ণ নিরীহ ও সজ্জন ব্যক্তি। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণ-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান তিনি যে পণ্ড করিবার চেষ্টা পাইবেন, তাহা কদাচ বিশ্বাস হয় না। সম্ভবতঃ, মহারাজ রামকৃষ্ণের শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় শ্রীহরি বিদ্যারত্নের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। যাহা হউক, নাটোর-রাজ্যের কোন অনিষ্ট আমা হইতে আর হইবে না। যদি পারি, নাটোর-রাজ্যের কোনরূপ উপকার-সাধনেরই বরং চেষ্টা পাইব।"

মহারাজ নন্দকুমারের মনের গতি নূতন পথে প্রধাবিত হইল। মহারাজ মনে মনে স্থির করিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ। পূর্ণ-রূপে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার চেষ্টা করাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। লক্ষ-ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণে নিশ্চয় আমার পূর্ব্বকৃত পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এখন আর আমি কদাচ সত্যভ্রষ্ট হইব না। যাহা সত্য বলিয়া জানিতে পারিব, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব, জীবনের শেষ কয় দিন, তাহারই অনুসরণ করিব।"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## সঙ্কল্প।

"——and having power
T' enforce wrong, for such a worthy cause
Dooms and devotes him his lawful prey."

—*Cowper.*

প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই বিষম পরীক্ষার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

নায়েব-দেওয়ান রেজাখাঁর অত্যাচারে দেশব্যাপী আর্ত্তনাদ উত্থিত হইলে, তাহার প্রতিধ্বনিতে সুদূর ইংলণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ডিরেক্টর-গণ রেজাখাঁর দণ্ড-বিধানের জন্য হেষ্টিংসের উপর আদেশ-প্রচার করিলেন। রেজাখাঁ মুসলমান-সমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। সুতরাং রেজাখাঁর দণ্ডবিধান করিতে হইলে, মুসলমান-সমাজ উদ্বেলিত হইবার শঙ্কা হইল। হেষ্টিংস তাই নন্দকুমারের সহায়তা-প্রার্থী হইলেন।

মহারাজ নন্দকুমার তখন হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয়। নন্দকুমারের নিকট রেজাখাঁর দণ্ড-বিধানে সহায়তা গ্রহণ করিয়া, হেষ্টিংস 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং' নীতির অনুসরণ করিলেন।

রেজাখাঁর এবং সেতাব রায়ের—বাঙ্গালা ও বিহারের এই দুই নায়েব-দেওয়ানের—বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইল।

মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট মিডিল্টন সাহেব রেজাখাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সেতাব রায়ও কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। বিচার আরম্ভ হইল। মহারাজ নন্দকুমার প্রমাণ-পরম্পরা উপস্থিত করিতে আদিষ্ট হইলেন।

রেজাখাঁর ও সেতাব রায়ের অত্যাচারে 'ছিয়াত্তুরে মম্বন্তরের' ভীষণতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে, রাজস্ব-সংগ্রহ-ব্যপদেশে, রেজাখাঁ, দেশের খাদ্যশস্য—প্রজার মুখের গ্রাস—দরিদ্রের দেহের শোণিত—অপহরণ করিয়াছিলেন;—খাদ্য-শস্য গোলাজাত রাখিয়াছিলেন;—খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ব্যবসার আরম্ভ করিয়া বহুগুণ বর্দ্ধিত-মূল্যে তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাহাতে অনশনে বহু প্রজার প্রাণনাশ হয়। রেজাখাঁর বিরুদ্ধে সেই এক গুরুতর অভিযোগ। আর এক অভিযোগ,—নিজামতের বহুমূল্য রত্নালঙ্কার এবং নগদ বিশ কোটি টাকা তৎকর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ার। সেতাব রায়ের বিরুদ্ধেও ঐরূপ নব্বই লক্ষ টাকা অপহরণের অভিযোগ ছিল। এই সকল অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা উভয়েই হেষ্টিংসকে এবং নন্দকুমারকে বিশেষরূপ উৎকোচ দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াও প্রকাশ পায়। যাহা হউক, যে কারণেই হউক, হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেন। ফলে, চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে,—'মহারাজ নন্দকুমার উপযুক্ত প্রমাণ-পরম্পরা উপস্থিত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু হেষ্টিংস উৎকোচ পাইয়া অপরাধীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।'

এই ঘটনার পর, রেজাখাঁ ও সেতাব রায়,হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র হন। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়।

হেষ্টিংসের সহিত যখন নন্দকুমারের সদ্ভাব ছিল, সেই সময় নন্দকুমারের অনুরোধে তাঁহার পুত্র গুরুদাস নবাবের দেওয়ানী-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবাব মোবারক-উদ্দৌলার অবিভাবিকা-পদে মণি বেগমের নিয়োগ—সেই সময়েরই ঘটনা। রেজাখাঁ প্রভৃতির অব্যাহিতি-লাভে হেষ্টিংসের প্রতি নন্দকুমার সন্দিহান হন। ইহার পর হেষ্টিংসও নন্দকুমারকে গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। এই সময় হেষ্টিংসের ধারণা হয়—নন্দকুমার হয় তো তাঁহার অপকর্ম্মের বিষয় কোনদিন প্রকাশ করিয়া দিবেন। সুতরাং হেষ্টিংস নানাপ্রকারে নন্দকুমারকে অপদস্থ করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে আরম্ভ করেন। এখন, মহারাজ নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী এবং দেবীসিংহ প্রভৃতি হেষ্টিংসের প্রিয়-পাত্র হইয়াছিলেন।

হেষ্টিংসের শাসন-বিশৃঙ্খলায় দেশের জমীদারগণ অনেকেই উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। নন্দকুমারকে হেষ্টিংসের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ মনে করিয়া জমীদারগণ নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইলেন। তাহাতে হিতে বিপরীত ফল ফলিল। নন্দকুমার কোম্পানীর রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধন জন্য জমীদারগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন বলিয়া হেষ্টিংস সন্দিহান হইলেন।

দেখিতে দেখিতে এক দিন সেই সন্দেহের অনল জ্বলিয়া উঠিল। নন্দকুমার সেদিন হেষ্টিংসের নিকট উপস্থিত হইয়া, নাটোর-রাজ্যের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত-সম্বন্ধে দুই একটী তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত করিলেন। মহারাণী ভবানীর জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত বাহিরবন্দর-পরগণা বিশেষ লাভের সম্পত্তি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। মহারাণী ভবানীর সেই সম্পত্তি অপহরণ করিয়া, হেষ্টিংস

আপন অনুগত ব্যক্তি কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে প্রদান করিতে মনস্থ করেন। মহারাজ নন্দকুমার তদ্বিষয়ে হেষ্টিংসের নিকট দরবার করিতে যান। দুই জনে অনেক ক্ষণ বাগবিতণ্ডা হয়। হেষ্টিংস বলেন,—"মহারাণী ভবানী স্ত্রীলোক। এত বড় বিস্তৃত জমীদারী শাসন করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশেষতঃ এখন তিনি তীর্থবাসে অবস্থিতি করিতেছেন। জমীদারী সুশাসিত হইবে না আশঙ্কা করিয়াই, আমি লোকনাথ নন্দীর হস্তে ঐ সম্পত্তির ভার অর্পণ করিব—মনস্থ করিয়াছি।"

নন্দকুমার উত্তর দেন,—"মহারাণী তীর্থ-বাসিনী হইলেও তাঁহার পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ এক্ষণে উপযুক্ত হইয়াছেন।"

হেষ্টিংস প্রতিবাদ করেন,—"রামকৃষ্ণ তরুণ-বয়স্ক যুবক মাত্র। অত বড় জমীদারীর কার্য্যভার বহন করা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।"

নন্দকুমার।—"কৃষ্ণকান্ত নন্দীর পুত্র লোকনাথই বা কি প্রকারে ঐ কার্য্য-পরিচালনায় সমর্থ হইবে? লোকনাথ—রামকৃষ্ণ অপেক্ষাও অল্পবয়স্ক।"

হেষ্টিংসের মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। হেষ্টিংস একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন,—"আপনার সহিত আমি সে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। আমি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহারই ব্যবস্থা করিব।"

নন্দকুমার, বিফল-মনোরথ হইয়া, হেষ্টিংসের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। হেষ্টিংস মনে মনে কহিলেন,—"নন্দকুমারের বড়ই দর্প হইয়াছে। এ দর্প চূর্ণ করিতে না পারিলে, বৃটিশ-রাজত্বের ভিত্তিভূমি দৃঢ় হইবে না।"

* * *

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### বৃথা-চেষ্টা।

"Vain, very vain, my weary search to find
That bliss which only centres in the mind."

—*Goldsmith.*

সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বাহিরবন্দর-পরগণা হস্তান্তরিত হইয়া গেল। লোকনাথ নন্দীর নামে হেষ্টিংস সেই পরগণা ইজারা বিলি করিলেন।

কুমার রামকৃষ্ণের নিকট যখন সেই সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল, সংসার-সমুদ্রের নূতন এক তরঙ্গাভিঘাতে তিনি আবার আহত হইলেন। দশভূজার মন্দিরে উপাসনায় বসিয়া, নেপথ্যে সন্ন্যাসীর তিরস্কার-বাণী শুনিয়া, তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল। সে চাঞ্চল্য এখনও দূর করিতে পারেন নাই; এমন সময়, তাঁহার বিশেষ আয়ের সম্পত্তি—বাহিরবন্দর পরগণা—হস্তস্খলিত হইল। রাজ-সংসারে প্রবেশ করিয়া, বিষয়ের ভাবনা কুমারকে বড় একটা ভাবিতে হয় নাই। এতদিন পর্য্যন্ত কুমার শুধুই বিলাসের, আনন্দের, সুখের, সৌভাগ্যের, লহরে লহরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে পথে সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র দুই একটা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেও, স্রোতোমুখে তৃণকণার ন্যায়, তাহা আপনিই সরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এবার যে অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাতে কুমারের জীবন-গতি অন্য পথে ফিরাইয়া দিবার প্রয়াস পাইল।

কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে কুমার কেবলই ভাবিতেছিলেন,—"কে সে সন্ন্যাসী ?—কে তিনি ? আমি দশভূজার মন্দির-মধ্যে নিভৃতে বসিয়া জপ করিতেছিলাম ; আমার অন্তরের কথা তিনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন ? আমার সুন্দরীকে কিরূপ রত্নালঙ্কারে সজ্জিত করিলে কিরূপ সুন্দর দেখায়,—আমি মনে মনে তাহা চিন্তা করিতেছিলাম ; কিন্তু তিনি কেমন করিয়া তাহা জানিতে পারিলেন ?"

ভাবিতে ভাবিতে, কত কথাই মনে পড়িতেছিল। মনে পড়িতেছিল,—'নেপথ্যে যে স্বর শুনিলেন, সে স্বর পূর্ব্বে যেন এক দিন শুনিয়াছিলেন !' মনে পড়িতেছিল,—'মন্দিরের পুরোহিত সেই সন্ন্যাসীর যেরূপ বেশ-ভূষার ও আকৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই আকৃতি, সেই বেশ-ভূষা, সেই সন্ন্যাসী—তিনি যেন পূর্ব্বে এক দিন দেখিয়াছিলেন।'

কিন্তু, কোথায় ?—কত দিন পূর্ব্বে ? কুমার তন্ন তন্ন করিয়া স্মৃতি-মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইলেন,—শৈশবের এক অপরূপ চিত্র। মনে হইল,—"এই সন্ন্যাসী, এইরূপ স্বরেই, তাঁহাকে এক দিন একটী পাখীর বন্ধন-মোচন করিতে বলিয়াছিলেন।"

যতই মনে পড়িতে লাগিল, যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, প্রাণ ততই উদাস হইয়া আসিল ;—মনে ততই নূতন চিন্তার উন্মেষ হইতে লাগিল,—"হায়! আমি কি করিলাম! বন্ধন-মোচন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আবার নূতন-বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম !" তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"দিনান্তের পর মুহূর্ত্ত-মাত্র একবার ইষ্টদেবের নাম জপ করিব। দুশ্চিন্তা !—

আর কি তোর সময় ছিল না! তুই আমার জপমালায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলি!”

কুমারের কিছুই ভাল লাগিল না। সুন্দরীর যে প্রেমের মালা তিনি সাধ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, সে মালা এখন বন্ধন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

এমন সময়েই বাহিরবন্দর-পরগণার দুঃসংবাদ আসিয়া চিত্তে আঘাত করিল।

তরঙ্গের উপর নূতন তরঙ্গ উত্থিত হইল। পারিষদগণ যতই বলাবলি করিতে লাগিলেন,—“আহা! এমন আয়ের সম্পত্তিটা হস্তান্তরিত হইল!”—কুমার ততই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—“আয়ের সম্পত্তি ছিল, হাত-ছাড়া হইল; কিন্তু আমি তার কি করিব?”

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর, কুমারের সহিত পরামর্শ করিতে আসিলেন; কিন্তু কুমারের তাহা ভাল লাগিল না।

ঠাকুর মহাশয় পরামর্শ দিলেন,—“স্বয়ং গিয়া এক বার হেষ্টিংসকে অনুরোধ করিলে ভাল হয়।” কিন্তু কুমার তাহাতে আস্থা প্রকাশ করিলেন না।

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—“রাজ্য অঙ্গহীন হইল। এ বিষয়ে কখনই নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে।”

কুমার উত্তর দিলেন,—“যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট!”

সে উত্তরে ঠাকুর মহাশয় মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন; একটু বিরক্তির ভাবেই কহিলেন,—“বাহিরবন্দর-পরগণা নাটোর-রাজ্যের মস্তক-স্বরূপ ছিল। সেই পরগণা কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতেছেন। তুমি একটু চেষ্টা করিবে না?

চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। একটু তদ্বির করিয়া দেখিতে হানি কি?”

কুমার কহিলেন,—“বিষয়-কর্ম্ম আমি কিছুই তো দেখি না! আমায় কেন আর ও বিষয়ে লিপ্ত করিতে চাহেন? আপনারাই সব করিতেছেন; যাহা ভাল হয়, আপনারাই করুন।”

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর একটু ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—“আমরাই সব করিতেছি! তুমি কিছুই জান না! ভাল, জিজ্ঞাসা করি—কাদিহাটী ও ভূষণা-পরগণার বন্দোবস্তের জন্য কালীশঙ্করকে কে পাঠাইয়াছিল? তুমি না কোনও কাজ-কর্ম্মে হস্তক্ষেপ কর না!”

কুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—“কেন, কালীশঙ্কর কি করিয়াছে?”

রুদ্রনারায়ণ।—“আবার কি করিবে! তাহার এখন পোঁয়া-বারো! সে আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে কি?”

কুমার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন,—“কেন, কি হইয়াছে?”

রুদ্রনারায়ণ।—“এক দিকে বাহিরবন্দর গেল, অন্য দিকে ভূষণাও যায়! বেশী আর কি হইবে?”

কুমার চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে কহিলেন,—“ভূষণাও যায়! ঠাকুর মহাশয় এ কি কথা বলেন!” প্রকাশ্যে কহিলেন,—“আপনি এ সংবাদ কিরূপে অবগত হইলেন?”

রুদ্রনারায়ণ।—“সেখান হইতে আমার একটী অনুগত লোক ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিল। তুমি যাহাকে বন্ধু ভাবিয়া,

বিশ্বাস করিয়া, আমার অজ্ঞাতসারে, কাদিহাটী ও ভূষণা পরগণায় শান্তিরক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলে; তোমার সেই বড় বিশ্বাসের পাত্র কালীশঙ্কর, আজ তোমারই গলায় ছুরি দিতে বসিয়াছে।"

রামকৃষ্ণ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"সে কি! সে কি বলেন!"

রুদ্রনারায়ণ।—"বলিব আর কি ছাই মাথামুণ্ডু! তোমার কালীশঙ্কর এখন তোমার সেই সম্পত্তিগুলি নিজের নামে পাকা করিয়া লইতেছে। তুমি তাহাকে পরগণায় পাঠানর পরই, সে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসে। এখন সে নাকি কোম্পানীর নিকট হইতে ঐ দুই পরগণার মালেকান-স্বত্ব লাভ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। বাহিরবন্দর—নাটোর-রাজ্যের মস্তক ছিল; হেষ্টিংসের চক্রান্তে আমরা সেই মস্তক-হারা হইলাম। ভূষণা ও কাদিহাটী পরগণা—নাটোর-রাজ্যের দুইটী পদ-স্বরূপ বিদ্যমান ছিল। বিশ্বাসঘাতক কালীশঙ্কর সেই পদদ্বয় ছেদন করিতে উদ্যত!"

কুমার বিস্ময়-সহকারে কহিলেন,—"কালীশঙ্কর এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিবে! আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই!"

রুদ্রনারায়ণ।—"আর মনে করা-করি কি? দুই দিন পরেই সব বুঝিতে পারিবে।"

কুমার।—"তবে এখন আপনি কি করিতে বলেন?"

রুদ্রনারায়ণ।—"নিজেকে কাজকর্ম্ম সব দেখিতে হইবে। কালীশঙ্করকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য পাইক পাঠাইতে হইবে। আজি এই মুহূর্ত্তেই সেই বন্দোবস্ত কর।"

কুমার সবিস্ময়ে কহিলেন,—"পাইক পাঠাইতে হইবে!"

রুদ্রনারায়ণ।—"পাঠাইতে হইবে কি?—আজই পাঠান প্রয়োজন। নহিলে, কুমার!—তুমি নিশ্চয় জানিও,—তোমার সোনার রাজত্ব ছারে-খারে যাইবে।"

কুমার পুনরায় কহিলেন,—"আজই পাঠাইতে হইবে!"

রুদ্রনারায়ণ।—"মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে।"

কুমার কহিলেন,—"আচ্ছা—কাল পাঠাইলে চলিবে না! আমি ডাকিয়া পাঠাইলে, সে কি আসিবে না! আমার মনে হয়, প্রথমে তাহাকে ডাকিয়া পাঠান যাউক। যদি আদেশ অমান্য করে, তখন উচিত ব্যবস্থা করা যাইবে।"

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর মনে মনে বড়ই রুষ্ট হইলেন; প্রকাশ্যে কহিলেন,—"এখনও তুমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে চাও? সে তোমার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে বসিয়াছে; সে যেরূপ কপটাচারী, সময় পাইলে সে হয় তো সতর্ক হইয়া যাইতে পারে। তখন আর তুমি তাহার কিছুই করিতে পারিবে না। শীঘ্র তাহাকে জব্দ করা বিশেষ প্রয়োজন।"

কুমার বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন।

"যাঁহারা নাটোর-রাজ্যের মস্তক-স্বরূপ বাহিরবন্দর-পরগণা অবাধে কাড়িয়া লইতেছেন, তাঁহাদের কিছুই করিতে পারিব না;—তাঁহাদের নিকট অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিতে যাইব! আর যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, সুদূর প্রান্তের সামান্য একটু ভু-খণ্ড অধিকার করিয়া লইয়াছে কি না—সন্দেহ; তাহাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রদান করিব! এ বড় কঠিন সমস্যা! এই কি সংসারের ন্যায়-বিচার!"

কুমার কহিলেন,—"আপনি যাহা বলিলেন, সকলই শুনিলাম,—সকলই বুঝিলাম। কিন্তু প্রার্থনা,—আজিকার রাত্রিটা আমায় বিবেচনা করিবার সময় দেন।"

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর, কুমারের মনোভাব বুঝিয়া, মনে মনে একটু হাসিলেন; মনে মনে কহিলেন,—"তবেই কুমার, তুমি রাজ্য-রক্ষা করিয়াছ।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমার যখন একান্তই ইচ্ছা, আজ এ মীমাংসা স্থগিত থাক। কিন্তু আমার দুইটী কথাই তুমি বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিবে। প্রথম কথা,—হেষ্টিংসকে হস্তগত করিবার চেষ্টা; দ্বিতীয় কথা,—কালীশঙ্করকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা। দেখ' কুমার!—যেন চিন্তায় কাল-বিলম্ব না হয়। বিলম্বে বহু বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।"

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

* * *

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### কি ভীষণ!

"————O ye powers that search
The heart of man, and weigh his inmost thought,
If I have done amiss, impute it not,
The best may err, but you are good."

—*Addision.*

কুমারের চিত্তে চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে, এমন কি পূজা-আহ্নিকের সময় পর্য্যন্ত, সকল অবস্থাতেই, কুমার চঞ্চলচিত্ত শান্তিহারা হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যা-বন্দনায় বসিলেন; চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। "সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সাম-বেদসমাযুতাম্"—এই ধ্যান-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মন্ত্র-কথিত মূর্ত্তি চিন্তা করিতে গেলেন; কিন্তু সে মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিভাত হইল না। পরন্তু কত অবান্তর চিত্র আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

কুমার হৃদয়ে দেবীর পাদপদ্ম প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইলেন; মনে পড়িল—বাহিরবন্দর-পরগণার বিষয়, মনে পড়িল—হেষ্টিংস ও লোকনাথ নন্দীর বিচিত্র-চরিত্র-কথা। কুমার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, মায়ের চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন; মনে হইল, কে যেন বলিতেছেন,—'হেষ্টিংসের তুষ্টি-সম্পাদনে বদ্ধাঞ্জলি হও।' কুমার, হস্তে জলগণ্ডুষ গ্রহণ করিয়া,

বিসর্জ্জনের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গেলেন ; কে যেন কাণে কাণে আসিয়া বলিল,—'কালীশঙ্করকে বাঁধিয়া আন।' কখনও মনে পড়িতে লাগিল,—হেষ্টিংসের অবিচার ! কখনও মনে পড়িতে লাগিল,—কালীশঙ্করের বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

নীরব প্রকোষ্ঠে নিভৃতে বসিয়া এক-মনে মহামায়ার আরাধনা করিবেন ;—কিন্তু জগতের যত গণ্ডগোল, যত কোলাহল, কুমারকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসীর তিরস্কারের কথা পুনরায় মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। সেদিন সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন ; আজ বিষয়ের ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িলেন। দুই অবস্থাই সমতুল্য। সুতরাং এই চিন্তাতেও সন্ন্যাসীর চিত্রই মনোমধ্যে প্রকট করিয়া তুলিল।

বহু চেষ্টায় সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া, কুমার অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানেও চিত্ত স্থির হইল না। যে সুন্দরীর সহিত মধুর আলাপে রাত্রি নিমেষের ন্যায় কাটিয়া যাইত ; যে সুন্দরীর মুখের পানে তৃষিত চাতকের ন্যায় চাহিতে চাহিতে কুমার সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন ; যে সুন্দরীর বাক্যের লহরে লহরে কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিত ; যে সুন্দরীর রূপ-সুধা পান করিতে করিতে পিপাসার নিবৃত্তি হইত না ; আজি সেই সুন্দরীর প্রতিও মন তাদৃশ আকৃষ্ট হইল না। শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আজ যেন কুমারের দেহ-মন অবসন্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দুই-চারিটী মাত্র কথা কহিয়াই "শরীর ভাল নহে" বলিয়া কুমার শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। শরীর অসুস্থ বুঝিয়া, চিন্তিতা হইয়া, সুন্দরী, কুমারের চরণ-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই কুমারের তন্দ্রা আসিল।

তন্দ্রাঘোরে কুমারের মনে হইতে লাগিল,—"সংসার কি ভীষণ! তবে কি অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শান্তি পাইব?"

স্বপ্ন দেখিলেন,—'অরণ্য প্রকৃতির কি রম্য-নিকেতন! বৃক্ষের পর বৃক্ষ—অনন্ত বৃক্ষশ্রেণী সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। উপরে সূর্য্যরশ্মি ঝিকিমিকি খেলিতেছে। পথপ্রান্তে শ্রান্ত-প্রাণী শান্ত-ছায়া উপভোগ করিতেছে। কত লতাকুঞ্জ গুল্মপুঞ্জ—শ্বেত-পীত-নীল-লোহিত নানা রঙ্গে অনুরঞ্জিত রহিয়াছে,—প্রকৃতি পুষ্প-স্তবকে তাহাদিগকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। মধ্যস্থলে কিবা মনোহর শ্যামল ভূমি,—পদপ্রান্ত বাহিয়া স্রোতস্বিনী কুলুকুলু গাহিতেছে! মরি-মরি কি প্রশান্ত ভাব!'

কে যেন বলিয়া গেল,—'এই বনে, প্রবাহিণীর পবিত্র তীরে, মহর্ষির পুণ্যময় আশ্রম ছিল।'

কুমার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

"কৈ,—আজি তো তাহার চিহ্ন-মাত্রও খুঁজিয়া পাইতেছি না! কোথা সে ভগ্ন-কুটীর-খানি,—যেখানে বসিয়া ঋষি ইষ্টনাম জপ করিতেন! কোথা তাঁহার পদ্মাসন,—যে আসনে অনুধ্যান আনিয়া দিত! কেহ বলিতে পার কি—কোথায় সেই স্থান! সেখানে বসিয়া আমি চিত্ত-স্থির করিবার চেষ্টা পাইব।'

কে যেন উত্তর দিল,—'বাতুল! যুগ-যুগান্ত বহিয়া গেল, অণু পরমাণুতে বিলীন হইল; এখন সে সংবাদ কোথায় পাইবে? ঐ দেখ—নদী-প্রবাহে নিত্য-নূতন সৈকত-ভূমি ভাঙ্গিতেছে—গড়িতেছে! ঐ দেখ—বিশাল বট-বৃক্ষ জটা বিস্তার করিয়া ক্রোশদ্বয় বেড়িয়া লইয়াছে! এখানে কোথায় ঋষির আশ্রম ছিল,—কে নির্ণয় করিবে?'

সহসা বল্মীক-স্তূপের প্রতি কুমারের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। ‘একি !—বল্মীক-স্তূপ-মধ্যে স্ফটিক-মণি কি প্রকারে প্রস্ফুট হইল ? দেখি দেখি !—হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখি,—এ মণি কোথা হইতে আসিল ! একি !—বল্মীক-স্তূপ মধ্যে কেন অনুশোচনার স্বর উঠিল ? এ কি তবে মৃত্তিকা-গ্রথিত জড়বস্তু নহে ? এ কি তবে প্রাণভূত প্রোথিত মনুষ্য-দেহ ? তাই তো—তাই তো—কি দেখিলাম ! সেই ঋষি, যুগ-যুগান্তের পরও, বল্মীক হইয়া জমিয়া আছেন ! তবু তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয় নাই !—তবু তাঁর একাগ্রতা নষ্ট হয় নাই ! কিন্তু এই পাপীর স্পর্শ-মাত্র তাঁহার একাগ্রতা ভঙ্গ হইল !’

কুমার বিচলিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল,—তিনি কি অপকর্ম্মই করিয়া বসিয়াছেন ! তাই সেই বল্মীক-স্তূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুক্তকরে বিনীতস্বরে কহিতে লাগিলেন,—‘হে ঋষি ! আমার পাপকর-স্পর্শে তোমার ধ্যানভঙ্গ হইল ! তোমার চরণে ধরি, আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর। আর দেবতা, দয়াময় তোমরা, তোমাদের একাগ্রতার কণামাত্র আমাকে দান কর ; সংসার-কীট আমি, কৃপায় তরিয়া যাই।’

বলিতে বলিতে, দরদরধারে কুমারের নয়নে অশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। প্রাণের ভিতর যে চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, সেই তরঙ্গাভিঘাতে এইবার যেন হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কুমার কাতর-কণ্ঠে মিনতি-সহকারে কহিলেন,—‘প্রভু ! দয়াময় ! আমায় রক্ষা কর।’

‘বাতুল ! কোথায় প্রভু—কোথায় দয়াময় ! কে তোমাকে রক্ষা করিবে ?’

বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া যেন গম্ভীর-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—'এখানে কে আছেন—কে তোমাকে রক্ষা করিবেন? এই চলচ্ছক্তিহীন তরুগুল্মলতা, অথবা ঐ মূক মৃত্তিকা-স্তূপ?'

কুমার সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন,—'সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী সম্মুখে দণ্ডায়মান! দিব্য কান্তি, নধর দেহ, গৌর বরণ, গৈরিক বসন, বিভূতি-ভূষণ, বৃহজ্জটাজূট-সমন্বিত,—কে এ মহাপুরুষ!'

'কে এ মহাপুরুষ! এই জনশূন্য ভীষণ অরণ্যে সহসা কোথা হইতে ইহাঁর আবির্ভাব হইল! ইনিই কি আমার অভীষ্ট দেবতা?—ইনি কি আমার শান্তিহারা-প্রাণে শান্তিদান করিতে আসিয়াছেন?'

কুমার সন্ন্যাসীর চরণতলে আত্ম-সমর্পণে উৎসুক হইলেন; ব্যাকুল-প্রাণে কহিলেন,—'আপনিই কি আমার অভীষ্ট দেবতা? যদি আসিয়াছেন, চরণে স্থান-দান করুন।'

কুমার সন্ন্যাসীর চরণ-ধারণে অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী সরিয়া দাঁড়াইলেন; বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি চাও?"

কুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; কুমার উত্তর দিতে পারিলেন না।

'তুমি কি চাও? এই জনশূন্য অরণ্যে তুমি শান্তি অন্বেষণ করিতে আসিয়াছ? এখানে আসিয়া তোমার চিন্তা-কলুষিত চিত্তের স্থৈর্য্য-সম্পাদন করিতে চাও?'

সন্ন্যাসী কি অন্তর্য্যামী? তিনি কি অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া নিগূঢ় স্থানসমূহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন?

কুমার কহিলেন,—'অন্তর্য্যামিন্! আমার অন্তরের কথাই আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। এখন বলুন,—আমার উপায় কি?

বলুন—এই শান্তিহারা প্রাণে—এই হৃদয়-মরুভূমি-মাঝে—শান্তির নির্ঝর কিরূপে পাই?'

সন্ন্যাসী বিরক্তির স্বরে কহিলেন—'বাতুল! আপন হৃদয়ে আপনি শান্তিকণা সঞ্চার করিতে পার নাই; অপরে শান্তিধারা ঢালিয়া দিবে! ভিক্ষালব্ধ জলগণ্ডূষে মরুভূমির উত্তপ্ত অনন্ত বালুকারাশি স্নিগ্ধ হয় কি?'

কুমার ব্যাকুলতা-প্রকাশে কহিলেন,—'তবে উপায় কি? যদি দর্শন দিয়াছেন, উপায় বলিয়া দেন।'

কুমার আবার সন্ন্যাসীর চরণ-ধারণে অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী পুনরায় পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। কুমার তাঁহাকে ধরিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আর দেখিতে পাইলেন না। সন্ন্যাসী আপনা-আপনিই অদৃশ্য হইয়া গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে কুমার শুনিতে পাইলেন, যেন আকাশ-বাণী হইল,—'কুমার! যদি শান্তি পাইতে চাও, বন্ধন-মোচনের চেষ্টা কর।'

সেই স্বর! সেই সন্ন্যাসী! স্বপ্নেও তিনি! কুমার আতি-পাতি করিয়া সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে গেলেন। কিন্তু কৈ—কোথায় তিনি? অরণ্য-মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

কুমার চকিত-নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—অরণ্য কি ভীষণ!

সে-যে জন-সমাগম-পরিশূন্য শ্বাপদ-সঙ্কুল মহারণ্য! ঐ শুন—সিংহ গর্জ্জিতেছে! ঐ দেখ—কুরঙ্গ দৌড়িতেছে! ও কি অজগর?—ও যে পাহাড়-পর্ব্বতের মত পড়িয়া রহিয়াছে! ও কি আবার?—অত বড় প্রকাণ্ড বন্য-মহিষ অবাধে গলাধঃকরণ করিল! বায়ুভরে বৃক্ষ-শাখা নড়িল; মর্ম্মর শব্দ হইল; পশুপক্ষী

প্রাণভয়ে পলাইয়া, বনান্তরে আশ্রয় লইতে ছুটিল! অরণ্য কি ভীষণ!

কুমার আতঙ্কে চমকিয়া উঠিলেন। আতঙ্কে কুমারের তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। আতঙ্কে কুমার শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

পতির পদসেবা করিতে করিতে সুন্দরী পতির পদতলে নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বপ্ন দেখিয়া, কুমার যখন চমকিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার অঙ্গ-সঞ্চালনে পালঙ্ক কাঁপিয়া উঠিল। নিদ্রাভঙ্গে সুন্দরীও কাঁপিয়া উঠিলেন।

কুমার একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"সুন্দরি! ভয় পাইয়াছ?"

সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হঠাৎ কেন আপনার নিদ্রাভঙ্গ হইল? আপনি কেন এমন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন?"

কুমার।—"না—না, তেমন কিছু নয়।"

সুন্দরীর কিন্তু সংশয় দূর হইল না। তাঁহার মনে হইল,—'কুমার যেন কোনও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন।' তাই কহিলেন,—"আপনি কি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন?"

কুমারের মনে হইল,—'সুন্দরী বুঝি সকল কথাই জানিতে পারিয়াছে!' কুমারের মনে হইল,—'তিনি স্বপ্নঘোরে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, সুন্দরী বোধ হয় সকলই শুনিতে পাইয়াছে।'

কুমার কহিলেন,—"সে অনেক কথা! কাল সে সব কথা তোমায় খুলিয়া বলিব। রাত্রি অনেক হইয়াছে; মন চঞ্চল হইয়াছে; এস, এখন নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করি।"

সুন্দরী কৌতুহলাক্রান্ত হইলেও, পাছে পতির কষ্ট হয়—এই আশঙ্কায়, আর কোনও নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন না। কিন্তু কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"সে অনেক কথা! কি কথা?"

কুমারও আর উত্তর দিলেন না; সুন্দরীও আর জিজ্ঞাসা করিলেন না। অল্পক্ষণ পরেই সুন্দরী নিদ্রিতা হইলেন।

দুশ্চিন্তায় কুমারের আর নিদ্রা হইল না। কুমার এক এক বার শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। এক এক বার হর্ম্ম্যতলে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক এক বার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। এক এক বার নিদ্রাভিভূতা সুন্দরীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এক এক বার কুমারের মনে হইল,—"সংসার এত ভয়ানক! যাহাকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিলাম, সেই আমার গলায় ছুরি বসাইতে প্রস্তুত হইল! চারিদিকেই চক্রান্ত!—চারিদিকেই প্রতারণার জাল বিস্তৃত! সংসার কি ভীষণ!"

কুমার স্থির করিলেন,—"সুখ সংসারের কোথাও নাই! শান্তি সংসারের কোথাও নাই! সংসার কেবলই আমায় দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছে; আর দিন দিন আমি সেই বন্ধনে অস্থির হইয়া পড়িতেছি।"

কুমার বুঝিলেন,—সন্ন্যাসী সত্য বলিয়াছেন,—'বন্ধনই কষ্টের মূল; বন্ধন-ছেদনই শান্তি—বন্ধন-ছেদনই সুখ!'

কুমারের আবার মনে হইল,—"আমি এখনও কি এ বন্ধন ছেদন করিতে পারিব না?"

* * *

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### উদ্বেগ।

"I would lose all, ay sacrifice them all
——————, to deliver you."

—*Shakspeare.*

বাহিরবন্দর-পরগণার জন্য নাটোর-রাজসংসার যখন উদ্বেলিত, মহারাজ নন্দকুমারের নিদারুণ বিপদের সংবাদ রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। 'স্বপ্ন-দর্শনে কুমার যখন চিন্তাকুলিত চিত্ত, রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর একখানি আবেদন-পত্রে তাঁহার স্বাক্ষর করাইতে আসিলেন।

সেই আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিতে গিয়া কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের আবেদন-পত্র?"

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"বড় বিপদের সংবাদ। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।"

কুমার সবিস্ময়ে কহিলেন,—"বলেন কি! ফাঁসির হুকুম?"

রুদ্রনারায়ণ।—"আমিও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু এই দেখ, আমার পিতৃদেব কি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি পাঠ করিলে প্রাণ বিগলিত হয়।"

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর পত্রখানি কুমারের হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রের মর্ম্ম—চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"মহারাজ নন্দকুমার কোনক্রমেই নিষ্কৃতি পাইলেন না। কলিকাতার 'সুপ্রিম

কোর্ট' তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। প্রধান বিচারপতি 'ইম্পে' নন্দকুমারের পক্ষের কোনও কথাই গ্রাহ্য করেন নাই। ৫ই আগষ্ট তাঁহার ফাঁসির দিন স্থির হইয়াছে। এ কয় দিন মহারাজ কলিকাতার কারাগারে আবদ্ধ আছেন। ইংলণ্ডে রাজার নিকট তাঁহার প্রাণ-ভিক্ষার নিমিত্ত আবেদন করিতে হইবে। আবেদনের উত্তর আসা পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখার জন্য নবাব মোবারক-উদ্দৌলা কলিকাতার কাউন্সিল-সভায় অনুরোধ-পত্র পাঠাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড—ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন। সুতরাং তাঁহার প্রাণ-রক্ষার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিতে হইবে।"

প্রাণ-দণ্ড হইবে? মহারাজ এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রাণ-দণ্ড হইবে?

কুমার কহিলেন,—"আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; মহারাজ এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে?"

রুদ্রনারায়ণ।—"সেই বুলাকি দাসের দলিলের মকদ্দমা।"

কুমার।—"আমি তো শুনিয়াছিলাম, বুলাকি দাসের নিকট মহারাজ নন্দকুমার মুক্তার মালা প্রভৃতি কয়েকটি মূল্যবান্ দ্রব্য বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন। আটচল্লিশ হাজার একুশ টাকা—সে গুলির দাম ধার্য্য হইয়াছিল। ইংরেজদিগের সহিত মীরকাসেমের মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনায়, লুণ্ঠন ও দস্যুতার সময়, বুলাকি দাসের বাড়ী লুণ্ঠিত হয়। প্রকাশ এই,—সেই লুণ্ঠন-ব্যাপারে নন্দকুমারের মুক্তার মালা প্রভৃতিও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। নন্দকুমার যখন বুলাকি দাসকে সেই বিক্রেয় দ্রব্যগুলি প্রত্যর্পণ করিতে

বলেন; সেগুলি অপহৃত হইয়াছে বলিয়া, বুলাকি দাস তাঁহাকে টাকার জন্য একখানি খত লিখিয়া দেয়। সে খত জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল কেন?"

রুদ্রনারায়ণ।—"সে অনেক কথা। সেই খতের দরুণ সুদে-আসলে বুলাকি দাসের নিকট নন্দকুমারের তুই লক্ষ টাকা পাওনা হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সহিত বুলাকি দাসের দেনা-পাওনা ছিল নন্দকুমারের ঋণ-পরিশোধের জন্য, বুলাকি দাস ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নিকট বরাত দিয়া যান। বুলাকি দাস প্রদত্ত দলিলের বলে, নন্দকুমার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লন। সেই দলিল এখন জাল সাব্যস্ত হইল!"

কুমার।—"মহারাজ যদি জাল-করা অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হন, প্রাণদণ্ড হইবে কেন?"

রুদ্রনারায়ণ।—"ইংলণ্ডের আইনে, জাল করা অপরাধে প্রাণদণ্ড হয়। বুলাকি দাসের নিকট মহারাজ যে খত লিখাইয়া লইয়াছিলেন, বিচারপতি ইম্পে সেখানিকে জাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহারা এক সময়ে নন্দকুমারের অনুগ্রহ-ভিখারী ছিল;—এমন কি, এক সময়ে যাহারা তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল;—তাহারাও এখন তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে।"

কুমারের সহচর অনুপনারায়ণ পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। কথায় কথায় তিনি কহিলেন,—"হেষ্টিংসের সহিত মহারাজের বিবাদ করাটা ভাল হয় নাই। হেষ্টিংস—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর গবরণর—প্রবল প্রতাপশালী; তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়াই নন্দকুমারের এই বিপদ ঘটিল।"

রুদ্রনারায়ণ।—'নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া-

ছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অহিত-জনক কোনও কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হয় না। হেষ্টিংসের নানাবিধ অপকর্ম্মের বিষয় জানিতে পারিয়া, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কাউন্সিলের সদস্যগণ নন্দকুমারের নিকট তাহার অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। তাহাতে নন্দকুমার, হেষ্টিংসের কার্য্য-কলাপের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন।"

কুমার।—"সে কার্য্যটা মহারাজের উচিত হয় নাই।"

রুদ্রনারায়ণ।—"অনুচিত কার্য্যই বা কেমন করিয়া বলিতে পারি? হয় তো মহারাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন! ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে জনসাধারণ পাছে তৎপ্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়, হয় তো সেজন্যও তিনি অত্যাচার নিবারণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।"

অনুপনারায়ণ ধীরে ধীরে কহিলেন,—"ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর শুভাকাঙ্ক্ষার পরিচয়, মহারাজের কোনও কাজেই দেখিতে পাই না। নবাব মীরজাফরের পক্ষ অবলম্বনে, ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে, তিনি ফরাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।"

রুদ্রনারায়ণ।—"সে কথা শুনিতে পাই বটে; কিন্তু তাহাতে মহারাজের প্রভুপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজ তখন মীরজাফরের অন্নে প্রতিপালিত হইতেন। সুতরাং মীরজাফরের হিতসাধন-পক্ষে তিনি যে চেষ্টা করিবেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে।"

অনুপনারায়ণ।—"কিন্তু হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মহারাজের ষড়যন্ত্র, তাঁহার অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। ভান্‌সিটার্ট নবাব-সংসার হইতে নন্দকুমারের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু হেষ্টিংসের অনুকম্পায় মহারাজ পুনরায় নবাব-সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মহারাজের পুত্র গুরুদাস, নবাব মোবারক-উদ্দৌলার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন;—সে কি হেষ্টিংসের অনুগ্রহ নহে?"

রুদ্রনারায়ণ।—"অনুপ! তুমি শোন নাই কি—সে রহস্য এখন প্রকাশ পাইয়াছে! মণি বেগমকে নবাবের অভিভাবিকা নিয়োগের জন্য এবং গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান-পদে অধিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে, মহারাজের নিকট হইতে হেষ্টিংস কত টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন,—শুনিয়াছ কি? আমি বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি, ঐ বাবদ দফায় দফায় হেষ্টিংস তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার এক শত পাঁচ টাকা লইয়াছিলেন।"

অনুপনারায়ণ।—"হেষ্টিংসের এ দোষটা প্রায় শুনা যায়। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচাঁদের পত্নীর প্রতি এবং কাশীনরেশ চৈৎসিংহের প্রতি তাঁহার অত্যাচার-সম্বন্ধে নানা অভিযোগের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির এ সকল বিষয়ে লিপ্ত না থাকাই উচিত ছিল।"

রুদ্রনারায়ণ।—"সে কথা আমিও স্বীকার করি। জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ কখনই বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।"

কুমার রামকৃষ্ণ এ কথার অনুমোদন করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ নন্দকুমারকে আপনি কূটরাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করিতেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি এরূপ হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইলেন,—ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

রুদ্রনারায়ণ।—"আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাহা শুভসঙ্কল্পপ্রণোদিত। ইতিপূর্ব্বে নন্দকুমারের

সহিত অনেক বার আমার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু সে দিন মুর্শিদাবাদে গিয়া তাঁহার যে ভাব দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহাকে যেন নূতন মানুষ বলিয়া মনে হইয়াছিল।”

কুমার কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি ভাব দেখিলেন ?”

রুদ্রনারায়ণ।—“দেখিলাম, মহারাজ নন্দকুমার গোপালের মন্দিরে প্রণাম করিতেছেন ; প্রণাম করিতে করিতে বলিতেছেন,—‘নারায়ণ ! আমায় সুমতি দাও, আমি যেন আর সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট না হই ?’ তিনি কেবল তন্ময়-চিত্তে ডাকিতেছেন,—‘হে ভগবন্ ! হে শ্রীহরি। আমি যেন আর সত্যভ্রষ্ট না হই।’ মহারাজ নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, আমি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলাম। কিন্তু আমি যে সেখানে উপস্থিত হইয়াছি, মহারাজ তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি এতই তন্ময়-চিত্তে গোপালের আরাধনা করিতেছিলেন।”

কুমার মনে মনে কহিলেন,—“এ তন্ময়তা আমার চিত্তে আসিল না কেন ? হে ভগবন্ !—তোমায় ডাকিতে ডাকিতে, আমার চিত্ত কেন বিষয়-চিন্তায় প্রধাবিত হয় ?”

অনুপনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, মহারাজ নন্দকুমার কি বলিলেন ?”

রুদ্রনারায়ণ।—“তিনি ঐ সকল কথাই আমায় বলিলেন। বলিলেন—হেষ্টিংসের সহিত মনোমালিন্যের বিষয় ; বলিলেন—‘অদৃষ্টে যাহা আছে, হইবে ; কিন্তু কদাচ আর সত্যভ্রষ্ট হইব না।’ শেষ বলিলেন,—‘জানি-না অদৃষ্টে কি আছে !’

মহারাজ নন্দকুমারের সেই শেষ-বাণী এখনও যেন আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। হেষ্টিংসের সহিত বিরোধের শেষ-ফল এই হইবে বলিয়াই কি তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন? হায়!—মহারাজ নন্দকুমারের এই পরিণাম হইল!"

কুমার কহিলেন,—"কোনপ্রকারে কি তাঁহার প্রাণরক্ষা সম্ভবপর নহে?"

রুদ্রনারায়ণ।—"সেইজন্যই তো এই আবেদন-পত্র প্রস্তুত হইয়াছে।"

কুমার।—"আবেদনে কি ফল লাভ হইবে? হেষ্টিংসের চরিত্রের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি, তাঁহাকে বিপুল অর্থ প্রদান করিতে পারিলে, হয় তো মহারাজের প্রাণরক্ষা হইতে পারে।"

এই বলিয়াই কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত টাকা পাইলে হেষ্টিংস নন্দকুমারের মুক্তিদান করিতে পারেন?"

মহারাজ নন্দকুমারের জন্য কুমার রামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা দর্শনে, অনুপনারায়ণ কহিলেন,—"যদি অর্থ দিলে প্রাণরক্ষা হয়, আপনি কি সেই অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন? আপনি কি জানেন না,—মহারাজ নন্দকুমার কতপ্রকারে নাটোর-রাজ্যের সর্ব্বনাশ-সাধনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন?"

অনুপনারায়ণের প্রশ্নে কুমার বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিয়া, রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া, কুমার কহিলেন,—"গুরুদেব! মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণরক্ষার জন্য হেষ্টিংসের তুষ্টি-সাধন করিতে পারি,—আমার সম্পত্তির কি সেরূপ মূল্য হইবে না? ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য যদি আমায় ভিখারী হইতে হয়, আমি আনন্দের সহিত তাহাতে

প্রস্তুত আছি। আমার প্রার্থনা,—যে কোনও প্রকারে পারেন, আমাদের সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও যদি মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণরক্ষা হয়, সে পক্ষে চেষ্টা করুন।”

রুদ্রনারায়ণ মনে মনে কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মনে মনে কহিলেন,—“তুমিই মহারাণী ভবানীর উপযুক্ত বংশধর।” মনে মনে কহিলেন,—“সেদিন বাহিরবন্দর-পরগণা হারাইয়াছ; তাহাতেও বিচলিত নহ। আজ আবার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। তোমার এমন মন—এমন হৃদয়! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজর্ষির আসন প্রাপ্ত হও।”

কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন,—“ভাল, আমি সন্ধান লইয়া দেখিতেছি। আমাদের অর্থ-সামর্থ্যে যতদূর যাহা হইতে পারে, চেষ্টার ত্রুটি করিব না।”

কুমার সেই দণ্ডেই আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। পুনঃ পুনঃ রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়া কহিলেন,—“আমার সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও যদি ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করিতে পারেন, পরাঙ্মুখ হইবেন না।”

* * *

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### গুপ্ত-মন্ত্রণা।

"——O conspiracy,
Sham'st thou to show thy dangerous brow by night,
When evils are most free——"

——*Shakspeare.*

আজ অনেক ক্ষণ ধরিয়া পণ্ডিতার সহিত শঙ্করের পরামর্শ চলিতেছে।

গভীর অরণ্য। দিবাভাগেই অরণ্যের অনেক স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। কোন্ পথে, কি প্রকারে, সেই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায়,—অপরের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সেই গভীর অরণ্যে যে মনুষ্যের গতিবিধি আছে, অরণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুতেই তাহা উপলব্ধি হয় না।

এই নিবিড় অরণ্যে, একটী বৃক্ষতলে বসিয়া, শঙ্কর ও পণ্ডিতা পরামর্শ করিতেছে।

শঙ্কর কহিল,—"আমি ঠিক সন্ধান পাইয়াছি। আগামী রামনবমীর দিন, রামকৃষ্ণ, ভবানীর মন্দিরে গমন করিবে। সেই দিন ভবানীর সমস্ত অলঙ্কার-পত্র মন্দিরে রক্ষিত হইবে। রামকৃষ্ণের সঙ্গেও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার থাকিবে। তাহার যাহা কিছু মূল্যবান্ অলঙ্কার-পত্র আছে, সমস্তই সে সঙ্গে লইয়া যাইবে। তিন মাস ভবানী-মন্দিরে অবস্থানের কথা আছে। হয় তো বেশী দিনও থাকিতে পারে। সুতরাং মূল্যবান সামগ্রী কিছুই সে এবার নাটোরে রাখিয়া যাইবে না।"

পণ্ডিতা।—"মহারাজ তিন মাস ভবানী-মন্দিরে অবস্থান করিবেন। তবে এত তাড়াতাড়ি রামনবমীর দিন মন্দির আক্রমণ করার কি প্রয়োজন?"

শঙ্কর মনে মনে কহিল,—"ঐ দিনই মায়ের বলির প্রশস্ত দিন। ঐ দিন মন্দির-প্রাঙ্গণ শত শত ছাগ-মেষ-মহিষের রক্ত-স্রোতে পরিপ্লাবিত হইবে। ঐ দিন মা একটী নরবলি গ্রহণ করিবেন না?" প্রকাশ্যে বলিল,—"ঐ দিন পুরীরক্ষক প্রহরিগণ পূজা-উৎসবে উন্মত্ত থাকিবে। সহসা আমরা পুরী আক্রমণ করিলে, তাহারা বাধা দিতে পারিবে না। যখন তাহারা নিরস্ত্র থাকিবে, সেই কি আক্রমণের উপযুক্ত সময় নহে?"

পণ্ডিতা।—"মায়ের পূজার দিনে মায়ের মন্দির লুণ্ঠন করিব! তাই আমার একটু সঙ্কোচ হইতেছে।"

শঙ্কর।—"মায়ের মন্দির কি কখনও লুণ্ঠিত হয় রে পাগল! মা যে সর্ব্বব্যাপিনী! সেও মায়ের মন্দির, আমাদের এই ভগ্ন-কুটীরখানিও মায়ের মন্দির। মা কি অভিন্ন রে? সে মন্দির হইতে আনিয়া এ মন্দিরে রাখিব, সে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এই মূর্ত্তিকে সাজাইব,—ইহাতে দ্বিধা ভাবিস্ কেন?"

পণ্ডিতা।—"মা যদি একই হন, তবে সেখান হইতে এখানে লইয়া আসার প্রয়োজন কি?"

শঙ্কর।—"পণ্ডিতা!—এটুকুও বুঝিলি না রে! এত দিনে এ তত্ত্বটুকুও হৃদয়ঙ্গম হইল না? রামকৃষ্ণ—ঘোর পাষাণ্ড। তাহার হস্তে ঐ অতুল সম্পত্তি ন্যস্ত থাকায়, অত্যাচারের প্রশ্রয় পাইতেছে। তুই কি জানিস্ না, যে পাষণ্ড রাজস্বের জন্য দরিদ্রের উপর কিরূপ পীড়ন করিয়া থাকে! তাহার কিসের অভাব? তবে

সে কেন অত্যাচার করে? সেই জন্যই তো তার প্রতি আমার এত ঘৃণা! তার আয়ের কণামাত্রও সে যদি সদ্ব্যয় করিত!"

পণ্ডিতা।—"তাঁহার কি কোনই সদ্ব্যয় নাই?"

শঙ্কর।—"একটুও না। যা কিছু করে, স্বার্থের জন্য। আমি কি সহজে তাহার প্রসাদ লুণ্ঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছি! এখনও বুঝিতেছিস্ না—পণ্ডিতা; কিন্তু যেদিন তুই তার কার্য্যকলাপের পরিচয় পাইবি, তোর সব ভ্রম দূর হইয়া যাইবে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার এক বিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে। তুই আমার কথা শোন্—একটুও সংশয় করিস্ না। এই কার্য্যে ধর্ম্ম ও অর্থ—উভয় ফল লাভ হইবে।"

পণ্ডিতা।—"আপনাকে যখন গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, আপনি যাহা বলিবেন—তাহাই শিরোধার্য্য। তবে আমাদের এই অল্প লোকে মহারাজ রামকৃষ্ণের প্রাসাদ লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবে কি?"

শঙ্কর।—"সে বিষয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাক্। যদি নাটোর লুণ্ঠন করার প্রয়োজন হয়, আমাদের অধিক লোকের আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু ভবানীপুরের মন্দিরে, তুলনায় কয় জন লোক আছে? আমরা এই পাঁচ শত ডাকাইত,—যদি এক বার হুঙ্কার করিয়া ভবানীর মন্দির ঘেরিয়া ফেলি, কার সাধ্য বাধা দেয়! তুই একটুও ভাবিস্ না। দলে এখন যে লোক আছে, তাহাই যথেষ্ট।"

পণ্ডিতা।—"তবে আমি দল-বল ঠিক করিবার ব্যবস্থা করি। ভবানীপুরের পশ্চিম-প্রান্তে যে জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলে আমাদের 'ঘাটি' হইবে। সেখানে ক্রমে ক্রমে দল-বল সংগ্রহ করিব। তার পর যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে পুরী আক্রমণ করা যাইবে"

অরণ্য-মধ্যস্থ ভগ্ন-অট্টালিকা।

*Printed by K. V. Seyne & Bros.*

সেই পরামর্শই স্থির হইল। পণ্ডিতা দল-বল সুসজ্জিত করিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। শঙ্কর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—"এই বার শেষ চেষ্টা! রামকৃষ্ণ!—শৈশবে তুই আমার খেলার সাথী ছিলি। একটী ফল পেলে আমরা দু'জনে ভাগ ক'রে খেতাম। কিন্তু তুই এখন অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বর; আমি কি অবস্থায় আছি, আমার প্রতি তুই এক বার ফিরেও চাইলি-নে? তুই যখন রাজপদে অধিষ্ঠিত হ'লি, আমি বড় মুখ ক'রে তোর কাছে অর্দ্ধেক রাজত্ব ভিক্ষা চেয়েছিলাম। কিন্তু তুই কি-না আমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত কর্‌লি না! তোর ঠাকুর মহাশয়—সে কি-না আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলে! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—সে অপমানের প্রতিশোধ লইবই লইব।"

পণ্ডিতা ও শঙ্কর যেখানে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল, তাহার অনতিদূরে, সেই অরণ্যের মধ্যে, একটী শীর্ণকায়া খরস্রোতা তটিনীর তীরে, এক বৃহৎ ভগ্ন-অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। এমন গভীর অরণ্যের মধ্যে সেই অট্টালিকার অবস্থান যে, সে অঞ্চলের অপর কেহ সেই অট্টালিকার বিষয় অবগত ছিল না। দস্যুগণ ঐ অট্টালিকাকে আপনাদের দস্যু-রাজত্বের দুর্গ-রূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল।

পণ্ডিতা প্রস্থান করিলে, তাহার কয়েক দণ্ড পরে, শঙ্কর সেই অট্টালিকা-অভিমুখে অগ্রসর হইল। এক জন দস্যু, শঙ্করের শরীর-রক্ষক-রূপে, অদূরস্থিত এক বৃক্ষতলে বসিয়া ছিল। শঙ্কর গাত্রোত্থান করিবা মাত্র, সেও শঙ্করের অনুসরণ করিল।

* * *

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### বিচার।

"I could a tale unfold, whose lightest word,
Would harrow up thy soul;
Freeze thy young blood."

—*Shakspeare.*

শঙ্কর সেই ভগ্ন-অট্টালিকা অভিমুখে অগ্রসর হইল। খরস্রোতা তটিনীর তীরভূমি উজ্জ্বল করিয়া, সে অট্টালিকা বিরাজমান ছিল। অট্টালিকার কোনও কোনও অংশের কারুকার্য্য কাল-প্রভাবে বিনষ্ট হইলেও, বনভূমির মধ্যে সেই একমাত্র অট্টালিকা—নৈশগগনে চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

নদীর দিকে অট্টালিকার তোরণ-দ্বার। সেই তোরণ-দ্বার দিয়া অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা মাত্র, শঙ্কর দেখিতে পাইল, আঙ্গিনায় দস্যুদলের একটী বৈঠক বসিয়াছে। কার্ত্তিকা মধ্যস্থলে; তাহার বামপার্শ্বে জিতু, দক্ষিণপার্শ্বে ফতু; সম্মুখে এক ব্যক্তি হস্তপদ-বদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান; তাহার দুই পার্শ্বে অপর দুই জন দস্যু—যমদূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে।

কার্ত্তিকা বলিতেছে,—"এখনও যদি মঙ্গল চাস্, সত্য করিয়া বল্, তাঁহাদিগকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছিস্?"

আঙ্গিনায় প্রবেশ করিবা মাত্র, কার্ত্তিকার এই প্রশ্ন শঙ্করের কর্ণে প্রবেশ করিল। কৌতূহল-পরবশ হইয়া, শঙ্কর সেই বৈঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কার্ত্তিকা, জিতু, ফতু, সকলেই সসম্মানে অভিবাদন করিয়া শঙ্করকে সম্মুখে বসাইল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল,—“কি হইয়াছে—কার্ত্তিকা! ও কি করিয়াছে ?”

কার্ত্তিকা ইতিহাস আবৃত্তি করিতে লাগিল। বলিল,—“এ বেটা বিশ্বাসঘাতক। দুইটী অসহায়া যুবতীর রক্ষার ভার ইহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই যুবতীদ্বয়কে লইয়া এই পাষণ্ড পলায়ন করিয়াছিল। আজ কয় বৎসর কাল সন্ধান করিয়া, অনেক কষ্টে ইহাকে ধরিতে পারিয়াছি। স্থির হইয়াছে, মা-ভৈরবীর নিকট ইহাকে বলিদান করিব।”

শঙ্কর।—“উহাকে মায়ের নিকট বলি দিবে স্থির করিয়াছ ; তবে আবার উহাকে ওরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন ?”

কার্ত্তিকা।—“যদি সত্য কথা বলে, মায়ের নিকট উৎসর্গীকৃত হইতে পারিবে। যদি মিথ্যা বলে, মায়ের নিকট আর লইয়া যাইব না ; জীবন্তে পুতিয়া ফেলিব ; অথবা হাত-পা বাঁধিয়া পুড়াইয়া মারিব।”

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল,—“কে সে যুবতীদ্বয় ? উহার হস্তেই বা তাহাদের ভার কেন সমর্পিত হইয়াছিল ?”

কার্ত্তিকা।—“সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী। বুলাকি দাস নামে মুর্শিদাবাদে এক বেণিয়ার বাস ছিল। এক দিন রাত্রে আমরা সেই বেণিয়ার বাড়ী ডাকাইতি করিতে যাই। যাইবার সময়, মাঠের মাঝে একটা দীঘির ধারে আমাদের আড্ডা হইয়াছিল। সেখানে গিয়া সকলে মিলিত হইয়া পরিশেষে সহরের দিকে রওনা হইব—স্থির ছিল। রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময়, আমরা এক দল—আট জন ডাকাইত—প্রথমে সেই দীঘির পাড়ে উপনীত হই। আমাদের সঙ্গে মশালের আলো

জ্বলিতেছিল। আমরা যখন দীঘির পশ্চিম পাড়ে উপনীত হইলাম, জলের ভিতর হইতে রমণী-কণ্ঠের ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইল। শুনিলাম, কে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে,—'বাবা! রক্ষা কর।' অমনি জলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম,—দুইটি যুবতী সেই জল-মধ্যে ভাসমান। তাঁহারা কাতর-কণ্ঠে কহিতেছেন,—'বাবা! আমাদের উদ্ধার কর।' দেখিয়া মনে হইল, যেন জলদেবীরা আমাদের পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। সভক্তি-প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলাম,—'মা! সন্তানের প্রতি কি আদেশ করিতেছেন?' তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—'বাবা! আমাদের উদ্ধার করুন;—আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করুন।' আমরা অভয় দিয়া বলিলাম,—'আপনাদের কোনও আশঙ্কা নাই।' মশালের আলো ধরিয়া রহিলাম। তাঁহারা জল হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে বৃক্ষতলে আগমন করিলেন।"

এই বলিয়া, কার্ত্তিকা রূপনগরের কালাদীঘিতে তারা ও শ্যামার বিপদের কথা বর্ণনা করিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসিল,—"তার পর তাঁহাদের ব্যবস্থা কি করিলে?"

কার্ত্তিকা তীব্রদৃষ্টিতে সেই হস্তপদ-বদ্ধ দস্যুর প্রতি চাহিয়া কহিল,—"ঐ বিশ্বাসঘাতক পিশাচের হস্তে তাঁহাদিগকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলাম।"

এই বলিয়া কার্ত্তিকা বজ্রগম্ভীর-স্বরে বন্দীকে কহিল,—"বল্ বেইমান!—এখনও সত্য করিয়া বল্!—তোকে জীবন্তে দগ্ধ করিলেও মনের রাগ দূর হয় না।"

বন্দীকে লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর কহিল,—"মরণের সময় মিথ্যা

কথা কহিয়া কেন নরকগামী হইবি ? বল্—সত্য করিয়াই বল্ !"

বন্দী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল,—"আমার পাপের ফল আমি অবশ্যই ভোগ করিব। আমি সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না। আমার উপর সেই যুবতীদ্বয়কে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার ভার অর্পণ করিয়া তোমরা ডাকাইতি করিতে চলিয়া গেলে। তখন তাঁহাদের গাত্রের অলঙ্কারাদি দেখিয়া আমার বড়ই লোভ হইল। আমি তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া অন্য পথে লইয়া গেলাম।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল,—"অন্য পথে যাইতে তাঁহারা কোনও আপত্তি করিলেন না ?"

বন্দী।—"আমি বুঝাইলাম, মুসলমান-সৈনিকেরা গ্রাম ঘেরিয়া আছে ; সে রাত্রে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলে, বিষম বিপদের সম্ভাবনা। বুঝাইলাম, সে বিপদে তাঁহাদের পিতামাতা আত্মীয় পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। বলিলাম,—'আজ রাত্রিতে আমাদের আশ্রয়ে রাখিয়া কাল বাড়ী পৌঁছাইয়া দিব।' সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। অনেক দূর গিয়া গভীর রাত্রিতে আমি তাঁহাদের গহনা-কয়খানি চহিয়া লইলাম। বুঝাইয়া বলিলাম—'রাত্রিতে গায়ে গহনা থাকিলে বিপদের আশঙ্কা আছে। সুতরাং আমার নিকট ও-গুলি খুলিয়া দেন, আমি সাবধান করিয়া রাখি।' সরল বিশ্বাসে তাঁহারা গহনাগুলি খুলিয়া দিলেন। গহনাগুলি গ্রহণ করিয়া, আমি হঠাৎ বনের মধ্যে অদৃশ্য হইলাম। তার পর তাঁহাদের যে কি হইল, তাঁহারা যে কোথায় গেলেন,—কিছুই আমি বলিতে পারি না।"

কর্ত্তিকা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ পথে কোথায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছিস্ ?"

বন্দী।—"সে পথে মুর্শিদাবাদের উত্তরের দিকে যাওয়া যাইতে পারে। সে পথ ধরিয়া সোজাসুজি পশ্চিম-মুখে যাইলে, মহারাণী ভবানীর অনাথাশ্রমে পৌছান যায়।"

কার্ত্তিকা।—"সেই অসহায়া রমণীদ্বয়কে সেই পথে সেই রাত্রিতে সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া অলঙ্কারগুলি ভুলাইয়া লইয়া গেলি, তোর মনে একটুও দয়ার সঞ্চার হইল না ?"

বন্দী।—"পর দিন যখন আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল, তাঁহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। কয় বৎসর আমি নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছি। কিন্তু আর তাঁহাদিগের সন্ধান পাওয়া গেল না।"

বন্দী, দণ্ডাদেশের প্রতীক্ষায় কার্ত্তিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কার্ত্তিকা কহিল,—"কি দণ্ড বিধান করিলে তোর উপযুক্ত শাস্তি হয়, আমি তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। সর্দ্দার তোর বিচার করিবে। তুই আরও দিন-কয়েক এই বন্ধন-যন্ত্রণা ভোগ কর।"

* * *

## নবম পরিচ্ছেদ।

সন্দর্শনে।

"নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা,
নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পুর ইবেন্দুদর্শনাৎ
গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি।"
——রঘুবংশম্।

নাটোর-রাজধানীতে আজি আবার কিসের আনন্দ-উৎসব! রাজপুরী সহসা কি আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল?

মহারাণী ভবানী সংসার-ত্যাগিনী হইয়াছিলেন,—গঙ্গাবাসে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনিই বা আবার আজি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন কেন? চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে মঙ্গল-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। রাজধানীতে আজি আবার কি নূতন উৎসব উপস্থিত হইল?

মহারাজ রামকৃষ্ণের একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উৎসব-সমারোহ—সেই নবকুমারের অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে।

পৌত্র-মুখ-দর্শনে মহারাণী ভবানীর আজ কত আনন্দ! মহারাণী ভবানী যে সংসারকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, নবকুমারের মুখ-দর্শনে সেই সংসার তাঁহার নিকট আজি পরম রম্য স্থান বলিয়া প্রতীত হইতেছে। মহারাণী ভবানী এক এক বার নবকুমারের মুখের দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, আর পুনরায় তাঁহার সংসারে ফিরিয়া আসিবার সাধ হইতেছে।

মহারাণী ভবানী এবার মাত্র একটী দিনের জন্য নাটোরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু নবকুমারের মায়া-মোহে মুগ্ধ হইয়া সপ্তাহ কাল তিনি নাটোরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নবকুমারের জন্মোৎসব এবং অন্নপ্রাশন-উপলক্ষে বহু দিন পর্য্যন্ত রাজধানী আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল।

*　　*　　*

নবকুমারকে দর্শন করিতে আসিয়া, মহারাণী ভবানী কুমারের গলদেশে এক অভিনব স্বর্ণ-পদক পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই পদক-মধ্যে হীরক খচিত এক অপূর্ব্ব গোপাল-মূর্ত্তি ঝক্-ঝক্ করিতেছে। পদকখানি—ভারতীয় শিল্প-চাতুর্য্যের এক অভিনব নিদর্শন!

সুন্দরী, নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া, এক এক বার নন্দনের মুখের দিকে চাহিতেছেন, আর এক এক বার সেই পদক-মধ্যবর্ত্তী গোপাল-মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন। কখনও মনে হইতেছে—তাঁহার ক্রোড়ের গোপাল আর পদক-মধ্যে-অঙ্কিত গোপাল—বুঝি অভিন্ন। কখনও বা গোপালের আকৃতি ও সৌন্দর্য্য স্মরণ করিয়া, মনে মনে কহিতেছেন,—"সেই গোপালই আমার গৃহে গোপাল-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।" কখনও আবার চিন্তার গতি অন্য পথ অবলম্বন করিতেছে; সুন্দরী পদক-মধ্যস্থিত গোপালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিতেছেন,—"ভগবন্! করুণাময়! আমার গোপাল যেন তোমার করুণায় কখনও বঞ্চিত না হয়।"

সুন্দরীর কখনও মনে হইতেছে,—তাঁহার ক্রোড়স্থিত শিশু-পুত্রে যেন পতি-দেবতার অপরূপ রূপ প্রতিফলিত রহিয়াছে।

সুতরাং পুত্রমুখ-দর্শনে সুন্দরীর স্বামিসন্দর্শনলালসাও পরিতৃপ্ত হইতেছে।

সুন্দরী, পুত্র-ক্রোড়ে করিয়া প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে বসিয়া, পুত্রমুখ-দর্শনে তন্ময় হইয়া আছেন; সহসা মহারাজ রামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁহার পদ-সঞ্চার-শব্দ শুনিলেই সুন্দরী চকিত চাহনীতে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেন। কিন্তু আজ তাঁহার আগমনে সুন্দরীর চমক ভাঙ্গিল না।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুন্দরীর এবম্বিধ ভাব-বিপর্য্যয় দেখিয়া, মহারাজ রামকৃষ্ণ একটু বিস্মিত হইলেন। ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া, অভিমান-ব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুন্দরি! আমি আসিয়াছি। আমার দিকে কি একটুও দৃষ্টি করিতে নাই?"

সুন্দরী পুত্র-ক্রোড়ে ব্যস্ত-সমস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; লজ্জিত-ভাবে কহিলেন,—"আপনি কত ক্ষণ আসিয়াছেন; আমি একটুও টের পাই নাই।"

রামকৃষ্ণ।—"পুত্রের মুখ দেখিয়া, আমায় বুঝি একটু একটু করিয়া ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছ?"

সুন্দরী মনে মনে কহিলেন,—"নাথ! এই শিশুর মুখ-মণ্ডলে তোমার প্রতিকৃতি প্রতিফলিত। তাই তো আমি, এই মুখ দেখিয়াই, তোমার ধ্যানে বিভোর হইয়া আছি।"

ভাবিতে ভাবিতে, ক্রোড়স্থিত শিশু-পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া, আবেগ-ভরে সুন্দরী বলিয়া উঠিলেন,—"নাথ! দেখুন, —কেমন সুন্দর মুখ-খানি। এই মুখে আপনার ছবি কেমন সুন্দর প্রতিফলিত রহিয়াছে!"

রামকৃষ্ণ।—"তাই বুঝি সুন্দরি!—আজ-কাল সময় সময় আমায় ভুলিয়া যাও?"

সুন্দরী উত্তর দিতে সঙ্কুচিতা হইলেন; মনে মনে কহিলেন, —"সে কি নাথ! এখন অন্তরে থাকিলেও তুমি যে আমার অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজমান্। যখন বাহিরে যাও, আমায় ছাড়িয়া দূরে থাক;—এই শিশুর মধ্যেই তোমাকে যে আমি প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই!"

সুন্দরীকে নিরুত্তর দেখিয়া, রামকৃষ্ণ কহিলেন,—"আজ-কাল সুন্দরি!—আমার প্রতি তোমার আর তেমন ভালবাসাটুকু দেখিতে পাই না। তোমার সব ভালবাসাটুকু এখন স্নেহের বিশ্বনাথের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে।"

অন্নপ্রাশনে নবকুমার 'বিশ্বনাথ' নাম পরিগ্রহ করিয়াছেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ তাই, শিশু-কুমারকে বিশ্বনাথ নামেই সম্বোধন করিলেন।

সুন্দরীর মনে মনে একটু কষ্ট হইল। তাঁহার স্নেহের নন্দনকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজের ভাবান্তর দেখিয়া, সুন্দরী প্রাণে যেন একটু ব্যথা পাইলেন।

শিশুর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া, সুন্দরী ব্যথিত স্বরে কহিলেন,—"এই সুন্দর সরল মুখ-খানির পানে চাহিয়া, আপনার কি একটুও মায়া হয় না?"

বলিতে বলিতে, সুন্দরীর নয়ন-প্রান্ত জল-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

সুন্দরী এত দূর বিচলিত হইবেন,—মহারাজ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং একটু লজ্জিত হইয়াই কহিলেন,—

"সুন্দরি! অমনি তোমার চোখে জল আসিল! তুমি কি মনে কর, তোমার বিশ্বনাথের ঐ বিশ্ব-আলো-করা মুখ-খানি আমার প্রাণেও আনন্দের উৎস উৎসরিত করে নাই? তুমি কি মনে কর—তোমার অপেক্ষাও আমার প্রাণের কুমারকে আমি কম ভালবাসি? তুমি নিশ্চয় জেন সুন্দরি!—কুমার আমার আনন্দের নির্ঝর।"

সুন্দরীর প্রাণের পুতলিকে মহারাজ এত ভালবাসেন—সুন্দরী এত ক্ষণ তাহা বুঝিতে পারে নাই। এই বার পতির মুখে, সেই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, সুন্দরীর আর আনন্দের অবধি রহিল না। আনন্দে আত্মহারা হইয়া, সুন্দরী কহিলেন,—"নাথ! কুমার এতই সুন্দর!—কুমারকে কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। আমি তো এই চাঁদমুখ-পানে চাহিয়া চাহিয়া পাগল হইয়া আছি।"

মহারাজের মনে আবার এক নূতন প্রতিঘাত! মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা সুন্দরি! সত্য করিয়া বল দেখি, এত দিন আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা ছিল, এখনও সেই ভালবাসা আছে কি না?"

সুন্দরী।—"নাথ!—এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

রামকৃষ্ণ।—"কেন জিজ্ঞাসা করিতেছি! আমার যেন মনে হয়, আমায় এখন আর তুমি তত ভালবাস না। আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসাটুকু ছিল, সেটুকু এখন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কতক ভালবাসা স্নেহের নন্দন পাইয়াছে; কতক ভালবাসা আমার জন্য আছে। কেমন সুন্দরি!—সত্য নয় কি?"

সুন্দরী।—"নাথ! সত্যই বলিয়াছেন। শিশুর মুখ-পানে চাহিলে, আমি এখন সংসারের সকল চিন্তা—সকল জ্বালা ভুলিয়া যাই। আগে আগে আপনাকে দেখিয়া আমি যেমন উন্মাদিনী হইতাম, এখন এই সোণার পুতলি আমায় সেইরূপ উন্মাদিনী করিয়া রাখিয়াছে। দেখুঁন!—দেখুন!—কেমন সুন্দর মুখ-খানি!"

পতি-পত্নী উভয়েই সন্তানের মুখ-পানে চাহিয়া দেখিলেন। সুন্দরীর প্রতি রামকৃষ্ণের অভিমানের ভাব দূর হইল। তখন, উভয়েই এক এক বার নন্দনের মুখের পানে চাহিতে লাগিলেন। তখন, উভয়েই এক এক বার উভয়ের মুখের পানে চাহিতে লাগিলেন।

মহারাজ রামকৃষ্ণের চক্ষে সংসার আবার আনন্দময় বলিয়া প্রতীত হইল। সুন্দরী-রূপ সংসারের যে বন্ধনে তিনি এত দিন আবদ্ধ ছিলেন, সেই বন্ধনের উপর নন্দন-রূপ আবার এক নুতন বন্ধন আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল।

রামকৃষ্ণের মনে আপনা-আপনিই প্রশ্ন উঠিল,—"কে বলে সংসার নিরানন্দময়।" তাঁহার মন আপনা-আপনিই সে প্রশ্নের উত্তর দিল,—"যাহার সংসারে এমন শান্তি-নির্ঝরিণী সুন্দরী আছে, যাহার সংসারে এমন নয়নানন্দবর্দ্ধন নন্দন আছে, তাহার নিকট স্বর্গ কোন্ ছার! তাহার সংসার—মর্ত্ত্যে অমরাপুরী।"

*

* *

## দশম পরিচ্ছেদ।

### কোথায় ?

"খোঁজে ঘরে ঘরে, নগরে নগরে,
খোঁজে বন উপবন,
শেখরে, গহ্বরে, প্রাচীরে প্রান্তরে,—
নিশান্তে এ কি স্বপন!"
——নবীনচন্দ্র।

একটী ভিখারী গান গাইতেছিল। ভিখারী গাইতেছিল—

"রাম দূরী মায়া বঢ়তি
ঘটতি জ্ঞান মন মাহ।
দূরী হোতি রবি দূরী লখি
শিরপর পগতর ছাঁহ॥"

ভিখারী নাচিয়া নাচিয়া একতারা বাজাইয়া গান গাইতেছিল। দ্বারবানগণ একাগ্রচিত্তে সেই গান শুনিতেছিল।

প্রভাতে দেউড়ীতে যখন ভিখারীর মধুর কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রাতঃসমীর-সেবনে সেই তোরণ-দ্বারের অনতিদূরে পরিখার পার্শ্বে পদচারণা করিতেছিলেন। সহসা সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।

কি মধুর কণ্ঠস্বর! সঙ্গীতের লহরে লহরে মনঃপ্রাণ নাচিয়া উঠিল। এই সঙ্গীত বহু পূর্ব্বে মহারাজ আর একবার শুনিয়াছিলেন। গানের শব্দ কয়টী অনেক দিন হইতেই মহারাজের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ছিল। আজি আবার ভিখারীর মোহন

কণ্ঠে সঙ্গীত-ধ্বনি ঝঙ্কৃত হওয়ায়, প্রাণের ভিতর যেন সুপ্ত-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল।

গায়ক গাহিল,—

"রাম দূরী মায়া বঢ়তি
ঘটতি জান মন-মাহ।"

আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন,—"কি সরল সুন্দর সত্য বাণী! রামচন্দ্র (ভগবান) দূরে থাকিলে, মায়া বৃদ্ধি পায়; তিনি যখন হৃদয়ে থাকেন, মায়া পলায়ন করে।"

গায়ক গাহিল,—

"ধূরী হোতি রবি-দূরী লখি,
শিরপর পগতর ছাঁহ॥"

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন,—"সত্য—সার সত্য! সূর্য্য-দেব দূরে থাকিলে, ছায়া বৃদ্ধি পায়। তিনি যখন মস্তকে থাকেন, ছায়া পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়।"

গাইয়া গাইয়া, আনন্দ বিলাইয়া, পুরস্কার লইয়া, ভিখারী চলিয়া গেল। কিন্তু গানের স্বর, গানের ভাব-লহরী—কুমারের হৃদয়-মন অধিকার করিয়া বসিল। তখন কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"মায়া! শুধুই মায়া! মায়ায় আবদ্ধ হইয়া, আমি সকলই বিস্মৃত হইলাম।"

হৃদয়ের ভিতর দারুণ সংগ্রাম! সংসার—মায়ার বন্ধন! মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে, ভগবৎ-সন্নিকর্ষ-লাভ সম্ভব-পর নহে!

সেদিন আর বিষয়-কর্ম্মে মহারাজের চিত্ত নিবিষ্ট হইল না! সেদিন আবার তপ-কর্ম্ম-আরাধনায় বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল!

দরবার বসিয়াছে ; পারিষদগণ উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতিহারী সংবাদ লইয়া আসিল ; মহারাজ অগ্রাহ্য করিলেন। সুন্দরীর ক্রোড়ে বিশ্বনাথকে দেখিলেন ;—মায়ার বন্ধন বলিয়া মন উচাটন হইয়া উঠিল ! শিশুর সুন্দর মুখ ; সেই মুখের মধুর হাসি—স্বর্গের সুষমা ছড়াইয়া দিত। সে মুখের সে হাসি—আজি বন্ধন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাজ্যৈশ্বর্য্য, ধনসম্পদ,—সকলই বন্ধন ! মহারাজ যেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই দিক হইতেই যেন বন্ধনের শত-শৃঙ্খল আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুষ্পোদ্যানের মর্ম্মরাসনে উপবেশন করিয়া মহারাজ পরিখার তরঙ্গায়িত জলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মনে হইল,—

কলনাদিনী কালিন্দী, দুকূল প্লাবিত করিয়া, কলকল্লোল তুলিয়া চলিয়াছে। পূর্ণিমার প্রস্ফুট-চন্দ্রালোকে, তাহার স্ফটিক-স্বচ্ছ নীল-জলে, মণি-মরকত-শোভা বিখচিত করিয়াছে। তীরে তাল-তমাল-তরুরাজি, তৃষিতের ন্যায় চাহিয়া চাহিয়া, হতাশ গণিতেছে।

সহসা নিধুবনে কদম্বমূলে বাঁশরী বাজিয়া উঠিল ! মজিল রে—যমুনা মজিল ! উন্মাদিনী উজান বহিয়া ফিরিয়া আসিল। যমুনা !—স্বর্গের সুষমা দেখাইলি তুই !

আর ভাল লাগিল না। মহারাজ রামকৃষ্ণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার নূতন চিন্তায় হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল।

মনে পড়িল,—সুন্দরীর সুন্দর মুখখানি ! মনে পড়িল,—বিশ্বনাথের মধুমাখা আধ-আধ হাসিটুকু ! মনে পড়িল,—সুখ-সৌভাগ্যের আনন্দময় ছবি !

কিন্তু ক্ষণপরেই সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। কল্পনার নেত্রে যেন প্রত্যক্ষ করিলেন,—অতীতের এক দিব্য চিত্র-পট!

সম্মুখে সোনার পুতলি স্নেহের নন্দন, পদপ্রান্তে পতিগত-প্রাণা সাধ্বী-সতী গোপা;—দূরে কে যেন ডাকিতেছে,—'সিদ্ধার্থ! ফিরিয়া এস; সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র!' রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্নেহ, মমতা,—সব দূরে পলাইল; জীবের জন্ম-জরা-মৃত্যু-দূরকামনায় রাজপুত্র সংসার-ত্যাগী হইলেন।

দৃষ্টি আরও নিকটে আসিল। রামকৃষ্ণের মনোমধ্যে আর এক নূতন চিত্র প্রতিভাত হইল।

নবদ্বীপের গৌরচন্দ্র, প্রতিভার পূর্ণচন্দ্র, ব্যাকুলতার কি আদর্শে কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হইয়া গেলেন!

দরদরধারে রামকৃষ্ণের নয়নযুগলে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইল।

রামকৃষ্ণ মনে মনে কহিলেন,—"সেই বাঁশী, সেই আহ্বান, সেই আদর্শ,—সকলই সম্মুখে রহিয়াছে। প্রাণ!—এখনও পাগল হইতে পারিলে না!"

ক্রমশঃ সন্ধ্যার আঁধার আসিয়া, ধরণী ঘেরিয়া বসিল। দূর গগন-প্রান্তে, অনন্ত-নীলিমা-মাঝে দুই একটী নক্ষত্র-কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। দশভূজার মন্দিরাগত আরতির মঙ্গল-বাদ্য তাঁহার কর্ণে বাজিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে অন্দর-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মনোমধ্যে একই চিন্তা,—"প্রাণ! এখনও পাগল হইতে পারিলে না!"

* * *

পরদিন প্রভাতে রাজপুরী দুশ্চিন্তা-তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নিশি-শেষে স্বপ্নাবেশে সুন্দরী দেখিতে পাইলেন,—

এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহারাজের হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন। সুন্দরী শুনিতে পাইলেন,—সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহারাজকে সংসার ত্যাগের জন্য উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—'মূঢ় জীব! মিথ্যা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, কেন সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছ? যদি উদ্ধার পাইতে চাও, যদি শান্তি-লাভ কামনা কর, এস—আমার সঙ্গে এস—পথ দেখাইয়া দিতেছি।' এই বলিয়া, যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া, তিনি মহারাজকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছেন।

স্বপ্ন দেখিয়া, চমকিয়া উঠিয়া, সুন্দরী শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—মহারাজ নাই,—মহারাজের দুগ্ধফেন-নিভ সুকোমল শয্যা শূন্য পড়িয়া আছে।

হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল। শশব্যস্তে শয্যা ত্যাগ করিতেই দ্বারের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন,—উদ্যানাভিমুখীন দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তবে কি মহারাজ উদ্যানে?

সুন্দরী গবাক্ষপথে উদ্যানের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শর্ব্বরী প্রভাতপ্রায়া। নৈশ-শোভা নক্ষত্রসমূহ পরিম্লান হইয়া আসিতেছে। উদ্যানের পুষ্প-নিচয় নিশির শিশির-সিক্ত হইয়া, যেন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

মহারাজ কোথায় গেলেন?

সুন্দরী মনে মনে কহিলেন,—"কৈ, এমন ভাবে তিনি তো কোনও দিন শয্যাত্যাগ করিয়া যান না! আজ তিনি তবে কোথায় গেলেন?"

সুন্দরী, সহচরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সহচরী উত্তর

দিতে পারিল না। দাসদাসীগণের নিকট সন্ধান লওয়া হইল। কেহই কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। যথাসময়ে রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের কর্ণে সে সংবাদ উপস্থিত হইল। তিনি চারিদিকে নানা-প্রকারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনই সন্ধান মিলিল না।

তিনি অন্তঃপুরে নাই; তিনি বহির্ব্বাটীতে নাই; তিনি উদ্যানে নাই; তিনি বৈঠকে নাই; তিনি পারিষদগণের মধ্যে নাই; তিনি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে নাই; রাজপুরীর কোথাও তিনি নাই! তবে তিনি কোথায় গেলেন?

সুন্দরীর মনে হইল,—"আজ তাঁহাকে সারাদিনই যেন কেমন বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম। তখন কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করি নাই? তবে কি আমারই কোনও ত্রুটি হইল? তাই তিনি অভিমানে কোথাও চলিয়া গেলেন!"

সুন্দরী, নন্দনের মুখের পানে চাহিয়া, আপন মনে আপনকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই যে সোনার শিশু, স্বর্গীয় পুষ্পের ন্যায় পুরী পুলকিত করিয়া আছে,—ইহাকে ফেলিয়াই বা তিনি কোন্ প্রাণে কোথায় গেলেন?"

সুন্দরীর চক্ষে চারিদিক শূন্য বলিয়া প্রতীত হইল।

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর বিষয়-কর্ম্মের বিশৃঙ্খলার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। মহারাণী ভবানীর নিকট সংবাদ পাঠান হইল। চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

মহারাজ কোথায় গেলেন? সেই অট্টালিকা, সেই রাজৈশ্বর্য্য, সেই সুখ-সম্পদ,—সকলই যেন আজ তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল,—"মহারাজ কোথায় গেলেন!"

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## পঞ্চম খণ্ড।

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥"

— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যাহার বুদ্ধি সর্ব্বত্র আসক্তিরহিত, যিনি জিতাত্মা, ফলস্পৃহা-রহিত, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করেন।

* * *

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### দেশের অবস্থা।

"With fire and sword the country round
was wasted far and wide."

—*Southey.*

কয়েক বৎসর মধ্যে কত পরিবর্ত্তনই সাধিত হইল।

কত ক্রোড়পতি দরিদ্র হইয়া গেলেন। আবার কত দরিদ্র ক্রোড়পতির আসন লাভ করিলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইল। কেহ আনন্দে তাণ্ডব-নৃত্য করিলেন। কেহ অবসাদে নয়ন-জল মুছিতে লাগিলেন।

মোহের ছলনায় মণি বেগম সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিলেন। এদিকে "মাদার অব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী" অর্থাৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জননী নামে তাঁহার সম্মানের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

প্রাণ লইয়া, টাকা লইয়া, চারিদিকে 'ছিনিমিনি' খেলা চলিতে লাগিল। রাষ্ট্র-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল পল্লীতে পল্লীতে প্রত্যক্ষীভূত হইল। দেশের বনিয়াদী বংশ-সমূহ দিন দিন ক্ষীণবল হইয়া পড়িলেন। এদিকে, সময়ের স্রোতে গা ভাসাইয়া, আধুনিক-গণ ক্রমশঃ মস্তক উত্তোলন করিয়া সদর্পে দণ্ডায়মান

হইলেন। এক দিকে 'রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার, অন্য দিকে দস্যু-তস্করের উপদ্রব,—জনসাধারণ চারিদিকেই প্রমাদ গণিতে লাগিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হেষ্টিংস ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর গবরণর-জেনারেল-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অপকর্ম্ম-কাহিনী—ইতিহাস-পাঠক কে না অবগত আছেন? তাঁহার অপকর্ম্ম-সম্বন্ধে—কেবল ভারতে নহে—ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত এক সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল;—আর সে আন্দোলনে পার্লামেণ্ট মহাসভা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অপকর্ম্মের বিষয়ে প্রথমে ডিরেক্টর-সভা তীব্র তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন। সেই পত্র পাইয়া, হেষ্টিংস পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পদত্যাগ করিয়াও হেষ্টিংস প্রায় দুই বৎসর কাল ভারতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেই সময়, প্রায় ২০ মাস কাল, স্যর জন ম্যাক্‌ফার্সান নামক জনৈক সিবিলিয়ান অস্থায়িভাবে গবরণর-জেনারেলের কাজ চালাইতেছিলেন। তাহার পর, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ইংরেজগণের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতের প্রধান সেনাপতি ও গবরণর-জেনারেল হইয়া আসেন।

ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর শাসনেতিহাসে হেষ্টিংস যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া যান, লর্ড কর্ণওয়ালিস্, ভারতের গবরণর-জেনারেল হইয়া আসিয়া, প্রথমে সেই কলঙ্ক-রাশি অপসারণ করিবার প্রয়াস পান। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে নানাবিধ অশান্তি-উপদ্রবে বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা,—তখন প্রায় চারিদিকেই

প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিল। রাজস্ব-সংক্রান্ত বন্দোবস্তেও তখন বড়ই বিশৃঙ্খলা চলিয়াছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রায় সকল হাঙ্গামা চুকিয়া যায়। প্রকারান্তরে সেই সময় হইতেই ভারতের গবরণর-জেনারেল অনেকটা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হন;—রাজস্ব-সংক্রান্ত-ব্যাপারে "সুপ্রিম কোর্টের" কর্ত্তৃত্ব কমিয়া আসে।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থায় লর্ড কর্ণওয়ালিস্ প্রধানতঃ ত্রিবিধ সংস্কার-বিধান করিয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন,—কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ অনেকেই উৎকোচগ্রাহী, আর তাহাতে ব্রিটিশ-জাতির সম্ভ্রম-সম্মান সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে; তিনি তখন 'পাবলিক সার্ভিসের' অর্থাৎ কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-সম্বন্ধে অনেকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া দিলেন। কর্ম্মচারিগণের বেতনের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইল;—তাঁহাদের উৎকোচ-গ্রহণের পথ অবরুদ্ধ করিবার পক্ষে চেষ্টা চলিতে লগিল। ইহার পর, লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগ-সম্পর্কে নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। হেষ্টিংসের সময় জেলায় জেলায় এক এক জন সাহেব কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিই দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। কর্ণওয়ালিস্ সেই দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের পার্থক্য-সাধন করিয়া জজ ও কলেক্টর দ্বিবিধ পদের সৃষ্টি করিলেন। মুনসেফ, দারোগা প্রভৃতি পদ এই সময়েই সৃষ্টি হইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের তৃতীয় বা সর্ব্বপ্রধান শাসন-সংস্কার—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রাজস্বই কোম্পানীর প্রধান আয় ছিল। হেষ্টিংসের শাসন-সময়ে বৎসর বৎসর

রাজস্বের বন্দোবস্ত হইত। তখন যে বৎসর যিনি শত বেশী রাজস্ব দিতে সম্মত হইতেন, সে বৎসর তাঁহাকেই জমীদারী বিলি করার ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে আয়ের বড়ই তারতম্য ঘটিতে লাগিল। কোনও কোনও বৎসর রাজস্ব কিছু অধিক আদায় হইল বটে; কিন্তু প্রায়ই আয়ে ঘাটতি ঘটিল। বিলাতের ডিরেক্টর-দিগের অভিপ্রায় অনুসারে, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ প্রথমে "দশশালা বন্দোবস্ত" ধার্য্য করিলেন। এই বন্দোবস্তে জমীদারগণ দশ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাজস্বে জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। এই ব্যবস্থায় অল্পদিনের মধ্যেই সুফল লাভ হইল; বুঝিতে পারা গেল—বহু দিনের জন্য জমীদারী ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়স্কর। সুতরাং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বিহিত করিলেন। তাহাতে স্থির হইল,—বঙ্গদেশের জমীদারগণ নির্দ্দিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদান করিয়া চিরকাল ভূ-সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতে পারিবেন।

এবংবিধ রাজবিধির পরিবর্ত্তনে, নাটোর-রাজ্যের শাসন-বিধিও নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল। পূর্ব্বে নাটোরে কারাগার ছিল। রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মকর্দ্দমার বিচার-মীমাংসায় নাটোরাধিপতি সম্পূর্ণ-রূপ অধিকারী ছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে নাটোরের সেই অধিকার লোপ পাইল। ঐ সময় নাটোরে রাজসাহী-জেলার সদর কাছারী এবং কোম্পানীর প্রধান বিচারালয়সমূহ স্থাপিত হয়। সেই হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাটোরই রাজসাহী জেলার সদর বলিয়া গণ্য ছিল। তখন, নাটোরের

মারদ-নদ মজিয়া আসে; নগর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, তাই জেলার সদর-কাছারী নাটোর হইতে পদ্মার ধারে রামপুর-বোয়ালিয়ায় উঠিয়া যায়। সে অবশ্য পরবর্ত্তী কালের ঘটনা। নচেৎ, আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, তখনও নাটোরের গৌরব-সম্ভ্রম তাদৃশ খর্ব্ব হয় নাই।

তাহা না হউক, এই সময় বা ইহার পূর্ব্ব হইতেই নাটোর-রাজ্যের ভিত্তি-ভূমি যে শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সময় উত্তরাঞ্চল, এক দিকে দেবী সিংহ প্রভৃতির রাজস্ব-সংগ্রহের উৎপীড়নের ফলে জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, অন্য দিকে দস্যু-তস্করের আতঙ্কে দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। সুতরাং খাজানা-পত্র-আদায়ে পদে-পদেই বিঘ্ন ঘটিতেছিল। যেমন উত্তরের দিকে, তেমনই দক্ষিণাঞ্চলে। দক্ষিণে যশোহর-জেলায় এই সময় নীলকরগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকের যথেচ্ছাচারিতায় এবং সেই সুযোগে নাটোরের আমলাবর্গের বিশ্বাসঘাততায়, তৎপ্রদেশ হইতেও খাজানা-পত্র আদায় হইতেছিল না। অধিকন্তু, মহারাজ রামকৃষ্ণ বিষয়-কর্ম্মে বীতস্পৃহ হওয়ায়, অনেক সময়, তাঁহার একটী স্বাক্ষরের জন্যও কাজ আটকাইতেছিল। রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর অনেক চেষ্টায় তাঁহার দ্বারা কাজ করাইয়া লইতেছিলেন; কিন্তু এখন আবার তাহাতেও বিঘ্ন ঘটিল। মহারাজ এখন নিরুদ্দেশ! তাই চারি দিকেই এখন খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গিয়াছে—"মহারাজ কোথায় গেলেন?"

* * *

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### বিপদে।

"It droppeth as the gentle rain from Heaven
Upon the place beneath."

——*Shakspeare.*

পথিক জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আপনার ক্রোড়ের নিকট এ কাহার শবদেহ?"

আচম্বিতে অপরিচিত কণ্ঠের স্বর শুনিয়া, চমকিয়া উঠিয়া, গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করিল,—"কে আপনি? কোথা হইতে আসিতেছেন?"

পথিক উত্তর দিল,—"আমি ব্রাহ্মণ!"

গৃহস্থের মনে হইল,—বুঝি কোনও দেবতার কর্ণে তাহার ক্রন্দন-ধ্বনি পৌঁছিয়াছে। গৃহস্থ তাই কাতরস্বরে কহিল,—"মহাশয়! আপনি আমার মায়ের সৎকারের কোনও উপায় ক'রে দিতে পারেন?"

গৃহস্থ অধিক আর কিছু কহিতে পারিল না। শোকাবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

পথিক সান্ত্বনা-বাক্যে কহিল,—"কেন? তোমার কিসের অভাব? খরচ-পত্রের অভাব হইয়াছে?"

গৃহস্থ।—"না, খরচ-পত্রের অভাব নাই। আমার মায়ের সৎকারের জন্য আমি লোক খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

পথিক।—"কেন, এ গ্রামে কি কোনও ব্রাহ্মণের বাস নাই ?"

গৃহস্থ।—"থাকিবে না কেন ? আমার জ্ঞাতিরাই আছেন।"

পথিক।—"তাঁহাদিগকে কোনও সংবাদ দেও নাই কেন ?"

গৃহস্থ।—"সংবাদ দিই নাই! অপরাহ্নে আমার জননী ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই সময়ই সংবাদ দিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা কেহই আমার সাহায্য করিতে আসেন নাই।"

পথিক।—"না আসার কারণ কি ? ব্রাহ্মণের এ বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া, কোনও ব্রাহ্মণ-সন্তান কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ?"

গৃহস্থ।—"আমার জ্ঞাতিদেরও তত দোষ দিতে পারি না। তাঁহারা আমার শত্রুতাচরণ করিতেছেন বটে ; কিন্তু আমার এ বিপদে তাঁহারা কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না।"

পথিক।—"তবে তাঁহারা আসিলেন না কেন ?"

গৃহস্থ।—"রাজার ভয়ে!"

"রাজার ভয়ে!"—পথিক চমকিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার আঁধারে পথিকের মুখমণ্ডল আবৃত হইয়া ছিল ; সুতরাং গৃহস্থ, পথিকের সেই ভাব-বিপর্য্যয় উপলব্ধি করিতে পারিল না। পরন্তু পথিককে নীরব থাকিতে দেখিয়া কহিল,—"আপনার বিশ্বাস হইতেছে না ? আমি সত্য বলিতেছি। রাজার ভয়েই আমার জ্ঞাতিরা আমায় সাহায্য করিতে আসিতেছেন না!"

পথিক।—"কোন্ রাজার কথা বলিতেছেন ?"

গৃহস্থ।—"এখানে আর কোন্ রাজা আছে ? আপনার নিবাস কোথায় ? আপনি কি শুনেন নাই,—নাটোরের রাজার হুকুমে অনেক দিন থেকে আমি এক-ঘরে হ'য়ে আছি।"

পথিক।—"নাটোরের রাজা! কোন্ রাজা? রাজা রামকৃষ্ণের কথা কহিতেছেন?"

গৃহস্থ।—"সে নিজে না হ'ক, তার নায়েব তো বটে। তা যাই হোক, সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। এখন আপনি আমায় একটু সহায়তা করিতে পারেন?"

গৃহস্থের উত্তর শুনিয়া, পথিক অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ছিল। পথিক হয় তো তখন ভাবিতেছিল,—"পুণ্যময়ী মহারাণী ভবানীর পুণ্যময় রাজত্বে, ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ রামকৃষ্ণের শাসনাধীনে, এরূপ অসম্ভব ঘটনা কেন সংঘটিত হইল? ব্রাহ্মণের রাজত্বে ব্রাহ্মণ-কন্যার সৎকারে ব্রাহ্মণ মিলিতেছে না! এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

পথিক কি ভাবিতেছিল, পথিকই তাহা বলিতে পারে! কিন্তু তাহাকে নীরব দেখিয়া গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্রাহ্মণ! আপনিও কি তবে ভয় পাইতেছেন? আমার জননীর কি তবে সৎকার হইবে না?"

বলিতে বলিতে গৃহস্থের চক্ষু বাহিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। পথিক যেন তাহা বুঝিতে পারিল।

পথিক উত্তেজিত-কণ্ঠে উত্তর দিল,—"সে কি বলিতেছ! আমি একাই তোমার জননীর সৎকার-কার্য্য সমাধা করিব। দেও—তুমি উহাঁকে আমার স্কন্ধে তুলিয়া দেও। আমি একাই উহাঁকে শ্মশানে বহিয়া লইয়া যাইব।"

গৃহস্থের মনে হইল,—"ইনি নিশ্চয়ই দেবতা; মানব-রূপ ধারণ করিয়া আমার সহায়তা করিতে আসিয়াছেন।"

সড়কের ধারে বহিরঙ্গণের তুলসীমঞ্চতলে, জননীর শব-

দেহের সম্মুখে বসিয়া, গৃহস্থ আর্ত্তনাদ করিতেছিল। গৃহস্থের সংসার বলিতে—তাহার পত্নী ও একটী শিশুপুত্র। বৈকাল হইতে চেষ্টা করিয়া অবসন্ন হইয়া, শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া সম্মুখের চালায় বসিয়া, পত্নী হা-হুতাশ করিতেছিল; আর তাহারই অনতিদূরে তুলসীমঞ্চতলে, গৃহস্থ, মৃত-জননীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া ছিল। পল্লী একেই বসতিশূন্য; তথাপি দুই এক ঘর যে ইতর লোকের বাস ছিল, ইচ্ছা-সত্ত্বেও তাহারা বড় একটা নিকটে ঘেঁসিতে পারিতেছিল না। কিন্তু দূর হইতে সর্ব্বদাই তত্ত্ব লইতেছিল।

পথিক যখন অভয় দিয়া উৎসাহ-প্রকাশে বলিল,—"তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমি একাই তোমার মায়ের সৎকার-কার্য্য সমাধা করিয়া দিব।"—গৃহস্থ তখন যেন মৃতপ্রাণে নবজীবন লাভ করিল।

ইহার পর পথিক একাই সেই শবদেহ স্কন্ধে ধারণ করিল; গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস। তুমি মুখাগ্নি করিয়াই চলিয়া আসিও। সৎকারের ভার আমার উপর ন্যস্ত রহিল।"

একজন প্রতিবাসীকে ডাকিয়া, পথিক তখন গৃহস্থের গৃহ-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া গেল।

পথিকের যেমন শারীরিক শক্তি, তেমনি বাক্যের গাম্ভীর্য্য।

* * *

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### শ্মশানে।

"Like fountains of sweet water in the sea,
Kept him a living soul."

—*Tennyson.*

রাজধানীর প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে বাগসরের শ্মশান-ক্ষেত্র। দুই পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল। মধ্যে একটী স্বল্প-পরিসর পথ। সেই পথে পূর্ব্বাভিমুখে ক্রোশাধিক অগ্রসর হইলে, নদীর তীর দৃষ্ট হয়।

নদীর তীরে—দুই পার্শ্বে দুই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। মধ্যস্থলে শ্মশান-ক্ষেত্র। নিকটে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। দিবাভাগেই সে স্থানে গমনাগমনে মনোমধ্যে বিভীষিকার সঞ্চার হয়।

এই অমাবস্যার গভীর নিশীথে, কে এ মহাপুরুষ—এই মহাশ্মশানে একাকী বসিয়া কি গান গাইতেছেন ?

সম্মুখে চিতাচুল্লী জ্বলিতেছে। লকলক অগ্নিশিখা আকাশ চুম্বন করিতেছে। শবকঙ্কাল বিকট আকার ধারণ করিয়া চিতানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে—কোথাও নর-কপাল, কোথাও নর-কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; কোথাও অর্দ্ধ-দগ্ধ অঙ্গারসার বংশদণ্ড ও কাষ্ঠসমূহ পড়িয়া আছে; কোথাও অর্দ্ধ-ভগ্ন কলস,—কোথাও ভূষায়-আচ্ছন্ন হাণ্ডিকা গড়াগড়ি যাইতেছে। কোথাও শিবাকুল শবমাংস-লোলুপ হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে; কোথাও সারমেয়-দল বিকট চীৎকারে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে।

এই ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্রে, এই অমানিশির গভীর অন্ধকারে, কে এ মহাপুরুষ—কি গান গাইতেছেন?

কাহার শবদেহ? কোথা হইতে আসিল? কে আনয়ন করিল? কেই বা ইনি—চিতাচুল্লী-সম্মুখে বসিয়া আপন-মনে কি গান গাইতেছেন?

গান * গাইতেছেন,—

"এখনও কি ব্রহ্মময়ী, হয়-নি মা তোর মনের মত।
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত॥
দম দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
সংসার-বিষে জ্বলি যত, দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিষ হয় মা বিষ হরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত॥
জ্ঞান-বস্ত্র দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল করিলি,
হিসাব ক'রে দেখ্ মা তারা, দুঃখের ফাজিল বাকী কত॥"

গান গাইতেছেন; আর দরদর অশ্রু-ধারায় বক্ষঃস্থল পরিপ্লাবিত হইতেছে।

গাইতেছেন—"এখনও কি ব্রহ্মময়ী হয়-নি মা তোর মনের মত!"—আর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন,—"যদি মনের মতই না হ'য়ে থাকি, কি হ'লে মা তোর মনের মত হ'তে পারি? তাই বলে দে মা—বলে দে!"

গাইতেছেন,—"অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত!" —আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন,—"অকৃতি সন্তান আমি! —তাই কি এত বঞ্চনা করিতে হয়? আর বঞ্চনা করিস্-না মা!"

গাইতেছেন, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন,—"মা! সংসারে তো তুই-ই আনিয়াছিস্! বিষয়-বিষ তো তুই-ই

* রাগিণী—গাড়া-ভৈরবী; তাল—আড়াঠেকা।

খাওয়াইয়াছিস্! বিষের জ্বালায় যে এখন জ্বলিয়া মরি! যন্ত্রণা—সহ্য হয় না! বিষ হরণ কর মা!"

গাইতেছেন,—"জ্ঞান-রত্ন দিয়েছিলি, মসিল দে ওসিল করিলি!" বলিতেছেন,—"আমার কি দোষ মা! তুই-ই দিয়েছিলি, তুই-ই লইয়াছিস্! আমার কি দোষ মা!" গাইতেছেন, আর জানাইতেছেন,—"দুঃখের ফাজিল বাকী কত আছে—একবার হিসাব ক'রেই দেখ-না মা!"

নির্জ্জন শ্মশানে গভীর নিশীথে এক-মনে গান গাইতেছেন, আর নয়ন-জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে।

সহসা রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর ডাকিলেন,—"কুমার! কুমার!"

কি প্রহেলিকা! মহারাজ রামকৃষ্ণ শ্মশানে!

কোথা হইতে কি প্রকারে তিনি শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? সম্মুখেই বা কাহার চিতানল ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে? চিতানল জ্বলিতেছে;—অথচ, অন্য লোক-জনই বা নিকটে নাই কেন? রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরই বা কেমন করিয়া এখানে আসিয়া অনুসরণ করিলেন?

"কুমার! কুমার!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে, উন্মাদের ন্যায় অগ্রসর হইয়া, রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর মহারাজের হস্ত ধারণ করিলেন; বাষ্পাকুল-কণ্ঠে কহিলেন,—"কুমার! এমন ক'রে কি আমাদের কাঁদিয়ে আস্‌তে হয়?"

মহারাজ—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ! চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ঠাকুর মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

* * *

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

"————————There—now lean on me;

Place your foot here.————"

——*Manfred.*

ঠাকুর মহাশয় ডাকিলেন,—"কুমার! এস, চল, গৃহে যাই।"

রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—"গুরুদেব! মার্জ্জনা করুন। আমি বড়-উদ্বেগের পর বড়-শান্তি পাইয়াছি।"

রুদ্রনারায়ণ।—"কুমার! তুমি শান্তি পাইতে পার; কিন্তু তোমার সংসার—তোমার আত্মীয়-স্বজন—তোমার পুত্র-পরিজন—তোমার অভাব-জনিত অশান্তি-অনলে অহর্নিশ দগ্ধীভূত হইতেছেন! সকলকে অশান্তিতে ফেলিয়া, নিজের শান্তিলাভ-চেষ্টা—এ তোমার কেমন বিচার? জিজ্ঞাসা করি,—তাঁহাদিগকে শান্তি-দানের কি ব্যবস্থা করিতেছ?

রামকৃষ্ণ।—"আমি তাহার কি করিব?"

রুদ্রনারায়ণ।—"তুমি তাহার কি করিবে! বহু আরোহিপূর্ণ নৌকা নদীবক্ষে ঘূর্ণীবায়ুতে পড়িয়া যখন বিচঞ্চল হয়;—নাবিক কি তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিবে,—আমি কি করিব? বিশাল নাটোর-রাজ্য-তরণীর কর্ণধার তুমি; বিষম ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে সে তরণী উদ্বেলিত—মগ্ন-প্রায়। এ সময় তোমার পক্ষে কি উদাসীনতা শোভা পায়?"

রামকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন,—"আমায় তবে কি করিতে বলেন ?"

রুদ্রনারায়ণ।—"চল—গৃহে ফিরে চল।"

রামকৃষ্ণ।—"গৃহে গিয়া কি করিব! বিষয়-বিষে দেহ-মন জর্জ্জরীভূত। শান্তির সন্ধানে শ্মশানে আসিয়াছি। গৃহে গিয়া শান্তি পাইব কি ?"

রুদ্রনারায়ণ।—"কুমার! অবোধের ন্যায় কথা কহিতেছ কেন? তুমি শাস্ত্র-তত্ত্ব অবগত আছ। তুমি গুরুমুখে সর্ব্বদা শাস্ত্রোপদেশ শুনিয়া থাক। তুমি বলিতেছ—গৃহে শান্তি কৈ? গৃহে শান্তি নাই তো শান্তি কোথায় আছে ?"

রামকৃষ্ণ।—"গুরুদেব! আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি বলুন, শান্তি কোথায় আছে ?"

রুদ্রনারায়ণ।—"যদি এক কথায় বুঝিতে পার, উত্তর দিতে পারি,—শান্তি—স্বধর্ম্মপালনে।"

রামকৃষ্ণ।—"কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

রুদ্রনারায়ণ।—"জনকাদি রাজর্ষিগণের বিবরণ স্মরণ হয় কি? তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন। জন্মজন্মান্তরের তপস্যার ফলে, তুমি নাটোর-রাজ্যের অধিপতি হইয়াছ। তোমার ধনৈশ্বর্য্যের অভাব নাই। তবে কেন তুমি সেই পুণ্যশ্লোক রাজর্ষিগণের অনুসরণ করিতে সমর্থ নহ? তুমি রাজা; রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালনই তোমার স্বধর্ম্ম। তুমি যদি সেই স্বধর্ম্ম-পালনে সমর্থ হও, শান্তি আপনিই করতলগত হইবে।"

রামকৃষ্ণ বলিবার চেষ্টা পাইলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ! আমার স্বধর্ম্ম—" কিন্তু বলিতে পারিলেন না। সে কথার পরিবর্ত্তে তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপভাবে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে শান্তিলাভ হয়? কিরূপেই বা জনকাদি রাজর্ষিগণের আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি?"

রুদ্রনারায়ণ।—"চল—গৃহে চল। সে উপদেশ সেইখানেই প্রাপ্ত হইবে।"

রামকৃষ্ণ।—"গুরুদেব! মন যে আর আমার গৃহে ফিরিতে চায় না!"

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"কি বলিলে কুমার!—গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না? একবার মনে কর দেখি,—তোমার অভাবে বৌমার আমার কি দশা হয়েছে? আহা!—স্বর্ণ-লতিকা যে শুকাইয়া গেল! সংসারে সোনার পুতুল—স্নেহের নন্দন—তাহার সেই সরলতা-মাখা মুখ-পানে চাহিয়াও কি তোমার ফিরিতে সাধ হয় না?"

রামকৃষ্ণ—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—'ইতস্ততঃ' করিতে লাগিলেন। মনে পড়িল—সুন্দরীর সেই সুন্দর মুখখানি! মনে পড়িল—বিশ্বনাথের বিশ্ব-আলো-করা সরল চাহনি! মনে পড়িল—প্রেম-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি! হৃদয়ের ভিতর আবার স্নেহ-মমতার নির্ঝরিণী উছলিয়া উঠিল।

রামকৃষ্ণকে নতমুখে নীরবে চিন্তা করিতে দেখিয়া, রুদ্র-নারায়ণ ঠাকুর পুনরায় কহিলেন,—'কুমার! কাহারও মুখ চাহিবে না? ঐ দেখ—শত শত প্রজাপুঞ্জ তোমার অভাবে আকুল আর্ত্তনাদ করিতেছে! ঐ দেখ—সহস্র সহস্র অন্ধ-খঞ্জ-অনাথ-আতুর তোমার দ্বারে ভিক্ষার প্রার্থনায় দাঁড়াইয়া আছে! কুমার!—তুমি না বলিতে—দানের অধিক ধর্ম্ম নাই? তুমি

না বলিতে—সর্ব্বস্ব দান করিলেও তোমার মন তৃপ্ত হয় না? তুমি না বলিতে—কাঙালের জন্য তোমার প্রাণ সদাই কাঁদিতেছে? কৈ?—সে প্রাণ এখন তোমার কোথায় গেল?—আর্ত্তের আর্ত্তনাদ নিবারণ করিবার জন্য তোমার সে ব্যাকুলতা এখন কৈ? কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য—আপনার শান্তিটুকু মাত্র লাভের আশায়—তুমি সারা সংসারটাকে অশান্তিময় করিয়া তুলিলে?"

রামকৃষ্ণ একাগ্রচিত্তে রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের তেজোগাম্ভীর্য্য-পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন, —"তাই তো!—আমার অভাবে অনেকেই তো তবে কষ্ট পাইতেছে! সত্যই তো!—আপনার শান্তিটুকুর জন্য আমি তো তবে অনেকেরই শান্তি অপহরণ করিয়াছি!"

ভাবিতে ভাবিতে রামকৃষ্ণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

এমন সময়, ঠাকুর মহাশয় গম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—"যদি অন্য কোনদিকে নাই চাও, গুরুর আদেশ—প্রত্যাবৃত্ত হও।"

"গুরুর আদেশ!" রামকৃষ্ণ মনে মনে কহিলেন—"গুরুর আদেশ!"

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইল না। রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—"চলুন—গুরুদেব! যা বলিবেন, তাই শুনিব।"

* * *

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### পরিচয়।

"পরস্পর পরস্পরকে চিনিল।"

—সাধনা।

শ্মশান হইতে মহারাজকে ফিরাইয়া লইয়া, ঠাকুর মহাশয় রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পক্ষিগণের কলরবে উষা-রাণীর অভ্যর্থনা-গীতি আরম্ভ হইল। নৈশ-অন্ধকার দূরে গহ্বরে আশ্রয় লইতে ছুটিল। চিতানল ভস্মাবশেষে পরিণত হইয়া ধরাসন গ্রহণ করিল।

সকলে চলিয়া গেল; কিন্তু এক ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। কে সে ব্যক্তি? সেই যে গৃহস্থ—মাতৃদায়গ্রস্ত—তিনি কেবল পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। তবে এখন আর তিনি একা নহেন; তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য নাটোর-রাজের দুই জন কর্ম্মচারী এখন উন্মুখ হইয়া আছেন। এদিকে তাঁহার বাড়ীতে—তাঁহার পুত্র ও পরিবারের পরিচর্য্যার পক্ষেও রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর বিশেষ-রূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

গৃহস্থের নাম—ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী। ভোলানাথ, পথিকের সাহায্যেই জননীর শবদেহ শ্মশান-ক্ষেত্রে লইয়া আসেন; পথিকের সাহায্যেই চিতার উপর সেই শবদেহ সজ্জিত হয়; পথিকের সাহায্যেই ভোলানাথ, জননীর সৎকার-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বিপদের তাড়নায় ভোলানাথ সংজ্ঞাশূন্য ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু চিতানল প্রজ্বলিত হইলে, জননীর সৎকার-কার্য্য সমাহিত হইল বুঝিয়া, তিনি যখন

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; তখন যেন তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইল; তখন, চিতানলে শ্মশানক্ষেত্র আলোকিত হইয়া উঠিলে, তিনি এক বার তাঁহার উপকারীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সাহায্যকারী ব্রাহ্মণ—অন্য কেহ নহেন—তিনি মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়।

ভোলানাথ তখন মহারাজের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। ভোলানাথ তখন মহারাজকে রাজধানীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু মহারাজ সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলে, মহারাজ বিশেষ ক্ষুণ্ণভাব প্রকাশ করিলেন; অধিক কি, সে কথা লইয়া বিশেষ কিছু আন্দোলন করিলে, মহারাজ নদীর জলে ঝম্প-প্রদান করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। পরিশেষে আরও কহিলেন,—'সৎকার-কার্য্য সমাধা হইলেই তিনি লোকালয় হইতে অন্তর্হিত হইবেন।'

এরূপ অবস্থায় ভোলানাথ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে কথা ছিল, মুখাগ্নি সারিয়াই তিনি বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন। তাই মুখাগ্নি সারিয়াই ভোলানাথ যখন উঠিয়া গেলেন, মহারাজ সেদিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। সম্মুখে চিতানল জ্বলিতে লাগিল। মহারাজ গান গাইতে গাইতে মাতোয়ারা হইয়া পড়িলেন।

ভোলানাথ সেই অবসরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রাজধানী-অভিমুখে গমন করিলেন। ভোলানাথ সেই অবসরে রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের নিকট গিয়া সকল কথা জানাইয়া দিলেন। ঠাকুর মহাশয়ও যেমনই সংবাদ পাইলেন, অমনি লোকজন লইয়া শ্মশানে আসিলেন।

* * *

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

' "ক গতাঃ মথুরাপুরী।"

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"
—মোহমুদ্গর।

মহারাজ রামকৃষ্ণ সংসারে ফিরিয়া আসিলেন। নিরানন্দ পুরী আবার আনন্দে মুখরিত হইল।

সুন্দরীর অশ্রু-নিষিক্ত মুখ-কমলে শারদীয় জ্যোৎস্নার হাসিরাশি বিকাশ পাইল। রাজধানীতে দীর্ঘকাল-ব্যাপী আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

মহারাজ ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, প্রজাবর্গ আত্মীয়-স্বজন অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মহারাজের মস্তকে আশীর্ব্বাদের পুষ্প-বর্ষণ আরম্ভ হইল। আশীর্ভাজনগণকে মহারাজ মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যাহার যাহা অভাব-অভিযোগ ছিল, সকলের সকল কথা শ্রবণ করিয়া, মহারাজ তৎসমুদায় নিরাকরণের চেষ্টা পাইলেন।

প্রতিদিন দরবার বসিতে লাগিল। রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনের ব্যবস্থা হইল। প্রার্থি-মাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া, দুই হাত তুলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। নানা স্থানের প্রজাবর্গ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া আপন আপন বক্তব্য বিষয় রাজ-

সমীপে জ্ঞাপন করিবার সুবিধা পাইল। রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর যেন কয়েক দিনের জন্য হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বৎসর কাটিয়া গেল। সুন্দরীর ক্রোড়ে দ্বিতীয় নবকুমার শোভা পাইল। মহারাণী ভবানী পুনরায় রাজধানীতে আগমন করিলেন। নামকরণে দ্বিতীয় কুমার 'শিবনাথ' নামে অভিহিত হইলেন। শিবনাথের গলদেশেও মহারাণী ভবানীর প্রদত্ত একখানি স্বর্ণ-পদক দোদুল্যমান হইল। জ্যেষ্ঠ কুমারের পদক-মধ্যে যেরূপ গোপাল-মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, কনিষ্ঠ কুমারের পদক-মধ্যে সেইরূপ কালীমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিল। সংসারে আনন্দের নূতন প্রবাহ প্রবাহিত হইল।

যেমন সাংসারিক-কার্য্যে, তেমনই রাজকার্য্যে, তেমনই দান-ব্যাপারে, চারি দিকে মহারাজের যশঃজ্যোতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

মহারাজের নিকট সকলেরই এখন অবারিত-দ্বার। সুতরাং দূর-দূরান্তর হইতেও ভিক্ষার্থী আসিয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। রুদ্রনারায়ণ ঠাকুরের পরামর্শ অনুসারে মহারাজ যথারীতি দান-কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

* * *

এক দিন রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর কার্য্যান্তরে অন্যত্র গমন করিয়াছেন। মহারাজ দরবারে বসিয়া আছেন। সভা-পণ্ডিতগণ, মন্ত্রিবর্গ, পারিষদবর্গ এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ, মহারাজকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন। রাজকার্য্য সুচারু পরিচালনা-বিষয়ে নানারূপ পরামর্শ চলিয়াছে। এমন সময়, একটী শীর্ণকায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ, মহারাজের দরবারে উপস্থিত হইয়া, মহারাজকে

আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। আশীর্ব্বাদ জানাইয়াই, মহারাজের হস্তে ব্রাহ্মণ এক খণ্ড প্রস্তর প্রদান করিলেন। প্রস্তর-খণ্ডে প্রস্তর দ্বারা কয়েকটী অক্ষর অঙ্কিত ছিল। অক্ষর কয়টী—"য-রী র-লা ই-রং ন-য়।" প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষর-কয়েকটী পাঠ করিয়া, মহারাজ কোনই অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। সভাসদ্‌গণ নানা জনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন,—'পাগলের পাগলামি।' কেহ কহিলেন,—'হেঁয়ালী।' কেহ কহিলেন,—'আপনাকে রহস্য করিয়াছে।' মহারাজ ব্রাহ্মণকে অক্ষর-সমষ্টির তাৎপর্য্য-বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণও কোনও অর্থ-নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাজ তখন সভা-পণ্ডিতগণের নিকট অক্ষর-সমষ্টির সমস্যা-পূরণের প্রার্থনা জানাইলেন। সভা-পণ্ডিতগণ অনেক ক্ষণ বিচার-বিতর্ক করিলেন। অনেক বিচার-বিতর্কের পর অক্ষর-কয়টী পাদ-পূরণ-মূলক বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইল। তখন তাঁহারা অক্ষর-কয়েকটী হইতে নানারূপ শ্লোক রচনা করিতে বসিলেন।

কাব্যরত্ন মহাশয় কহিলেন,—"এই অক্ষর-সমষ্টি হইতে এই শ্লোকটী নিষ্পন্ন হয়,—

> "যমভয়াপনয়ে ত্বমিহেশ্বরী
> ইতি রতশ্চরণেহম্ব সুমঙ্গলা।
> ইমমতিক্রান্ত মার্ত্তিযুতং নরং
> নাতি পরং যমভয়াদুদ্ধারয়॥"

অর্থাৎ, 'হে মাতঃ কালিকে! তুমি যমভয় নিবারণের একমাত্র ঈশ্বরী এবং মঙ্গলময়ী। এজন্য আমি তোমার চরণে শরণ লইয়াছি। তুমি এই প্রণতিপরায়ণ, অতিক্রান্ত, পীড়িত ব্যক্তিকে যমভয় হইতে উদ্ধার কর।'

মহারাজ রামকৃষ্ণের যেন মনোমত হইল না। মহারাজ, শাস্ত্রী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"আপনি কি মনে করেন?"

শাস্ত্রী মহাশয় কহিলেন,—"এই অক্ষর কয়টী হইতে আমি একটী শ্লোক রচনা করিয়াছি। আমার শ্লোক,—

যঃ পিত্রোঃ সততং করোতি নিতরাং ভক্তিং নমচ্ছেশ্বরী
রক্তো নাপি চিরং হৃষীকবিষয়ে ভক্তিগু'রৌ নিশ্চলা।
ইং যো নাপি কদা বিভর্ত্তিমনসা নো যস্ত বৈরো বরঃ
নো কিং তং সততং নমন্তি বিবুধাঃ স্থিরো হি মে নিশ্চয়ঃ।"

অর্থাৎ—'যিনি পিতামাতার প্রতি একান্ত ভক্তি প্রদর্শন করেন, মাতৃগণকে যিনি সতত নমস্কার করেন, বিষয়েন্দ্রিয়ে যাঁহার রতি নাই, গুরুজনে যাঁহার অচলা ভক্তি, কামদেবকে যিনি মন দ্বারাও পোষণ করেন না, যাঁহার বদ্ধবৈর নাই,—তিনি কি পণ্ডিতগণের পূজ্য নহেন? আমার স্থির নিশ্চয় ধারণা—তিনি সতত পণ্ডিতগণের পূজ্য।'

কোনও অর্থই মহারাজের মনঃপূত হইল না। ব্রাহ্মণকে কয়েক দিন অবস্থান করিতে বলিয়া, মহারাজ রামকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। সেই সূত্রে শিরোমণি মহাশয়েরও শুভাগমন হইল।

শিরোমণি মহাশয়, ভাবিয়া ভাবিয়া অক্ষর-কয়টীর একটী অর্থ-নিষ্পত্তি করিলেন। তিনি কহিলেন,—"এই বর্ণ-সমষ্টি একটি সমস্যা-মাত্র। সেই সমস্যার পূরণ করিলে, এই বর্ণ-কয়েকটী হইতে একটী শ্লোকের উৎপত্তি হইতে পারে।"

সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া শিরোমণি মহাশয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ বর্ণ-কয়টি হইতে কি শ্লোক নিষ্পন্ন হয়?"

শিরোমণি মহাশয় শ্লোকটি লিখিয়া দিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ পাঠ করিলেন,—

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং,
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।"

অর্থাৎ,—যদুপতির সেই মথুরাপুরী এখন কোথায় গিয়াছে? রঘুপতির উত্তরকোশলই বা এখন কোথায় গেল? ইহা বিবেচনা করিয়া, মন স্থির কর,—জগতের নশ্বরত্ব অবধারণ কর।

শ্লোকের এক এক চরণ পাঠ করিলেন, আর মহারাজের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ অক্ষর-সমষ্টি হইতে কি প্রকারে ঐ শ্লোকের উৎপত্তি হইল?"

শিরোমণি মহাশয় উত্তর দিলেন,—"শ্লোকের প্রতি পংক্তির প্রথম ও শেষ অক্ষরটী ঐ প্রস্তর-খণ্ডে লিখিত আছে। শ্লোকের প্রত্যেক চরণের আদি ও অন্তে লক্ষ্য করুন, সমস্যার পূরণ হইয়া যাইবে।"

সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহারাজের মনে বিষয়ের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে আবার এক অভিনব চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হইল।

মহারাজ তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রস্তরে এই অক্ষর-কয়টী কে আঁকিয়া দিয়াছেন? আপনিই বা কি উদ্দেশ্যে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"সে অনেক কথা। যদি অনুমতি করেন, জ্ঞাপন করিতে পারি।"

মহারাজ রামকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণকে সকল কথা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে কহিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন,—"আমি বড় দরিদ্র। পুত্র-পরিজনের ভরণপোষণে অক্ষম হইয়া, সংসারের কষ্ট সহিতে না পারিয়া, গৃহত্যাগী হই। কিন্তু তাহাতেও যখন শান্তি পাই না, তখন উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছিলাম। সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, হিমালয়ের পাদমূলে এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করি। শাখায় রজ্জু বাঁধিয়া, সেই রজ্জু গলদেশে সংলগ্ন করিয়া, বিলম্বিত হইব, প্রাণত্যাগ করিব—ইহাই আমার সঙ্কল্প ছিল। বৃক্ষ-শাখায় উঠিয়া, এইরূপে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগের আয়োজন করিতেছি; সহসা এক সাধুপুরুষ আমায় আহ্বান করিলেন। তাঁহার স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, আমি চাহিয়া দেখিলাম, তিনি হস্তোত্তোলনে আমাকে বারণ করিয়া কহিতেছেন,—'ব্রাহ্মণ! আত্মহত্যা করিও না; আত্মহত্যা—মহা পাপ। তোমার সংসারের কষ্ট যাহাতে দূর হয়, আমার নিকট এস, আমি তাহার উপায়-বিধান করিয়া দিতেছি।' সাধু পুরুষের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে আমি আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম। আহা!—তিনি কি দয়াল! তাঁহার চরণ-স্পর্শে কি অনুপম আনন্দই লাভ করিলাম!"

ব্রাহ্মণের যেন ভাব-বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর কি হইল?"

ব্রাহ্মণ।—"তার পর এই প্রস্তর-খণ্ড কুড়াইয়া লইয়া, অপর এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা ইহার উপর এই অক্ষর-কয়টী অঙ্কিত করিলেন। অক্ষর কয়টী অঙ্কিত করিয়া, আমাকে কহিলেন,—"যাও ব্রাহ্মণ! আমি যে এই প্রস্তর-খণ্ড দিতেছি, এই প্রস্তর-

খণ্ড গ্রহণ করিয়া নাটোর-রাজধানীতে মহারাজ রামকৃষ্ণের নিকট গমন কর। তাঁহার নিকট যাইয়া তোমার মরণ-চেষ্টার কারণ বিবৃত কর; এবং আমি যে তোমাকে এই প্রস্তর-খণ্ড দিলাম, ইহা তাঁহাকে প্রদান কর। এইরূপ করিলেই তোমার সকল দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান হইবে।"

ব্রাহ্মণের বাক্য যতই মহারাজের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, মহারাজের মন ততই নূতন নূতন ভাবনার স্রোতে ভাসমান হইল। ব্রাহ্মণের বাক্য শেষ হইলে, মহারাজ কহিলেন,—"আপনার প্রার্থনা আমি অবশ্যই পূরণ করিব। আপনার দারিদ্র্য-দুঃখ যাহাতে দূরীভূত হয়, সে পক্ষে আমার চেষ্টার ক্রটি হইবে না।"

এই বলিয়া, মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা! সেই সাধু-পুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা নাই?"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—"তিনি বলিয়াছেন, সময়ান্তরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এখন যে তিনি কোথায় থাকিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং আপাততঃ সে চেষ্টা বৃথা।"

মহারাজ।—"সেই মহাপুরুষের সহিত আমার কি কোনরূপ পরিচয় ছিল, বুঝিলেন?"

ব্রাহ্মণ।—"হাঁ, মনে হইল,—তাঁহার সহিত আপনার যেন পরিচয় আছে।"

মহারাজ সেই মহাপুরুষের আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"সে এক অপরূপ রূপ! তিনি যদি সন্ন্যাসী বেশে না থাকিতেন, তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া ভ্রম

হইত। সেই কন্দর্প-কান্তি যুবাপুরুষ কেন সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিলেন?—সন্ন্যাসীকে দেখিলে, দর্শকের মনে স্বতঃই সেই চিন্তার উন্মেষ হয়।”

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর রূপের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর যত কথাই কহিতে লাগিলেন, মহারাজের কর্ণে সে সকল কথা স্থান পাইল না। মহারাজ কেবলই ভাবিতে লাগিলেন,—“কে সে মহাপুরুষ? এ জীবনে এক বার কি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না?”

ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-দুঃখ-নিবারণের জন্য, মহারাজ রামকৃষ্ণ তাঁহাকে এক বিশেষ আয়ের সম্পত্তি দান করিলেন। সেই সম্পত্তির উপস্বত্বে ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করিবেন—বন্দোবস্ত হইল।

ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে, মহারাজের মন সেই মহাপুরুষের চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িল। আবার সেই প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষর-সমষ্টির কথা মনে পড়িতে লাগিল। আবার সেই অক্ষর-সমষ্টি-সমুদ্ভূত শ্লোকটীর বিষয় মনোমধ্যে উদয় হইল। আবার তিনি মনে মনে সেই শ্লোকটীর পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন। যতই আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, ততই মনে হইল,—রাজ্যৈশ্বর্য্যের নশ্বরতার বিষয়; ততই মনে হইল,—“আমি কোন্ কীটাণুকীট! আমার রাজত্ব—কোন্ তুচ্ছ পরমাণু মাত্র! যখন সেই যদুপতির সেই মথুরাপুরী ধ্বংস হইয়াছে, যখন সেই রঘুপতির সেই উত্তরকোশলই লোপ পাইয়াছে, তখন আর আমার রাজত্ব কয় দিন স্থায়ী হইবে! এই নশ্বর রাজত্বের মায়ায় আমি অবিনশ্বর সামগ্রীকে বিস্মৃত হইয়া আছি!”

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### মাতৃমন্ত্র।

"মন কেন মার চরণ-ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া।"

—রামপ্রসাদ।

যথাসময়ে রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষর-সমষ্টির বিষয় তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। যথাসময়ে শিরোমণি মহাশয়ের সমস্যা-পূরণের প্রসঙ্গ তিনি শ্রবণ করিলেন। যথাসময়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সম্পত্তি-দানের কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। যথা-সময়েই তাঁহার অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল,—"এ প্রবল বন্যার বালির বাঁধ কত ক্ষণ টিকিবে?"

তথাপি বিষয়ের প্রতি মহারাজের চিত্ত-স্থৈর্য্য-সম্পাদন-পক্ষে ঠাকুর মহাশয় চেষ্টার কোনই ত্রুটি করিলেন না। মহারাজের মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য তিনি বিবিধ বিষয়ে তাঁহার চিত্তকে নিয়োজিত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কখনও বা মহারাজের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; কখনও বা মহারাজকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ-পরিভ্রমণে গমন করিলেন; কখনও বা মহারাজকে বড়নগরে লইয়া গেলেন,—কখনও বা শ্রীশ্রী৺কাশীধামে রাখিয়া আসিলেন; কখনও বা আবার, বিষয়-কর্ম্মের প্রতি তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেন।

কিন্তু তাহাতেই কি মন পরিবর্ত্তিত হইল! রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর কি বুঝিলেন, তিনিই বলিতে পানেন। কিন্তু শাস্ত্রাদি আলোচনা এবং তীর্থ-পর্য্যটন-রূপ অনুকূল-বায়ুপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, মহারাজের চিত্ত আপন গন্তব্যপথেই অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইল। ফলে, সংসারের প্রতি তিনি দিন দিন অধিকতর বীতস্পৃহ হইতে লাগিলেন। যখন তিনি কাশীধামে গমন করিলেন, অন্নপূর্ণার মন্দির তাঁহার আশ্রয় হইল। সেখানে বসিয়া দিন-রাত্রি একই তানে একই গান * গাইতে লাগিলেন —

"অন্ন দে মা অন্নপূর্ণা অন্ন দে মা অন্নদে।
সারদে হৃদয়পদ্মে জ্ঞানং দেহি মা জ্ঞানদে।
ধন্য কাশী শিব ধন্য, সুরধুনী অবতীর্ণ,
বিরাজিতা অন্নপূর্ণা অঞ্জলি করে ভব দে।
হয়েছে মা ক্ষুধা-ব্যাধি, দে মা গো সুধা-ঔষধি,
অন্তে চরণে সমাধি মোক্ষং দেহি মা মোক্ষদে॥"

যখন আবার বড়নগরে গমন করিলেন, মহামায়া কিরীটেশ্বরীর মন্দির তাঁহার আশ্রয় স্থল হইল। সেখানে বসিয়া তন্ময় হইয়া গাইতে † লাগিলেন,—

"ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ পর্য্যটনে,
কালী-কথা বিনা না শুনে কাণে,
সন্ধ্যা-পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে॥

* রাগিণী—গাড়া ভৈরবী; তাল—আড়াঠেকা।

† রাগিণী—পূরবী; তাল—একতালা।

যে জন কালীর চরণ ক'রেছে স্থূল।
সহজে হ'য়েছে বিষয়ে ভুল,
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কুল,
বল সে মূল হারাবে কেমনে॥
রামকৃষ্ণ কয় তেমনি জনে,
লোকের নিন্দা না শুনিবে কাণে
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালীনামামৃত পীযূষ-পানে॥"

আবার যখন নাটোর আসেন, কখনও বা বাগসরের শ্মশানে যান, কখনও বা জয়কালীর মন্দিরে আশ্রয় লন। যখন জয়কালীর মন্দিরে আশ্রয় লন, তখন গান,—

"জয়কালী-রূপ কি হেরিলাম।
হর-হৃদে মায়ের পদে মন স'পিলাম॥
কাল-বরণে, জলধর-বরণে,
হর'পর রতন নূপুর চরণে,
কঙ্কালী-বেড়া করকিঙ্কিণী;
শোণিত-শোভিত কিংশুক জিনি।
অমরা কালিকা ধ্যান, মুদিত নয়ান,
আপনারে আপনি পাসরিলাম॥
চন্দ্র চমকে বয়ানে ধন্য,
আহা মরি মরি কি রূপ-লাবণ্য,
হেরিয়া হরিল জ্ঞান, ধিক রে প্রাণ,
জবা-দান পদে না করিলাম॥
যে আনিল মাকে ধরণী-পৃষ্ঠ,
সেই নরপতি নৃপতি-শ্রেষ্ঠ,

---

* রাগ—মল্লার; তাল—একতালা।

দ্বিজ রামকৃষ্ণ বলে, এসে ভূমণ্ডলে,
কালী কালী মুখে না বলিলাম।"

আবার যখন শ্মশানে আশ্রয় লন, তখন গান,—

"লোকের নিন্দা না শুনিবে কাণে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালীনামামৃত পীযূষ-পানে।"

এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। মধ্যে এক বার রাম-নবমীর উৎসব-উপলক্ষে কয়েক মাসের জন্য মহারাজ ভবানীপুরে ভবানী-মন্দিরে অবস্থান করিলেন।

* *
*

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### উদ্‌যোগ।

"March on, join bravely, let us to 't pell-mell!
If not to heaven, then hand in hand to hell."

—*Shakspeare.*

"আমার কিন্তু মন সর্‌ছে না। না জানি—আজ অদৃষ্টে কি আছে।"

"তোর কবেই বা কোন্ কাজে মন সরে থাকে! যতই বয়েস হ'চ্ছে, ততই তুই ভীতু হ'য়ে পড়ছিস্।"

"সাধে কি আমি ভয় পাই! ভয় পাই—পাছে ধর্ম্ম-নষ্ট হয়!"

"আমাদের ধর্ম্মই তো লুট-তরাজ-ডাকাতি!"

"লুট-তরাজ-ডাকাতি আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বটে। কিন্তু গুরুদেব! যে উদ্দেশ্যে আমরা এই ব্রত গ্রহণ ক'রেছি, আপনার তো তাহা অবিদিত নাই। আপনিই তো ব'লে থাকেন,—মায়ের কার্য্য করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

"মায়ের কার্য্যই তো করিতে বলি। একজন অতুল সম্পত্তি অধিকার করিয়া থাকিবে, আর সহস্র সহস্র দরিদ্র অন্নের জন্য হাহাকার করিবে,—মা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাই বলিয়াই তো মা আমাদিগকে এই দস্যু-বৃত্তি গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।"

"কিন্তু মা কি কখনও মায়ের মন্দির লুণ্ঠন করিতে বলিয়াছেন?"

"পণ্ডিতা! তোরে আর বুঝাইয়া পারিব না! বুঝাইলেও

তুই তো শুন্‌বি না! তোঁকে তো আগেই ব'লেছি—মায়ের মন্দির কোথায় নাই! তুই যে গৃহস্থের বাড়ী লুণ্ঠন করিস্, সেখানে কি মা অধিষ্ঠিত নাই? তবে কি ক'রে তুই গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুটিয়া আনিস্? তাতে তো কৈ তোর এমন সঙ্কোচ হয় না!"

"গৃহস্থের বাড়ী লুণ্ঠন করি বটে; কিন্তু আমরা তো কৈ কখনও দেবালয় লুণ্ঠন করি না! গৃহস্থের বাড়ী লুণ্ঠন করি বটে; কিন্তু আমরা তো কৈ কখনও মায়ের অলঙ্কার লুণ্ঠন করি না! গৃহস্থের বাড়ী লুণ্ঠন করি বটে; কিন্তু আমরা তো কৈ কখনও মাতৃস্বরূপিণী রমণীগণের অঙ্গ স্পর্শ করি না! গৃহস্থের বাড়ী লুণ্ঠন করি বটে; কিন্তু আমরা তো কৈ কখনও ধার্ম্মিকের বাড়ী, দাতার আলয়, সহৃদের আবাস-ভবন, লুণ্ঠন করি না! তাই আমার মনে পদেপদে আশঙ্কা হ'চ্ছে। তাই আমার প্রাণ কেবলই ফিরে যেতে চাইছে।"

"তুই পাগল! যে যে স্থান লুণ্ঠনের নিষেধ-আদেশ আছে, তেমন স্থান লুণ্ঠন করিতে আমি তো কৈ তোকে কোনদিনও উৎসাহিত করি নাই। আজ যে ভবানীপুর লুণ্ঠন করিতে বলিতেছি, এখানে তুই সে অন্তরায় কি দেখিলি!"

"অন্তরায়—এক সঙ্গে অনেকগুলি। দেবালয় লুণ্ঠন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা আছে; কিন্তু ভবানীপুর—পীঠস্থান, মা এখানে মূর্ত্তিমতী বিরাজমানা। সাধুর ভবন, দাতার গৃহ, লুণ্ঠন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা আছে; কিন্তু মহারাজ রামকৃষ্ণের ন্যায় সাধু, মহারাজ রামকৃষ্ণের ন্যায় দাতা, সংসারে দ্বিতীয় আছে কি? প্রতিজ্ঞা আছে—মাতৃরূপিণী রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করিব না,—তাঁহাদের অলঙ্কার লইব না; কিন্তু আপনি বলিতেছেন—

মহারাণীর অলঙ্কারসমূহ সঙ্গে আসিয়াছে, আর সেগুলি লুণ্ঠন করিতে হইবে।"

পণ্ডিতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর পুনরায় কহিল,—"যে কয়টী বিষয়ে তোর আপত্তি আছে, আমি তাহার একটীও তোকে করিতে বলিতেছি না। ভাল, ভবানীর মন্দির আক্রমণ করার কোনও প্রয়োজন নাই। মন্দির-পার্শ্বে যে প্রাসাদ আছে, চল, সেই প্রাসাদ আক্রমণ করি। কেমন, সব দোষ কাটিয়া গেল তো? স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করিবি না; ভাল, মহারাণীর অঙ্গের অলঙ্কার আমরা লইতে চাহি না। রামকৃষ্ণকে ধার্ম্মিক বলিতেছিস্? কিন্তু সে কিসের ধার্ম্মিক? সে কেবল আপন সুখৈশ্বর্য্যে আপনিই উন্মত্ত হইয়া আছে;—রাজ্যমধ্যে কত লোক যে অনাহারে মারা যাইতেছে, সে একবার সেদিকে ফিরিয়াও চায় না। আমি বলিতেছি, এ লুণ্ঠন-ব্যাপারে ধর্ম্মনাশের কোনই আশঙ্কা নাই।"

পণ্ডিতা তখনও নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

শঙ্কর কহিল,—"চুপ করিয়া রহিলি যে! যা,—আমি বল্‌ছি, আগে একবার গিয়ে সন্ধান নিয়ে আয়; কোন্ দিক দিয়ে কি ভাবে পুরী আক্রমণ ক'র্‌লে সুবিধা হ'তে পারে—সন্ধান নিয়ে আয়। যা,—আর দেরী করিস্ না!"

পণ্ডিতা তখনও কি ভাবিতে লাগিল।

শঙ্কর আবার কহিল,—"ভাব্‌ছিস্ কি? আমায় গুরু ব'লে যদি মানিস্, আমার আদেশ—যা, একবার গিয়ে সন্ধান নিয়ে আয়। দরকার মনে করিস্, জিতু আর ফতুকেও সঙ্গে নিয়ে যা!"

মন সরিল না। কিন্তু পণ্ডিতা আর আপত্তিও করিতে

পারিল না। মনে মনে কহিল,—"মা! তোমার মনে যা আছে, তাই হবে। তুমিই আদেশ ক'রছ,—তুমিই নিয়ে যাচ্ছ। যা কর্ত্তব্য পথ, তুমিই দেখাইয়া দিও।"

বনস্থল পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতা ভবানী-মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হইল। জিতু ও ফতু তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এদিকে শঙ্করের ইঙ্গিত-ক্রমে কার্ত্তিকা দস্যুদলকে সুসজ্জিত করিতে লাগিল। কেহ তরবারি ধরিল, কেহ বর্শা ধারণ করিল, কেহ বন্দুক হস্তে লইল। কোন্ দল কোন্ দিক দিয়া পুরী আক্রমণ করিবে, কার্ত্তিকা সেইমত উপদেশ প্রদান করিল।

সকলে সুসজ্জিত হইলে, শঙ্কর কহিতে লাগিল,—"আজ তোমাদের বিষম পরীক্ষার দিন। এক দিকে স্বধর্ম্ম-পালন, অন্য দিকে অধর্ম্মের উচ্ছেদে জীবন-মন সমর্পণ। যদি স্বধর্ম্ম পালন করিতে চাও, যদি স্বর্গকামনা কর;—তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হও। আর যদি জীবনের মায়া কর, তবে স্বর্গ ভুলিয়া যাও, নরকের জন্য প্রস্তুত হও,—স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেও। তবে একটী কথা স্মরণ রাখিও। জীবন তুচ্ছ—জীবন ক্ষণস্থায়ী—জীবন এখনই আছে, এখনই নাই। কিন্তু ধর্ম্ম অবিনশ্বর—ধর্ম্ম শাশ্বত। এখন সম্মুখে দুই পথ বিদ্যমান। যদি অনন্ত অক্ষয় স্বর্গলাভে কামনা থাকে, যাও—অগ্রসর হও—রাজপুরী আক্রমণ কর;—অধর্ম্মের উচ্ছেদে ধর্ম্মের বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়া যশোমুকুট মস্তকে ধারণ কর।"

সকলেই প্রস্তুত হইল। সকলেই প্রাণপণে পুরী-লুণ্ঠনে প্রতিজ্ঞা করিল। সকলেই পণ্ডিতার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিল।

## নবম পরিচ্ছেদ।

### বিভীষিকা!

"Or where auld ruin'd castles gray,
Nod to the moon,
Ye fright the nightly wand'rers' way
Wi' eldritch croon,"

—*Burns.*

গভীর নিশীথে, বনমধ্যে সমবেত হইয়া, দস্যুদল যখন ভবানী-পুরী আক্রমণের আয়োজন করিতেছিল; মহারাজ রামকৃষ্ণ তখন মন্দির-সংলগ্ন প্রাসাদের উপর বসিয়া গান গাইতেছিলেন।

গাইতেছিলেন,—

"কার রমণী সমরে বিরাজে।
কে গো লজ্জারূপা দিগম্বরী অসুর-সমাজে।
মায়ের পদতল-বরণ, জিনি তরুণ অরুণ,
নখরে নিশাকর লুকাইল লাজে॥
প্রপদ নীল নলিনী, উরু রামরম্ভা জিনি,
কটিতটে করশ্রেণী, কিঙ্কিণী বাজে॥
নাভি-সুধা-সরোবর, ত্রিবলী কি মনোহর,
পীনোন্নত পয়োধর, হৃদি'পরে সাজে॥
সুশাণ কৃপাণ করে, ঘন হুহুঙ্কার করে,
নাশে যত দনুজেরে গ্রাসে বাজি গজে।
(মায়ের) গলে মুণ্ডমালা শোভা, অট্টহাসি লোলজিহ্বা,
শ্রুতিযুগে ইষু শিশু অপরূপ সাজে॥

* রাগিণী—ললিত; তাল—আড়াঠেকা।

মুক্ত কুটিল কুন্তল, সুধাপানে চলচল,
অলি যেন আশুতোষ-হৃদয়-সরোজে।"

সঙ্গীতের স্বরে যেন আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

সঙ্গীতের আহ্বানে মা যেন সত্য সত্যই 'সুশাণ কৃপাণ করে ঘন হুহুঙ্কার করে' দনুজদলনে অগ্রসর হইয়াছেন। মহারাজ গাইতেছেন, আর দেখিতেছেন,—মা আসিয়া দনুজদলন করিতেছেন।

গানে তন্ময় হইয়া আছেন; সঙ্গীত-বর্ণিত মায়ের রূপরাশি মানসপটে প্রত্যক্ষ করিতেছেন; এমন সময়, ভবানী-মন্দিরের পশ্চিমদিকস্থিত জঙ্গলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। মহারাজ দেখিলেন,—শতাধিক আলোক-স্তম্ভ ভবানীপুরের দিকে চলিয়া আসিতেছে।

আলোক চলিয়া আসিতেছে! চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট আলোক—এ যে অপূর্ব্ব দৃশ্য! রাত্রিকালে আলেয়ার গতিবিধির কথা অনেকে শুনিয়া থাকিতে পারেন; কেহ হয় তো আলেয়া দেখিয়াও থাকিবেন। কিন্তু শতাধিক আলেয়ার একত্র সমাবেশ,—কেহ কখনও দেখেনও নাই,—কেহ কখনও শুনেনও নাই। যদি আলেয়া নয়, তবে এ কি?

একি! অগ্রসর হইতে হইতে আলোক-স্তম্ভগুলি আবার প্রত্যাবৃত্ত হইল কেন? আলোক-স্তম্ভ অগ্রসর হয়, আলোক-স্তম্ভ পিছাইয়া যায়—কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি?

মহারাজ রামকৃষ্ণ কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিলেন। গান গাইতে গাইতে তিনি দেখিলেন,—জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, আলোকস্তম্ভগুলি ভবানীপুরের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত আসিল, তার পর আপনা-আপনিই আবার ফিরিয়া গেল। কেন এরূপ ঘটিল?

দস্যুদল ভবানী-মন্দির আক্রমণের জন্য অগ্রসর। পণ্ডিতা, জিতু ও ফতু ফিরিয়া আসিলেই, দস্যুরা চারিদিক হইতে মহারাজের প্রাসাদ আক্রমণ করিবে বলিয়া সঙ্কল্পবদ্ধ। দস্যুদল ভবানীপুরের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আছে ;—ইতি-মধ্যে পণ্ডিতা শশব্যস্তে ফিরিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়াই দস্যুদলকে সম্বোধন করিয়া ভীতি-বিহ্বল-কণ্ঠে কহিতে লাগিল,—"তোমরা পালাও—পালাও। আজ আর বুঝি রক্ষা নাই।"

সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইল। শঙ্কর কহিল,—"কি বলিস্ রে পণ্ডিতা !—পালাবে কি ! রাজার দশটা বরকন্দাজ দেখেই তোর ভয় হ'ল নাকি ?"

পণ্ডিতা সমস্বরে কহিতে লাগিল—"না—না, তা নয়। মা আজ স্বয়ং পুরী রক্ষা করিতেছেন। কার সাধ্য—আজ পুরী আক্রমণ করে !"

শঙ্কর।—"তুই পাগল ! তোর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে।"

পণ্ডিতা।—"না—না, আমার মাথা খারাপ হয় নাই। আমি সত্যই দেখিলাম,—লোলজিহ্বা বিকট-দশনা—নৃমুণ্ডমালিনী খর্পরধারিণী—মা-ভবানী অট্ট অট্ট হাস্যে আমাদিগের সংহার-সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। যদি বিশ্বাস না হয়, দেখিবেন আসুন।"

পণ্ডিতার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই জিতু ও ফতু একে একে ফিরিয়া আসিল। পণ্ডিতা পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের সমাচার লইতে গিয়াছিল ; তাহারা উত্তর ও পূর্ব্ব দিকের সংবাদ লইতেছিল। তাহারা আসিয়াও সেই একই কথা ব্যক্ত করিল। তাহারাও বলিল,—"মা-চামুণ্ডা আজ স্বয়ং পুরী রক্ষা

করিতেছেন। আজ আর মায়ের কৃপাণ-মুখে কাহারও নিস্তার নাই।”

তাহারা বলিতেছে, এমন সময় পণ্ডিতা পুরীর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিতে লাগিল,—“ঐ দেখ! ঐ দেখ!—মা আসিতেছেন! ঐ দেখ!—মুক্তকেশী, দিগম্বরী, লোলজিহ্বা, মুণ্ডমালা-বিভূষণা! ঐ দেখ!—খর্পরধারিণী, অট্ট-অট্ট-হাসিনী নৃমুণ্ডমালিনী! ঐ দেখ!—রুধিরাপ্লুত-বদনা ভীষণ-দশনা ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তি! ঐ দেখ!—দনুজ-দলনী দনুজ-দলনে আজ কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ফিরে যা—ফিরে যা! পালা—পালা! ভবানীপুরের সীমানায় অগ্রসর হইলেই শাণিত কৃপাণে মা তোদিকে খণ্ড খণ্ড করিবেন।”

দস্যুদলের সকলেরই হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইল। সকলেই যেন দেখিতে লাগিল,—“সুশাণ্ কৃপাণ করে, ঘন হুহুঙ্কার ক'রে, মা যেন তাহাদের সংহার-সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন।” একে দলপতি পণ্ডিতা তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতেছে; তাহাতে আবার তাহারা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছে,—মা-ভৈরবী তাহাদের সংহার-সাধনে অগ্রসর। সুতরাং দস্যুদল কেহই আর পুরীর দিকে গমন করিতে সাহস করিল না,—কেহই আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না;—যে যে-পথে আসিয়াছিল, সে সেই পথেই প্রত্যাবৃত্ত হইল।

দস্যুদলের সঙ্গে যে মশালের আলো, দিক আলো করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও ফিরিয়া গেল।

মহারাজ যে চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট আলোক-স্তম্ভ-সমূহ দর্শন

করিতেছিলেন, দস্যুদলের মধ্যবর্ত্তী মশালের আলোকেই সেই-রূপ প্রতীত হইয়াছিল।

ভবানীপুরী লুণ্ঠন করিতে গিয়া দস্যুদল পথ হইতে ফিরিয়া আসিল দেখিয়া, শঙ্কর মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইল। মনে মনে কহিল,—"আমি যে আশায় দস্যুদলে মিশিয়াছিলাম, আমার সে আশা পূরণ হইল কৈ? এই অন্ধ-বিশ্বাসী মূঢ় দস্যুদলের সহিত মিশিয়া আমার আশা-পূরণের কোনই সম্ভাবনা নাই।"

শঙ্কর ভাবিতেছে,—"তবে এখন কি করি! তবে কি আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না? তবে কি আমি রামকৃষ্ণের সংহার-সাধনে সমর্থ হইব না? তবে কি আমার এই নীচ ব্রত-গ্রহণ নিরর্থক হইল? কি করি!—কি উপায় আছে?"

শঙ্কর ভাবনায় বিভোর। পণ্ডিতা সম্মুখে আসিল। কথায় কথায় অনেক কথা উঠিল। কথায় কথায় বচসা হইল।

শঙ্কর, পণ্ডিতাকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিল। পণ্ডিতা অপরাধ স্বীকার করিতে চাহিল না। পরন্তু বলিল,—"আপনার পরামর্শ অনুসারে চলিয়া আমরা যে কত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ মা আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। আমরা আর কখনও অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না।"

পণ্ডিতা আর কখনও শঙ্করের সহিত এরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহে নাই। সুতরাং আজ পণ্ডিতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, শঙ্করের মনে মনে বড়ই রাগ হইল। রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে, শঙ্কর, সেই দিন হইতে দস্যুদল পরিত্যাগ করিয়া, কি জানি কোথায় চলিয়া গেল। ইহার পরই দস্যুদল হইতে শঙ্কর নাম

লোপ পাইল। বুঝি বা শঙ্কর, সর্পের খোলস ত্যাগের ন্যায়, শঙ্কর নাম পরিত্যাগ করিল।

*  *  *

পরদিন প্রভাতে মহারাজ রামকৃষ্ণের নিকট একখানি পত্র এবং হাজার টাকার একটী তোড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। টাকার তোড়া এবং পত্রখানি যে ব্যক্তি লইয়া আসিয়াছিল, মহারাজ রামকৃষ্ণের ভৃত্যের দ্বারা সে তাহা মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিল। ভৃত্য টাকার তোড়া ও পত্র লইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইতে-না-হইতেই, পত্র-বাহক অন্তর্হিত হইল।

পত্র পড়িয়া মহারাজ যখন পত্র-বাহকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন কেহই আর তাহার সন্ধান পাইল না। এতই ক্ষিপ্রগতিতে কাজ সারিয়া পত্র-বাহক সরিয়া পড়িল।

পত্রখানি কে লিখিল? টাকার তোড়াই বা কোথা হইতে আসিল? পত্র-বাহক অন্তর্হিত হউক, কিন্তু পত্রখানি তো মহারাজের জিম্বায় ছিল! সুতরাং সে কথা সহজেই জানা যাইতে পারিত। কিন্তু মহারাজ রামকৃষ্ণ সে কথা কিছুই আর প্রকাশ করিলেন না। কেবল একবার মনে মনে কহিলেন,—"পণ্ডিতা! তুমি ডাকাইত হইলেও সাধুপুরুষ।"

*  *  *

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## ষষ্ঠ খণ্ড।

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥
রসোঽহমপ্‌সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥"

——শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হে ধনঞ্জয়! আমি ভিন্ন সংসারে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শ্রেষ্ঠ কারণ আর কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণি-সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতে এই বিশ্ব-সংসার গ্রথিত রহিয়াছে।

হে কৌন্তেয়! আমিই সলিলে রস, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভা, সর্ব্ববেদে প্রণবধ্বনি, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্য-সমূহে পৌরুষ।

* * *

# রাজা রামকৃষ্ণ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### জয়কালী-পূজা।

"দেও করতালি, জয় জয় বলি,
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ।"

—হেমচন্দ্র।

জয়কালীর মন্দির-প্রাঙ্গণে এক সঙ্গে এক শত ঢাকের বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

আজি তো কোনও পূজা-পার্ব্বণের দিন নহে! আজি হঠাৎ এমন কি সমারোহ-ব্যাপার উপস্থিত হইল?

ষোড়শোপচারে মায়ের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। নাটমন্দিরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ চণ্ডীপাঠ করিতেন। ধূপ-ধূনা-গুগ্‌গুলাদির গন্ধামোদে পুরী আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজিয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢক্কা-নিনাদে রাজধানী কম্পিত হইতেছে।

এক দিকে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন চলিয়াছে। অন্য দিকে কাঙ্গালী-বিদায়ের ব্যবস্থা হইতেছে। রাজধানীর প্রায় প্রত্যেক কর্ম্মচারীই কোন-না-কোনও কার্য্যে বিব্রত রহিয়াছেন।

কেন?—এ মহা-মহোৎসব আজ কিসের জন্য?

মহারাজ রামকৃষ্ণ কয়েক মাস কাল ভবানীপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন, রাজকার্য্যের বিষয় কিছুই তিনি লক্ষ্য করিতেন না। মহারাণী ভবানী সেই সম্বাদ শুনিতে পাইয়া

পুনরায় তাঁহাকে নাটোরে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন। এই সূত্রে তিনি রামকৃষ্ণকে নানারূপ তিরস্কার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নাটোর-রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াও, রামকৃষ্ণ আর বিষয়-কর্ম্মে আসক্ত হইলেন না। পরন্তু বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল।

যে কালীশঙ্কর ভূষণা-পরগণায় গিয়া জমিদারী আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের কার্য্যাধ্যক্ষগণের উদ্যোগে তাঁহাকে নাটোরে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইল। মহারাজ এক কথায় কালীশঙ্করের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। কালীশঙ্করের প্রতি কোনরূপ দণ্ড-বিধান করা দূরে থাকুক, কালীশঙ্করের প্রার্থনা-অনুসারে তিনি তখন কালীশঙ্করকেই ভূষণা-পরগণা ইজারা দিয়া বসিলেন। বগুড়া-জেলার সেরপুর প্রভৃতি স্থান, মহারাজ আপনার অন্যতর পারিষদ অনুপনারায়ণকে দান করিলেন। অন্যান্য প্রকারেও নানা সম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর রূপে দান করিতে লাগিলেন। এদিকে খাজানা-পত্র আদায়ের পক্ষেও শৈথিল্যের অবধি রহিল না। কোনও কোনও পরগণায় নায়েব-গোমস্তারা খাজনা-পত্র আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিল। তাহাদিগের দণ্ডবিধানের চেষ্টা হইলে, তাহারা একটু কাঁদিয়া পড়িলেই, মহারাজ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন।

রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর অভিমানে মহারাণী ভবানীর নিকট চলিয়া গেলেন। এদিকে কোম্পানীর রাজস্ব বাকী পড়ায় সম্পত্তি একে একে নিলামে উঠিতে লাগিল। দুই-চারি-মাসের মধ্যেই এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল।

যে দিন প্রথম একটী সম্পত্তি কোম্পানীর রাজস্বের দায়ে নিলামে উঠিল, সেই দিন মহারাজ রামকৃষ্ণ ষোড়শোপচারে মহাধূমধামে জয়কালীর পূজার ব্যবস্থা করিলেন। উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"আঃ!—বাঁচিলাম! আজ আমার একটী বন্ধন ছিন্ন হইল!"

ঐ যে জয়কালীর মন্দিরে আজ মহামহোৎসব; ঐ যে শত-ঢক্কানিনাদে রাজধানী আজ প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে; ঐ যে কাঙ্গালী-বিদায় ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতির সমারোহ চলিয়াছে; মহারাজের একটী প্রধান পরগণা রাজস্বের দায়ে নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে;—সেই সংবাদ অবগত হইয়াই মহারাজ জয়কালীর মন্দিরে ঐরূপ পূজার আয়োজন করিয়াছেন। এক দিকে মহা-সমারোহে পূজা-হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে; অন্য দিকে মায়ের সম্মুখে গললগ্নীকৃতবাসে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মায়ের নিকট মহারাজ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—"মা! ইচ্ছাময়ী তারা তুমি! জানি না—কত দিনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে! জানি না—কত দিনে একটী একটী করিয়া আমার এই বন্ধনগুলি ছেদন করিতে পারিব!"

প্রথম দিন সম্পত্তি নিলামে বিক্রীত হইয়া গেলে, মহারাজ যেরূপ সমারোহে জয়কালীর পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তি-কালেও এক একটী সম্পত্তি যেমন যেমন নিলামে বিক্রীত হইয়াছিল, মহারাজ সেইরূপ সমারোহেই ষোড়শোপচারে মহামায়ার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

* * *

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

---

### প্রতিহিংসায় পুরস্কার!

"The fairest action of our human life,
Is a scorning to revenge an injury:"

—*Lady Carew.*

বিষয়ী দেখিতেছেন,—'টাকা গোল; টাকাই সকল গোলের মূল।' যিনি বিষয়ে আকৃষ্ট নহেন, তিনি দেখিতেছেন, —'টাকা সাদা; টাকায় মন কালিমা-কলুষিত হইতে পারে না।' সংসারীর নিকট টাকা গোলও বটে, টাকা সাদাও বটে। যাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তাঁহার নিকট টাকা সেই প্রভাবই বিস্তার করিয়া থাকে। যতই গোল পাকাইবে, টাকায় ততই গোল পাকাইয়া তুলিবে; যতই সাদা ভাবিবে, ততই মনের ময়লা দূর হইতে থাকিবে।

সাধুগণ বলেন,—টাকা থাকাও দোষ, না থাকাও দোষ। মানুষ-মাত্রেই কামনার দাস। যাহারা কামনার অধীন, টাকা থাকিলেও তাঁহারা বিব্রত হন; আবার টাকা না থাকিলেও তাঁহারা বিব্রত হন।

রামকৃষ্ণ দরিদ্রের সন্তান ছিলেন; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলে, সুখী হইবেন—বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তিনি এখন দারুণ মনের অসুখে কালযাপন করিতেছেন। বিষয়কে তাঁহার বিষম বন্ধন বলিয়া মনে হইতেছে; আর সেই বন্ধনের যন্ত্রণায় তিনি অহর্নিশ ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছেন।

এদিকে তাঁহার বাল্যসহচর রাখাল, সংসারের সহিত বিষম সংগ্রাম করিয়াও, কুকর্ম্ম-কদাচারে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াও, টাকার সংস্থান করিতে পারিতেছে না। সেই ক্ষোভে তাহার প্রাণ চির-অশান্তিময় হইয়া আছে। তাহার বাল্যসহচর গোপাল, মহারাজ রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হইয়া, অনায়াসে অর্দ্ধ-বঙ্গের অধীশ্বর হইল; আর সে, সারাজীবন 'হা অর্থ—যো অর্থ' করিয়াও, আপন দৈন্য-দারিদ্র্য দূর করিতে পারিল না! গোপাল রাজা হইল, আর রাখাল ভিখারীই রহিল! গোপাল কোটীপতি হইল, আর রাখাল কপর্দ্দক সঞ্চয় করিতে পারিল না! এ কি অল্প ক্ষোভের বিষয়! এই ঈর্ষানলে রাখালের হৃদয় অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছে; দারিদ্র্যের পীড়ন যত কঠোর না হউক, গোপাল যে রাজা হইয়াছে—স্মৃতির এই বৃশ্চিক দংশন, রাখালকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে।

মহারাণী ভবানী যেদিন গোপালকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন, পোষ্যপুত্র-নির্ব্বাচনে বিফল-মনোরথ হইয়া রাখালকে যেদিন বিষণ্ণ-মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইল;—সেই দিন হইতেই রাখলের হৃদয়ে ঈর্ষার অঙ্কুর প্রথম উন্মেষিত হয়। পিতা হলধর মৈত্রের উৎসাহ-বারি-সেচনে, বিষাঙ্কুর ক্রমশঃ মুকুলিত ও পল্লবিত হইতেছিল। এখন তাহা বিষফল-সমন্বিত কাণ্ডশাখা-যুক্ত মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়া, সমস্ত হৃদয়টাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

রাখালের সদাই চিন্তা,—'কি করিলে, রামকৃষ্ণ অপদস্থ হয়! —কি করিলে, রামকৃষ্ণের সম্পত্তি অপহরণ করিতে পারি!'

পিতাকে উত্তেজিত করিয়া, রাখাল দুই-তিন বার প্রকাশ্য-

ভাবে রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। খাজুরা-গ্রামের রঘুনন্দন লাহিড়ীর আত্মীয়গণের সাহায্যে রামকৃষ্ণকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য নবাব মীরজাফরের নিকট যে দরবার হইয়াছিল, রাখালই তাহার প্রধান উৎসাহদাতা ছিল। হলধর মৈত্র যে সেই ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন,—প্রধানতঃ রাখালেরই উৎসাহে। রাখাল সকল কার্য্যেই পিতার সঙ্গী ছিল। তবে সে অল্পবয়স্ক বলিয়া, তখন সকল দরবারে উপস্থিত হইতে পারে নাই। আপন অপকর্ম্মের জন্যও সে তখন জনসমাজে ততদূর প্রতিষ্ঠাপন্ন হয় নাই।

সকল ষড়যন্ত্রে বিফল-মনোরথ হইয়া, রাখাল এখন তাই উপায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

যেদিন বিষয়-বিক্রয়-ব্যপদেশে মহারাজ রামকৃষ্ণ জয়কালীর মন্দিরে মহাসমারোহে ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিলেন; সেই রাত্রিতে মহারাজের মন পুনরায় শ্মশানের দিকে প্রধাবিত হইল; সেই রাত্রিতে মহারাজ সঙ্গোপনে পুনরায় বাগ্‌সরের শ্মশান-ক্ষেত্রে গমন করিলেন।

* * *

গভীর রাত্রি। মেঘ উঠিয়াছে। আকাশ কৃষ্ণকাদম্বিনী-সমাচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। কড় কড় কুলিশ-নিনাদে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে।

সহসা প্রচণ্ড বায়ু বহিল। মেঘমণ্ডল খণ্ড খণ্ড উড়াইয়া দিল। বারিবর্ষণ ঘটিল না।

প্রকৃতির এই ভাব-বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করিয়া, শ্মশানে যোগাসনে উপবিষ্ট মহারাজ রামকৃষ্ণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

আকাশের পানে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেন বারিবর্ষণ ঘটিল না ? আমার হৃদয়-মরুভূমে, কচিৎ কৃষ্ণ-কাদম্বিনীর সঞ্চার হয়, কচিৎ বিদ্যুৎ চমকায়, কচিৎ কুলিশ-নিনাদ শুনা যায় ; কিন্তু কেন বারি-বর্ষণ হয় না ? দুশ্চিন্তা-বায়ু! —তুই সব উড়াইয়া লইয়া গেলি ? বিন্দু বিন্দু বাষ্প-সঞ্চয়ে একটু একটু মেঘের সঞ্চার হয় ; প্রচণ্ড বায়ু, অমনি তাহা উড়াইয়া দিস্ !"

মন কোনই উত্তর দিতে পারিল না। মহারাজ আপনা-আপনিই কহিলেন,—"তবে উপায় কি হইবে ? এ মরুমাঝে কখনও কি ঘনমেঘের সঞ্চার হইবে না ? বর্ষার প্লাবনে ধরণী পরিপ্লাবিত হয় ; আমার প্রাণে কি প্রেমের প্লাবন এক বার বহিবে না ? কোথা দীননাথ ! তোমার করুণার সুধাধারায় এক বার এ প্রাণ অভিষিক্ত কর।"

বলিতে বলিতে, ভাবিতে ভাবিতে, দেখিলেন,—সম্মুখে যেন মা আদ্যাশক্তি মূর্ত্তিমতী বিরাজমানা ! মন অমনি বলিল,— "প্রাণ দিয়া মার পূজা কর।" মহারাজের হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। মহারাজ গাইলেন,—

হৃদকমলে কর পূজা সে রাঙা চরণ।  
নরক-যাতনা আর তো রবে না,  
পূজ্‌লে সে রূপ—ওরে ও মন্।  
আঁখি-জলে গঙ্গাজল কর্‌রে সে পূজায়।  
ভজন-পূজন সকল চেয়ে তুষ্ট যে মা তায়॥  
আরও এক কাজ,— পূজ্‌বি যদি মায়।  
বক্ষ চিরে, রক্ত নিয়ে, মাখা রাঙ্গা পায়॥  
( মার ) রাঙ্গা রঙ তায় গাঢ় হবে—  
গাঢ় হইলেই কালী।  
সে কালীতে, ও ভোলা মন, ঘুচ্‌বে মনের কালী॥

রক্তজবা—রক্তচন্দন, তাকেই বলা যায়।
ভজন-পূজন, তার কাছে আর, আছে বা কোথায়।
তাই বলি মন, কর' এমন, যদি পূজতে চাও।
ফুল-জল-চন্দনে মায় এমনে সাজাও ॥
তবেই গতি, তবেই মুক্তি, তবেই পাবে—সে রাঙা চরণ ॥
( ভজ্‌লে সে রূপ—ওরে ও মন ! )

গান গাইতে লাগিলেন। আর মনে মনে কহিলেন,—"রক্ত-জবা, রক্তচন্দন—এর বাড়া আর কি হইতে পারে ?" প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"আমিও বক্ষের রক্ত দিয়া মার পূজা করিব।"

* * *

এ কি ! এ গভীর আঁধারে মুখ লুকাইয়া, উন্মাদের ন্যায়, কাঁপিতে কাঁপিতে, মহারাজের দিকে কে এ অগ্রসর হইতেছে ?

পার্শ্বস্থিত চিতার আলোকে আগন্তুকের হস্তে কি ও চক্‌চক্ করিতেছে ? শাণিত ছুরিকা ! মহারাজের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া, শাণিত ছুরিকা-হস্তে আগন্তুক কেন অগ্রসর ?

আগন্তুকের মুখমণ্ডল কি ভীষণতাপূর্ণ ! তাহার সর্ব্বাঙ্গ কালিমা-বিলেপিত ; কটির বসন মালকোচায় দৃঢ়বদ্ধ। এই ভীষণ বেশে, গভীর নিশীথে, শাণিত ছুরিকা-হস্তে, সে কেন মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে ?

ঐ দেখ !—ধীরে ধীরে নিকটে আসিল ! ঐ দেখ !—বক্ষ লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা উত্তোলন করিল ! ঐ—ঐ বুঝি, তাহার শাণিত ছুরিকাঘাতে মহারাজের বক্ষঃদেশ বিদ্ধ হইল !

এ কি ! আবার ফিরিল কেন ?—আবার পিছাইয়া আসিল কেন ?

ঘাতক দেখিল,—'রামকৃষ্ণের বদনমণ্ডলে সরলতার শুভ্র-জ্যোতিঃ প্রকটিত। তাঁহার মুখমণ্ডলে দয়া-দাক্ষিণ্য-পরোপকারের কি যেন এক স্বর্গীয় সুষমা প্রকাশ পাইতেছে!'

তাই কি সে ফিরিয়া আসিল! ঐ নিরীহ প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া, ঘাতকের হৃদয়ে কি দয়ার সঞ্চার হইল!

এ কি! ঘাতক চমকিয়া উঠিল কেন?

ঘাতকের মনে হইল,—"এই মহাপ্রাণ উদার সহৃদয় মহাত্মাকে বিনা কারণে কিরূপে বিনাশ করিতে পারি! আমার ধনৈশ্বর্য্যে কাজ নাই। আমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি সমূলে নির্ম্মূল হউক! এমন নৃশংস কাজ আমি কখনই করিতে পারিব না! যাই—উহাঁর চরণতলে লুটাইয়া পড়ি;—উহাঁর নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা চাই।"

ঘাতক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কি করিবে, অনেক ক্ষণ কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

এ কি! ফিরিয়া আসিয়াও ঘাতক আবার অগ্রসর হইল কেন? আবার সেই শাণিত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া মহারাজের প্রতি ধাবমান হয় কেন?

বুঝি দুর্ম্মতি-রাক্ষসী আবার তাহার মস্তিষ্কে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল!

ঘাতক ভাবিতে লাগিল,—"আমি এতই কাপুরুষ! মন এখনও দৃঢ় করিতে পারিলাম না! যাই—যাই! এবার আর আমি কোনক্রমেই প্রত্যাবৃত্ত হইব না। রামকৃষ্ণ! আজ আর আমার হস্তে তোমার নিষ্কৃতি নাই!"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, ছুরিকা উত্তোলন-পূর্ব্বক সবেগে

অগ্রসর হইতেই—এ কি—ঘাতক কেন চীৎকার করিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল!

মহারাজ রামকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইবা মাত্র, ঘাতক দেখিতে পাইল,—'যেন মা-ভৈরবী খড়্গহস্তে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে অগ্রসর।' তাই সে আতঙ্কে 'মা মা' রবে চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকা হস্তস্খলিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তাহার উচ্চ চীৎকারে এবং ছুরিকা-পতনের ঝন্‌ঝন্ শব্দে, মহারাজ রামকৃষ্ণের ধ্যান-ভঙ্গ হইল। মহারাজ চমকিয়া উঠিলেন।

কে এ আগন্তুক!—কে এ ঘাতক!

এ কি—শঙ্কর!—দস্যুদলপতি শঙ্কর! ভবানী-মন্দির লুণ্ঠন করিতে পারে নাই বলিয়াই কি এই শ্মশানে মহারাজকে হত্যা করিতে আসিয়াছে?

শঙ্করকে মহারাজ কখনই চিনিতেন না। কিন্তু শঙ্করের এ মুখ যেন তাঁহার পরিচিত মুখ বলিয়া বোধ হইল। কত দিন—স্মরণ হয় না—যেন কত দিন পূর্ব্বে—সেই মুখের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল।

মহারাজ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? এই গভীর নিশীথে এ শশ্মানে কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

মহারাজ, ভূলুণ্ঠিত আগন্তুকের হস্তধারণ-পূর্ব্বক, তাহাকে উত্তোলন করিলেন।

"আমি—আমি! আমায় ক্ষমা করুন!" এই বলিয়া আগন্তুক মহারাজের চরণতলে নিপতিত হইল।

এ কি! এ যে পরিচিত কণ্ঠস্বর! স্বর শুনিয়া, মুখ দেখিয়া,

রামকৃষ্ণ ও দস্যুদলপতি শঙ্কর।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

মহারাজ রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলেন,—"রাখাল—রাখাল ! তুমি এখানে কোথা থেকে এলে—ভাই ?"

আগন্তুকের হস্তধারণ-পূর্ব্বক মহারাজ আরও কহিলেন,—"ভাই ! অনেক দিন পরে তোমায় দেখ্‌তে পেয়ে আজ বড় আনন্দ হ'ল ! তোমার সব মঙ্গল তো—ভাই !"

আগন্তুকের অনেক ক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনেক ক্ষণ সে একদৃষ্টে মহারাজের মুখপানে চহিয়া রহিল। তাহার মুখমণ্ডলে গভীর আত্মগ্লানির চিহ্ন প্রকটিত হইল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া, মহারাজ পুনরায় কহিলেন,—"রাখাল !—নিরুত্তর কেন ভাই ! তোমায় আজ এ বেশে দেখ্‌ছি কেন ?"

আগন্তুক আর নিরুত্তর থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে মর্ম্মান্তিক স্বরে উত্তর দিল,—"আমি আর রাখাল নই ! আমি রাখালের প্রেতাত্মা ;—আমি দস্যুদলপতি শঙ্কর। কি জন্য আসিয়াছি,—জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আসিয়াছিলাম—ঐ ছুরিকায় তোমার প্রাণনাশ করিব সঙ্কল্প করিয়া।"

রামকৃষ্ণ বিস্মিত হইলেন। যে দস্যুদলপতি শঙ্করের নামে উত্তর-বঙ্গ সর্ব্বদা সশঙ্ক, তাঁহার বাল্য-সহচর রাখালই কি সেই দস্যুদলপতি শঙ্কর ! রামকৃষ্ণের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দস্যুদলপতি হইলেও, রাখাল যে তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিবে—সে চিন্তাও তিনি মনোমধ্যে স্থান দিতে পারিলেন না। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই ! তুমি কি আমায় পরীক্ষা করিতে আসিয়াছ ! তুমি আমার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতেছ—স্বচক্ষে দেখিলেও, আমি তাহা বিশ্বাস করি না।"

আগন্তুক অনুশোচনা-প্রকাশে কহিল,—"আমি সত্যই বলিতেছি—আমিই সেই শঙ্কর ডাকাইত। আমি সত্যই বলিতেছি —আমি আপনাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলাম।"

রামকৃষ্ণ।—"কেন ভাই! কেন তুমি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ? আমিই বা কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমায় তুমি হত্যা করিতে আসিয়াছ?"

রাখাল নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কি অপরাধে, কেন মহারাজকে হত্যা করিতে আসিয়াছে,—সে কথার কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

রামকৃষ্ণ আবার কহিলেন,—"বল ভাই—বল! কি উদ্দেশ্যে আমায় হত্যা করিতে আসিয়াছিলে? আমায় হত্যা করিলে তোমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? তুমি অকপটে সকল কথা প্রকাশ কর। তুমি যে উদ্দেশ্যে আমায় হত্যা করিতে আসিয়াছিলে, আমার সাধ্যাতীত না হইলে, তোমার সে উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ করিব।"

রাখাল আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—"রামকৃষ্ণ কে? রামকৃষ্ণ কি দেবতা! আমি দস্যু; আমি তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছি; আর সে কি-না আমায় বলিতেছে—'তোমার কি প্রয়োজন, আমায় খুলিয়া বল; আমার সাধ্যাতীত না হইলে, আমি তাহা সিদ্ধ করিব।' এ কি কখনও মানুষে বলিতে পারে?"

যতই চিন্তা করিতে লাগিল, রাখালের হৃদয় অনুশোচনায় ততই অবসন্ন হইয়া পড়িল। পুনরায় রামকৃষ্ণের চরণতলে নিপতিত হইয়া, রাখাল বলিতে লাগিল,—"ভাই! ক্ষমা

কর!—আমায় ক্ষমা কর। তোমায় চিনিতে না পারিয়া, আমি এ ঘোর অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম—তুমি মানুষ হইয়াও দেবতা! তুমি ক্ষমা না করিলে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।”

পুনরায় রাখালের হস্তধারণ-পূর্ব্বক মহারাজ রামকৃষ্ণ কহিলেন,—“ভাই! তুমি বৃথা কেন অনুশোচনা করিতেছ! যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। এখন, তুমি যে জন্য আমায় হত্যা করিতে আসিয়াছিলে, তাহা জানিতে পারিলে, আমার উদ্বেগ দূর হয়। তুমি একটুও সঙ্কোচ বোধ করিও না। আমায় স্পষ্ট করিয়া সকল কথা বল।”

রাখাল।—“আমি ঘোর নারকী! আমার উচিত শাস্তি—আমার প্রাণদণ্ড! ঐ ছুরিকা পড়িয়া আছে!—আপনি আমার বক্ষঃস্থলে ঐ ছুরিকা বিদ্ধ করুন!—আমার পাপের উচিত দণ্ড হউক।”

এই বলিয়া, উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া, সেই ছুরিকা কুড়াইয়া লইয়া রাখাল বলিল,—“আপনার যদি সঙ্কোচ-বোধ হয়, আপনার সম্মুখে আমি এই ছুরিকা আমার বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দিতেছি।”

রাখাল আপনার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, মহারাজ রামকৃষ্ণ তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। বাধা দিয়া কহিলেন,—“রাখাল! তুমি পাগল হইয়াছ? আমি তো কৈ তোমায় কিছুই বলি নাই! তবে তুমি কেন আত্মহত্যার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছ? আত্মহত্যা যে মহাপাপ!”

রাখাল।—“আমি যে পাপ করিয়াছি, তার কাছে এ পাপ কোন্ ছার! আমি বিনা কারণে আপনার ন্যায় দেবতার হত্যা-সাধনে

অগ্রসর হইয়াছিলাম! আমার কি আর পাপের অবধি আছে?"

এই বলিয়া রাখাল, একে একে আপন জীবন-কহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। কি প্রকারে, পোষ্য-পুত্র-গ্রহণ-ব্যাপারে, তাহার হৃদয়ে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠে; রাজৈশ্বর্য্যের অভিলাষী হইয়া, রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, কি প্রকারে সে অপমানিত হয়; আর সেই অপমানের প্রতিশোধ-কামনায় উত্তেজিত হইয়া কিরূপে সে রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্রে যোগদান করে; শঙ্কর-নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক দস্যুদলে মিলিত হইয়া, কিরূপে সে ভবানীপুরী আক্রমণে রামকৃষ্ণের সংহার-সাধনে চেষ্টা পায়; পরিশেষে, দস্যুদলের অকৃতকার্য্যতায়, দস্যুদল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, শ্মশানে রামকৃষ্ণের হত্যার জন্য কিরূপে সে অনুসরণ করে;—একে একে সকল কথাই বিবৃত করিল।

মহারাজ রামকৃষ্ণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাই যদি, যদি অর্থলোভেই আমায় হত্যা করিতে আসিয়া থাক, আজ আমায় হত্যা করিতে পারিলে, তোমার কি লাভের সম্ভাবনা ছিল? আমার জীবনান্ত হইলে, আজ তো তুমি আমার নিকট একটী কপর্দ্দকও পাইতে না! তবে তুমি কি আশায় আজ এই নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে?"

রাখাল।—"মহারাজ! আর কেন আমায় যন্ত্রণা দেন? সে কথা স্মরণ করিতেও এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা,—আপনি আমায় ঐ ছুরিকা-খানি প্রদান করুন; আমি আপন হস্তে আপন বক্ষে বসাইয়া দিয়া শান্তিলাভ করি।"

রামকৃষ্ণ।—"ভাই! এক পাপের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছ; আবার কেন আত্মহত্যা-রূপ নূতন পাপে লিপ্ত হইতে চাও? সকল কথা সত্য করিয়া বল;—এখনও শান্তিলাভের উপায় আছে? বল ভাই—বল, আজ কি আশায় এই শ্মশানে আমায় হত্যা করিতে আসিয়াছিলে?"

রাখাল।—"আমার সঙ্গে সঙ্গে আর এক জনের বিপদ ডাকিয়া আনিতে হইল! তাই বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। কিন্তু আপনি যখন পুনঃপুনঃ আদেশ করিতেছেন, আমায় বলিতে হইতেছে।"

এই বলিয়া রাখাল একজনের নাম উচ্চারণ করিল। সে ব্যক্তি—মহারাজ রামকৃষ্ণের জ্ঞাতি। মহারাজ রামকৃষ্ণের যদি মৃত্যু হয়, মহারাজের কতকগুলি সম্পত্তিতে তাহার অধিকার বর্ত্তিতে পারে। তাই সে অনেক দিন হইতে মহারাজের জীবন-নাশের চেষ্টায় ছিল। অপর কোনরূপে কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারিয়া, অবশেষে সন্ধানে সন্ধানে সে দস্যু-সর্দ্দার শঙ্করের সহায়তা প্রার্থনা করে। শঙ্কর-রূপী রাখালও সেই পথের পথিক ছিল। সুতরাং দুই জনে মিল হইয়া যায়। সর্ত্ত হয়,—রামকৃষ্ণের নিধন-সাধনে তাঁহার জ্ঞাতি যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে, রাখাল তাহার অর্দ্ধেক অংশ লাভ করিবে। মহারাজ রামকৃষ্ণ যে সেই রাত্রিতে একাকী বাগ্‌সরের শ্মশানে আসিয়া ছিলেন, শঙ্করকে সেদিন মহারাজের সেই জ্ঞাতিই সে সন্ধান প্রদান করিয়াছিল।

মহারাজ রামকৃষ্ণ একে একে যতই সে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"হায় অর্থ!

তুমিই যত অনর্থের মূল!" তিনি একবার ভাবিলেন,—"আমার এই অতুল বিভব,—আমি যদি ইহার কিয়দংশ রাখালকে প্রদান করিতাম, রাখাল কখনই এই নীচবৃত্তি অবলম্বন করিত না!" আবার ভাবিলেন,—"আমার ন্যায় ধনকুবেরগণই দেশের যত-কিছু অপকর্ম্মের মূল কারণ। আমরা যদি দেশের সমস্ত অর্থ-সম্পৎ অধিকার করিয়া না বসিতাম, আমাদের এই ধনসম্পত্তি যদি লোকের আবশ্যকানুসারে বণ্টন করিয়া দিতে পারিতাম, দেশের অনেক অশান্তি অনেক অপকর্ম্ম অঙ্কুরেই লোপ পাইত।"

ভাবিতে ভাবিতে মহারাজ রামকৃষ্ণ রাখালকে কহিলেন,—"ভাই! তোমার সর্ব্বপ্রকার কষ্ট যাহাতে দূর হয়, তুমি আবার যাহাতে সৎপথে ফিরিয়া আসিতে পার—নবীন জীবন লাভ কর, প্রভাতেই আমি সে ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

রাখাল একদৃষ্টে রামকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া রহিল। মনে মনে কহিল,—"রামকৃষ্ণ!—তুমি কে! আমি তোমায় চিনিতে পারি নাই। তুমি দেবতা!"

মহারাজ আরও কহিলেন,—"ভাই! তুমি আমার যে জ্ঞাতির কথা কহিলে, তাঁহারও মনের বাসনা আমি পূর্ণ করিব। তাঁহাকেও বলিও,—তাঁহার আর যদি কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য না থাকে, আমায় হত্যা করার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার আশার-অধিক সম্পত্তি কালই আমি তাঁহাকে প্রদান করিব।"

* * *

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### শঠে শঠে।

"পরস্পর পরস্পরের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইল।"

——সাধনতত্ত্ব।

শ্মশান হইতে দুই জনে দুই পথে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুই প্রকৃতির দুই জনের চিত্ত দুই প্রকার ভাব-প্রবাহে আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

মহারাজ রামকৃষ্ণ ভাবিতে লাগিলেন,—"হায় ভ্রান্ত জীব! তুচ্ছ অর্থের জন্য তোরা অনায়াসে অপরের প্রাণনাশে অগ্রসর হ'স্। মা জগদম্বা তোদের প্রতি কবে করুণার নেত্রে চাহিয়া দেখিবেন;—কবে তোরা অর্থের অসারত্ব উপলব্ধি করিতে শিখিবি! অর্থ-সম্পদ্ কয় দিনের জন্য?"

রাখাল ভাবিতে লাগিল,—"রামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই মানুষ নয়। রামকৃষ্ণ নর-রূপী দেবতা। তিনি যদি দেবতা না হইবেন, তবে মা চামুণ্ডা স্বয়ং তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিবেন কেন? ধন্য তাঁর সাধনা—ধন্য তাঁর যোগবল! যোগ-প্রভাবে তিনি কালী করালীকে আপনার দেহ ও পুরী রক্ষার ভার প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। দুই-দুই বার আমি বিফল-মনোরথ হইলাম। দুই-দুই বার নৃমুণ্ডমালিনী তারা সংহারিণী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলেন! যোগবলে, সাধনার প্রভাবে, রামকৃষ্ণ এমন অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন! মা স্বয়ং আসিয়া, প্রত্যক্ষীভূত হইয়া, রামকৃষ্ণের রক্ষা-কার্য্যে

দণ্ডায়মান হইলেন! এমন তো কখনও দেখি নাই—এমন তো কখনও শুনি নাই! রামকৃষ্ণ কি গুণে জগজ্জননীকে এতদূর বাধ্য করিলেন! মা-জগদম্বা যাহার সহায়, অপরে তাহার কি করিতে পারে? রামকৃষ্ণ আজ আমায় কি দৃষ্টান্ত দেখাইলেন!"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাখাল অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় ভূতনাথ রায় আসিয়া রাখালের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ভূতনাথ রায়—মহারাজ রামকৃষ্ণের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয়। অনেকটা তাহারই প্ররোচনায় রামকৃষ্ণের হত্যা-চেষ্টা-রূপ নৃশংস-কার্য্যে রাখাল এবার অগ্রসর হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণকে হত্যা করিয়া দস্যুদলপতি শঙ্কর ফিরিয়া আসিতেছে,—এই আশায় ভূতনাথ পথপানে চাহিয়া ছিল।

শঙ্কর ফিরিয়া আসিল। কৈ—তাহার হস্ত তো রক্তরঞ্জিত নহে! কৈ—তাহার হস্তে তো রক্তাক্ত ছুরিকাখানি নাই! কৈ—তাহার বদনমণ্ডলে সে ভীষণতার চিহ্নও তো লক্ষিত হইতেছে না! পরন্তু সে যেন এখন নূতন মানুষের ন্যায় নূতন চিন্তায় বিভোর হইয়া আছে। এ কি!—শঙ্করের এ পরিবর্ত্তন কেন ঘটিল?

ভূতনাথ, শঙ্করের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি শঙ্কর! কি করিয়া আসিলে! তোমার হস্তে রক্তরঞ্জিত শাণিত ছুরিকা দেখিব বলিয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। কৈ—সে ছুরিকা কোথায়? কৈ—তোমার শরীরেও তো রক্তের চিহ্নমাত্র নাই! নদীর জলে তুমি কি তবে গাত্র ধৌত করিয়া আসিয়াছ?"

রাখাল উন্মত্ত-স্বরে উত্তর দিল,—"হাঁ—হাঁ! আমি সব ধৌত করিয়া আসিয়াছি। সেই দেবতার চরণ-স্পর্শে আমার সকল

কালিমা দূর হইয়াছে। আমি আর এখন শঙ্কর নই। আজ হইতে জানিও—শঙ্কর মরিয়াছে। তুমিও যদি মঙ্গল চাও, আমার পথ অনুসরণ কর।"

ভূতনাথ কৌতুহলবশে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন? কি হইয়াছে? তবে কি তুই রামকৃষ্ণকে হত্যা করিতে পারিস্ নাই? তবে কি রামকৃষ্ণ এখনও জীবিত আছে?"

রাখাল।—"রামকৃষ্ণ—মহাপুরুষ! রামকৃষ্ণ—দেবতা! তাঁহাকে হত্যা করি, আমার কি সাধ্য? আমার পরামর্শ শোনো,—তুমি এখনও তাঁহার শরণাপন্ন হও,—তাঁহার চরণে ধরিয়া কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা কর।"

ভূতনাথ গর্জ্জিয়া উঠিল। ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—"প্রবঞ্চক! কাপুরুষ! তুই প্রবঞ্চনা করিতে আসিয়াছিস্? কি বলিতেছিস্—রামকৃষ্ণের কাছে আমি ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিব!"

রাখাল।—"আজ হউক, কা'ল হউক, তাঁহার নিকট তোমায় ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেই হইবে। তোমার ষড়যন্ত্র তিনি সকলই জানিতে পারিয়াছেন?"

ভূতনাথ বিচলিত হইয়া কহিল,—"এঁ—এঁ! তুই তবে সকল কথা তাকে বলেছিস্ নাকি? পাষণ্ড! পিশাচ! বিশ্বাস-ঘাতক! এই তোর ধর্ম্ম!"

রাখাল।—"আমি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারি; কিন্তু তোমার মত নই। আমি পিশাচ-প্রকৃতি হ'তে পারি; কিন্তু তোমার মত নই। আমি অধার্ম্মিক হ'তে পারি; কিন্তু তোমার মত নই। আমি দস্যু হ'তে পারি; কিন্তু তোমার মত নই।"

রাখালের এই কঠোর বাক্যের যথাযোগ্য উত্তর না দিয়াও

ভূতনাথ কহিল,—"রামকৃষ্ণের সঙ্গে তোর দেখা হ'য়েছিল কি? তার নিকট তুই এই হত্যা-ষড়যন্ত্রের কথা কিছু বলেছিস্ নাকি? অথবা, পথ থেকেই তুই ফিরে এসেছিস!"

রাখাল।—"শঙ্কর পথ থেকে ফিরে আস্‌বার লোক নয়। আমি তাঁকে সব কথা খুলে ব'লেছি। তুমি যদি এখনও তাঁর শরণাপন্ন হও, তোমার কোনই বিপদের সম্ভাবনা নাই। তুমি যে জন্য তাঁর প্রাণনাশে উদ্যোগী হইয়াছিলে, তোমার সে উদ্দেশ্য তাঁর দ্বারাই সিদ্ধ হ'বে। তিনি মহাপুরুষ! তিনি দেবতা!"

ভূতনাথ মনে মনে কহিল,—"রামকৃষ্ণ এই দস্যুদলপতিকেও বশ করিয়াছে। এই নরপিশাচ অর্থলোভে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইহার নিকট রামকৃষ্ণ সকল কথাই জানিতে পারিয়াছে! এখন কি করি?—উপায় কি?"

ভূতনাথকে নীরব দেখিয়া, রাখাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বল? তুমি মহারাজ রামকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে সম্মত আছ কি?"

ভূতনাথ পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিল,—"পাপমতি পিশাচ! উৎকোচ-দানে দস্যুকে সে বশীভূত করিতে পারে; কিন্তু আমি তোর মত নীচাশয় চঞ্চলচিত্ত নই। আমার মন এক কথায় প্রসন্ন বা এক কথায় বিচলিত হয় না। তুই দস্যু;—তুই অর্থের দাস। তুই অর্থলোভে তার পদলেহন কর। আমার আর তোর মুখ-দর্শন করিতে প্রবৃত্তি নাই। দূর হ'—তুই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ'।"

রাখাল।—"তোমার পাপের ফল তোমাকে শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবে।"

এই বলিয়া, তীব্রদৃষ্টিতে ভূতনাথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, রাখাল চলিয়া গেল। ভূতনাথ রোষে ক্ষোভে কাঁপিতে লাগিল।

রাখাল চলিয়া গেলে, ভূতনাথ মনে মনে সঙ্কল্প করিল,—"এই দস্যু বেটাকে ধরাইয়া দিতে হইবে।" ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল,—"শঙ্কর দস্যুকে ধরাইয়া দিতে পারিলে, কোম্পানী পুরস্কার দিবেন—ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং এই এক সুযোগ উপস্থিত। শঙ্কর ধৃত হইলে, এক দিকে কোম্পানীর নিকট পুরস্কারের আশা আছে; অন্য দিকে উহার কথাও তখন কেহ বিশ্বাস করিবে না। যদিও মহারাজ রামকৃষ্ণের নিকট শঙ্কর আমার ষড়যন্ত্রের বিষয় ব্যক্ত করিয়া থাকে, সে কথাও তখন সহজেই উড়াইয়া দিতে পারিব।"

ভূতনাথ, শঙ্করের অবস্থানাদির পরিচয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিল। নাটোরের নব-প্রতিষ্ঠিত থানার দারোগার সহিত তাহার জানা-শুনা ছিল। সেই রাত্রেই শঙ্কর-দস্যুকে গ্রেপ্তার করাইবার জন্য ভূতনাথ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল।

* * *

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### উপাধি-প্রাপ্তি।

"The world's esteem is but a bribe,
To buy their peace you sell your own,
The slave of a vain-glorious tribe,
Who pate you while they make you known."

—*Cowper.*

পরদিন প্রভাতে মহারাজ রামকৃষ্ণ রাখালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন; কিন্তু রাখাল আসিল না। ভূতনাথকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; ভূতনাথেরও কোনও সন্ধান মিলিল না। মহারাজের মনে হইল,—"বুঝি বা লজ্জায় তাহারা মুখ লুকাইয়াছে! বুঝি বা অনুশোচনার তীব্র-তাপে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়াছে!"

এই মনে করিয়া, তাহাদিগের সন্ধানে, মহারাজ স্থানে স্থানে লোক-প্রেরণে ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেন। মনে মনে কহিলেন, —"রাখালকে ও ভূতনাথকে আমি যথাযোগ্য অর্থ-সম্পৎ প্রদান করিব। অর্থলালসায় আর যেন তাহারা কু-প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া কোনও অসৎ-কার্য্যে অগ্রসর না হয়,—এবার সেই ব্যবস্থাই আমায় করিতে হইবে। রাখাল আমার বাল্য-সহচর; ভূতনাথ আমার জ্ঞাতি-ভাই। উহাদিগকে যদি সৎপথে ফিরাইতে না পারি, উহাদের যদি মতি-পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ না হই, তবে আমার ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহারই বা কি হইল, আর জীবনের মহৎ কার্য্যই বা কি সাধিত হইল?"

মহারাজ রামকৃষ্ণ, মনে মনে এইরূপ বিচার-বিতর্ক

করিতেছেন; এমন সময় সে চিন্তায় এক অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিহারী সংবাদ দিল,—"দিল্লী হইতে বাদসাহের দূত আসিয়াছেন। যথাযোগ্য সম্মান-সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। দেওয়ান মহাশয় শীঘ্রই আপনার নিকট আসিতেছেন।"

"বাদসাহের দূত? দিল্লী হইতে? কেন আসিলেন?"

মহারাজ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অবিলম্বেই দেওয়ান নায়েব প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ, আহ্লাদ প্রকাশ করিতে করিতে, মহারাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান কহিলেন,—"দিল্লীর সম্রাট্ সাহ আলম্, আপনার কার্য্যকিলাপে সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার সদনুষ্ঠান-পরম্পরার পরিচয় পাইয়া, আপনাকে 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। বাদসাহের দূত দিল্লী হইতে আপনার জন্য বাদসাহের স্বাক্ষর-যুক্ত সনন্দ-পত্র লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর এবং বাঙ্গালার নবাবের প্রতিনিধিরাও আসিয়াছেন। প্রকাশ্য দরবারে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিয়া, আপনার গুণকথা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক, সম্রাটের স্বাক্ষরিত সনন্দ-পত্র তাঁহারা আপনাকে অর্পণ করিবেন।"

মহারাজ রামকৃষ্ণ মনে মনে একটু হাসিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"বাদসাহের নিকট হইতে সনন্দ! আবার এক নূতন বন্ধন! ইচ্ছাময়ী তারা!—তোমার মনে যা আছে মা, তাই কর!" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"আগন্তুকগণের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কিরূপ করিলেন?"

দেওয়ান।—"তাঁহাদের আগমনের বিষয় মুর্শিদাবাদের পত্রে পূর্ব্বেই একটু আভাস পাইয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহাদের অভ্যর্থনার পক্ষে কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই।"

দেওয়ান আরও কহিলেন,—"সম্রাট-প্রদত্ত এই সনন্দ-প্রাপ্তি-উপলক্ষে রাজধানীতে মহামহোৎসবের আয়োজন করা আবশ্যক। এক দিন হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সুসজ্জিত করিয়া শোভা-যাত্রায় মহারাজকে নগর-ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। এই উপলক্ষে রাজধানী আলোকমালায় বিভূষিত করাও প্রয়োজন।"

মহারাজ রামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"আর কিছু করার আবশ্যক হইবে না?"

মহারাজের মনের ভাব দেওয়ানজীর উপলব্ধি হইল। দেওয়ানজী কহিলেন,—"আর আর যাহা করিতে হইবে, মহারাজ, সে তো আপনার নিত্য-ব্রত! দেবপূজা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালী-বিদায়, ভক্ষ্য-ভোজ্য-দান,—এ সকল ব্যাপার সাধারণ হিসাবের মধ্যেই গণ্য আছে।"

মহারাজ রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—"দেওয়ানজী! অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবেন; কেবল পূজা ও দান প্রভৃতি কার্য্য সাধারণভাবে চলিবে?"

দেওয়ান।—"মহারাজ!—ক্ষমা করিবেন। এ সংসারে দানাদি কার্য্য চিরদিনই অসাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। অন্যের পক্ষে যাহা অসাধারণ, এ সংসারে তাহাই সাধারণ-মধ্যে—নিত্যানুষ্ঠান-মধ্যে—গণ্য হইয়া আছে। কাজেই আমি নূতন কিছু ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন দেখি নাই।"

মহারাজ।—"দেওয়ানজী! আনন্দের দিন সংসারে অল্পই

আসে। আজ বড় আনন্দের দিন,--দিল্লীর বাদসাহ উপাধি-সম্মান প্রেরণ করিয়াছেন! আজও কি সাধারণভাবে কার্য্য চলিবে? আমার ইচ্ছা হয়—"

দেওয়ানজীর প্রাণটা কেমন চমকিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর ও রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর উভয়ে, অনেক পরামর্শ করিয়া, রাজ্যের ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য ও আয়-বৃদ্ধির জন্য, এই নূতন দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। দেওয়ানজীকে বিশেষ করিয়া তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন,—"সাবধান! দেখিবেন—ব্যয়-বাহুল্যে রাজ্য যেন ছারে-খারে না যায়।"

দেওয়ান মহাশয় তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। সুতরাং মহারাজ কখনও কোনও অতিরিক্ত দানাদির কথা কহিলে, প্রায়ই তাঁহার হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠে। আজিও তাই মহারাজের ইচ্ছার কথা শুনিবার পূর্ব্বেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

মহারাজ কহিলেন,—"আমার ইচ্ছা হয়, এই উপলক্ষে মানুষের একটা প্রধান অভাব দূর করিবার চেষ্টা করি।"

আবার সেই কথা! মানুষের অভাব দূর করিবার কথা! দেওয়ানজী চিন্তান্বিত হইলেন।

মহারাজ কহিলেন,—"আপনি হয় তো মনে মনে হাসিতেছেন! আপনি হয় তো ভাবিতেছেন, সংসারের কোন্ ক্ষুদ্র কীটাণুকীট আমি;—আমি আবার মানুষের অভাব দূর করিতে চাই! সে কথাও সত্য বটে! কিন্তু দেওয়ানজী!—আমি কে?—আমি কি করিতে চাই? মা জগজ্জননী—মা যে জগৎ জুড়িয়া আছেন। আমরা যে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

মাত্র। যে অঙ্গের দ্বারা যে কাজ করানর প্রয়োজন হয়, মা-আমার সেই অঙ্গের দ্বারা সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া লন। আমি নিমিত্ত বৈ তো নই!"

দেওয়ানজী সে কথায় তেমন কাণ দিলেন না। ব্যয়-বাহুল্যে মহারাজের আগ্রহাধিক্য বুঝিয়া, তিনি কহিলেন,—"আপনার যেরূপ আদেশ হয়, তাহাই পালন করিব। তবে আমার প্রার্থনা, রাজকোষের অসচ্ছলতার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিয়া আমায় আদেশ করিবেন।"

যে কথা কহিতেছিলেন, মহারাজ তাহা আর কহিলেন না। দেওয়ানজীকে বলিলেন,—"সম্রাট-প্রদত্ত সনন্দের উপযুক্ত সম্মান-রক্ষার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, অথবা আপনাদের যাহাতে কষ্ট না হয়, সেইরূপ ব্যবস্থাই করিবেন।"

দেওয়ানজীকে এইরূপ আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু মহারাজ মনে মনে অনেকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইলেন। স্থির করিলেন,—'অর্থের অনটনে পড়িয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যাহারা অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, অর্থদানে সৎপথে তাহাদের মন ফিরাইবার জন্য চেষ্টা পাইবেন।' স্থির করিলেন,—যাঁহারা তাঁহার নিকট নানা অপরাধে অপরাধী আছেন, তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া, সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, তাঁহাদিগকে সৎপথে আনিবেন।' স্থির করিলেন,—'এই সূত্রে যদি সমস্ত রাজৈশ্বর্য্যে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।' এই উপলক্ষে ভূতনাথের এবং রাখালের অনুসন্ধানে মহারাজ বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিলেন।

* * *

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### শোভাযাত্রা।

"পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতো দিগন্তান্ তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে॥"

রঘুবংশম্।

আজ শোভাযাত্রা। নগরের প্রধান প্রধান পথগুলি সকলই সুসজ্জিত। দুই পার্শ্বে আম্রশাখাসমূহ দোদুল্যমান রহিয়াছে। মাঝে মাঝে ধ্বজপতাকা উড্ডীন হইতেছে। স্থানে স্থানে কৃত্রিম তোরণদ্বারপার্শ্বে সারি সারি কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ সজ্জিত রহিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে, ছাদে—বৃক্ষশাখায় —চালের উপর, কাতারে কাতারে লোক-সমাগম হইয়াছে। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে শোভাযাত্রা দেখিতে লোক আসিয়াছে।

রাজসৈন্যগণ পদোচিত বেশভূষা পরিধান করিয়া, অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, শ্রেণিবদ্ধ-ভাবে রাজপথে প্রহরা-কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছে। নগরী আজ যেন নূতন জীবন লাভ করিয়াছে। শত শত কুঞ্জর, শত শত অশ্ব, শত শত যোদ্ধপুরুষ, শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পদমর্য্যাদা অনুসারে, যথাক্রমে শোভা-যাত্রায় যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

অপরাহ্নে—তৃতীয় প্রহরাতীতে—ঘন ঘন কামান-ধ্বনিতে শোভাযাত্রার সংবাদ বিঘোষিত করিল।

চারিদিকে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। চারিদিকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। স্তুতিবাদকগণ স্তুতিবাদ গান করিতে লাগিল। দেবগণে ও গুরুজনে প্রণতি-পূর্ব্বক, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, মহারাজ রামকৃষ্ণ শোভাযাত্রায় বহির্গত হইলেন।

প্রথমেই এক দল শত-সংখ্যক লাঠিয়াল বংশযষ্টি স্কন্ধে লইয়া কুর্দ্দন করিতে করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের প্রত্যেকেরই আকৃতি যমদূতের ন্যায়। বিশাল বপু, বিস্তৃত বক্ষ, লৌহবৎ কঠিন হস্তপদ। তাহাদের কটির বসন মালকোচায় আবদ্ধ। দেশের প্রসিদ্ধ লাঠিয়ালগণের মধ্য হইতে এই শতসংখ্যক লাঠিয়াল বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল। লাঠিয়ালগণের অব্যবহিত পশ্চাতে শতসংখ্যক 'বল্লম'-ধারী পালোয়ান প্রহরী। তাহাদেরও বেশভূষা ও আকৃতি-প্রকৃতি লাঠিয়ালদিগেরই অনুরূপ। তাহাদের এক হস্তে ঢাল, অপর হস্তে বর্শা। তৎপশ্চাতে শতসংখ্যক তরবারি-ধারী যোদ্ধপুরুষ। তাহাদের দেহ বর্ম্মাবৃত। তাহাদের মস্তকে শিরস্ত্রাণ। তাহাদের নিষ্কোষিত অসির চাকচিক্যে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল। তাহাদের পশ্চাতে শতসংখ্যক বন্দুক-ধারী পদাতিক সৈন্য। রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে তাহাদের দেহ আবৃত। তাহাদেরও মস্তকে উষ্ণীষ শোভমান। এই পদাতিক সৈন্যের পশ্চাতে শতসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য। তাহাদের দেহ বিবিধ-বিচিত্র পরিচ্ছদে বিভূষিত। তাহাদের কটিদেশে কোষবদ্ধ অসি দোদুল্যমান। তাহারা ধ্বজপতাকা-সমন্বিত দণ্ড ধারণ করিয়া আছে। অশ্বারোহী সৈন্যের অব্যবহিত পরে শতসংখ্যক সুসজ্জিত হস্তী। অগ্র-পশ্চাতের কয়েকটি হস্তী রৌপ্যপরিচ্ছদ-বিমণ্ডিত।

মধ্যের কয়েকটী হস্তী স্বর্ণপরিচ্ছদ-বিভূষিত। সর্ব্ব-মধ্যবর্ত্তী একটী হস্তীর বেশভূষা আবার সর্ব্বাপেক্ষা ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন। সেই হস্তিপৃষ্ঠে মহারাজ রামকৃষ্ণ অরোহণ করিয়া আছেন। সেই হস্তীর যেরূপ বেশভূষার চাকচিক্য, তাহার আরোহী মহারাজও সেইরূপ চাকচিক্যসম্পন্ন, বেশভূষায় বিভূষিত। কুঞ্জরারূঢ় মহারাজের মস্তকোপরি মণিমুক্তাবিমণ্ডিত স্বর্ণছত্র। মহারাজের গলদেশে মহামূল্য মুক্তার মালা। মহারাজের পরিধানে মণিমানিক্য-খচিত বহুমূল্য স্বর্ণপরিচ্ছদ। তাহাতে মহারাজ যেন ঐরাবতারূঢ় দেবরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। মহারাজের অগ্রে ও পশ্চাতে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পদমর্য্যাদা-অনুসারে কুঞ্জরোপরি অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাদসাহের দূত এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ও নবাবের প্রতিনিধিগণ সেই সকল কুঞ্জরে আসন-লাভ করিয়াছিলেন। হস্তি-সমূহের পশ্চাতে যথাক্রমে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য। তৎপশ্চাতে আবার তরবারিধারী পদাতিক, বর্শাধারী প্রহরী এবং যষ্টিধারী লাঠিয়ালগণ সজ্জিত ছিল। সম্মুখে, লাঠিয়ালদিগের অগ্রে অগ্রে এবং পশ্চাতে লাঠিয়ালদিগের অব্যবহিত পরে,—ভেরী, তুরি, দামামা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহ বাজাইতে বাজাইতে, বাদ্যকরগণ, শোভাযাত্রার শোভা-সম্বর্দ্ধন করিয়াছিল। শোভাযাত্রার পশ্চাতে অসংখ্য দর্শকের সমাগম হইয়াছিল।

এক পথ দিয়া বহির্গত হইয়া, সহর প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক, অন্য পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কুঞ্জরারূঢ় মহারাজ যখন 'বঙ্গোজ্জ্বল' নামক প্রধান তোরণ-দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন ; সেই সময় রক্ষিসৈন্যশ্রেণী ভেদ করিয়া, একজন অতি তেজস্বী

সন্ন্যাসী মহারাজের সম্মুখীন হইলেন। এত সৈন্য, এত লোক্-জন,—কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। সন্ন্যাসী, মহারাজের সম্মুখে আসিয়া, গম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—"মহারাজ! ইহাই কি প্রকৃত সুখ!"

মহারাজের হঠাৎ যেন মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র মহারাজ যেন দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন। মনে পড়িল—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের কথা! মনে পড়িল—শৈশবের ধূলাখেলার স্মৃতি! মনে পড়িল,—পাখীর বন্ধন-মোচনে সন্ন্যাসীর ঐকান্তিক অনুরোধ! মনে পড়িল,—সন্ন্যাসীর জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল! মনে পড়িল,—সন্ন্যাসীর মধুর কণ্ঠস্বর! মনে পড়িল,—দশভূজার মন্দিরে সন্ন্যাসীর তীব্র তিরস্কার! মনে পড়িল,—শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, যে মূর্ত্তি হৃদয়-পটে চির-অঙ্কিত ছিল!

কুঞ্জর-পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া নিম্নে অবতরণ-পূর্ব্বক মহারাজ সন্ন্যাসীর চরণ ধারণ করিতে গেলেন। সন্ন্যাসী তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া, মহারাজকে আলিঙ্গন করিলেন। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল। কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল না।

এই সন্ন্যাসীই শ্রীজী।

শোভাযাত্রা শেষ হইল। সন্ন্যাসীর হস্তধারণ-পূর্ব্বক মহারাজ প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

* * *

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### সন্ন্যাসি-সন্দেশ।

"Our birth is but a sleep and a forgetting :
The Soul that rises with us, our life's Star,
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar :
Not in entire forgetfulness
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God who is our home
Heaven lies about us in our infancy !"

—*Wordsworth.*

মহারাজ রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া আপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে নিভৃতে উভয়ের কথোপকথন চলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি কি পূর্ব্ব-স্মৃতি বিস্মৃত হইয়াছেন? আপনার কি মনে পড়ে না—আপনি কি ছিলেন, আর কি হইয়াছেন?"

সন্ন্যাসী কি শৈশবের সেই কথা কহিতেছেন? সন্ন্যাসী কি দশভূজার মন্দিরে চিন্তার কথা কহিতেছেন? সন্ন্যাসী কি সেই স্বপ্নের কথা কহিতেছেন? সন্ন্যাসী কোন্ কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, মহারাজ বুঝিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন,—"আপনার বোধ হয় স্মরণ হইতেছে না। পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে,—

অনেক আবরণে আবরিত রহিয়াছে; তাই বোধ হয় আপনি স্মরণ করিতে পারিতেছেন না!"

পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি! ইহ-জন্মের, দুই দিন পূর্ব্বের, স্মৃতিই মানুষ বিস্মৃত হয়। পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি—কত অনন্ত অতীতের কথা—কি করিয়া স্মরণ থাকিতে পারে? মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ধারণাশক্তি,—সে অতীত স্মৃতি ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই তো সংসারে মানুষ বিভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মহারাজ রামকৃষ্ণ, রাজার হউক, সংসার-কারায় আবদ্ধ মানুষ-মাত্র। সে স্মৃতি কেমন করিয়া মহারাজ রামকৃষ্ণের মানস-পটে উদ্ভাসিত হইবে?

সন্ন্যাসী স্পষ্ট করিয়াই কহিলেন,—"মহারাজ! মনে পড়ে কি—হিমালয়ের পাদমূলে, হরিদ্বারের পুণ্যভূমিতলে, দুই জন যোগীর সহিত আপনি যোগাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। যেখানে অজিনাসনে উপবিষ্ট হইয়া যোগ-সাধনা করিতেছিলেন, সেখানে তুষার-বিগলিত নির্ঝর-ধারা ঝরঝর করিয়া আপনার মস্তকোপরি প্রতিনিয়ত নিপতিত হইতেছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনার শীত বোধ হয় নাই; শীতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপবৎ আপনি আত্মানন্দে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক দিন আপনার শীত বোধ হয়। নির্ঝর-ধারা নিবারণোদ্দেশ্যে আপনি একখানি কদলী-পত্র মস্তকোপরি স্থাপন করেন। এই সুখেচ্ছায় আপনাকে যোগভ্রষ্ট হইতে হয়। ইহার পর, গুরুদেবের আদেশে, দেহান্তে রামকৃষ্ণ-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, আপনি এই অর্দ্ধবঙ্গের আধিপত্য-লাভ করিয়াছেন।"

শ্রীজী যতই বলিতে লাগিলেন, রামকৃষ্ণের পূর্ব্ব-স্মৃতি মনো-মধ্যে একটু একটু জাগিতে লাগিল। মনে পড়িল—কঠোর দুষ্কর তপস্যার কথা! মনে পড়িল,—হিমালয়ের তুষার-পাতে শীতানুভূতির বিষয়! মনে পড়িল—তুষার-পাত-জনিত শীত-নিবারণোদ্দেশে, মস্তকোপরি কদলী-পত্র-ধারণ! মনে পড়িল,—যোগভ্রষ্ট হইয়া নব-কলেবর গ্রহণ! মনে পড়িল—অর্দ্ধবঙ্গের আধিপত্যলাভ সম্বন্ধে গুরুর আদেশ! আরও আব্ছায়ার মত মনে পড়িতে লাগিল,—এই সন্ন্যাসী শ্রীজী যোগ-সাধনায় তাঁহার সহচর ছিলেন। কিন্তু কোনও কথাই স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারিলেন না; তাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কত দিনের কথা!—আপনিই বা তাহা কি করিয়া জানিতে পারিলেন?"

শ্রীজী।—"মহারাজ! মনে পড়ে না কি—আপনার সঙ্গে আমিও যোগ-সাধনায় মগ্ন ছিলাম? মনে পড়ে না কি—আপনি রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ করিবেন জানিতে পারিয়া, আমারও চিত্ত ভোগ-বাসনায় উন্মত্ত হয়! আরও মনে পড়ে না কি—আমি কিরূপে যোগভ্রষ্ট হই! যোগভ্রষ্ট হইয়া রাজপুতানার অন্তর্গত বুন্দী-রাজ্যে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন,—বুন্দীরাজ উমেদ, সংসার-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, শান্তি-কামনায় সংসার-ত্যাগী হইয়াছেন। মহারাজ! আমিই সেই বুন্দীরাজ উমেদ। এখন আমার নাম—শ্রীজী। শ্রীজী নামেই আমি এখন সর্ব্বত্র পরিচিত।"

রামকৃষ্ণ।—"একটু আব্ছায়ার মত যেন মানস-পটে প্রতিভাত হইতেছে; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সন্ন্যাসী।—"কেন? কোন্ বিষয়ে সংশয় হইতেছে?"

রামকৃষ্ণ।—"অনেক সংশয়! সংশয় হইতেছে,—তাই যদি, আমার দেখাদেখি আপনি যদি ভোগ-বাসনার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, যোগভ্রষ্ট হইয়া বুন্দীরাজ্যে যদি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সে কত দিনের কথা? আমার বয়ঃক্রম এখন কত হইল,—আর বুন্দীরাজ উমেদ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন—সেই বা কত কালের কথা? বাল্যকালে পিতামহের নিকট বুন্দী-রাজের সংসার-ত্যাগের কৌতুহলপ্রদ গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—আমার জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে বুন্দীরাজ উমেদ সংসারত্যাগী হন। তিনি বলিয়াছিলেন—আমার জন্মের বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সেই সংসারত্যাগী রাজপুত্র আমাদের গ্রামে একবার বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। আমার পিতামহের নিকট সন্ন্যাসী বুন্দীরাজের যেরূপ আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় শুনিয়াছিলাম, আপনার আকৃতি-প্রকৃতির সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে সত্য; কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতেছি না—এরূপ সাদৃশ্য কি প্রকারে সম্ভবপর? শুধু তাই নয়; আমার শৈশবের ধুলা-খেলার দিনে আপনার আমি যে মূর্ত্তিখানি দেখিয়াছিলাম, আজিও সেই মূর্ত্তিই দেখিতেছি। তাই বলিতেছি, আমি বড় বিষম সংশয়ে পড়িয়াছি।"

সন্ন্যাসী।—"আপনি যাহা কহিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, দুইটী বিষয়ে আপনি চিন্তান্বিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ, আপনার সঙ্গে সঙ্গে যোগভ্রষ্ট হইয়া, আপনার জন্মগ্রণের বহু পূর্ব্বে কেমন করিয়া আমি বিষয়-ভোগে বীতস্পৃহ হইলাম? দ্বিতীয়তঃ, যোগানুষ্ঠান-সময়েও আমার যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, আপনার

জন্মের বাইশ বৎসর পূর্ব্বেও আমার সেই মূর্ত্তি ছিল শুনিয়াছিলেন; তার পর. আপনার শৈশবে আপনি আমায় যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, এখনও আমার সেই মূর্ত্তিই দেখিতেছেন। ইহাই আপনার সংশয়ের বিষয় নহে কি ?"

রামকৃষ্ণ।—"এই দুইটীই আমার সংশয়ের বিষয়। কি করিয়া এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

সন্ন্যাসী।—"আপনি অদৃষ্টে—কর্ম্মফলে—বিশ্বাস করেন। আপনার মনে কেন এরূপ সংশয়ের উদয় হয় ? একটা সামান্য দৃষ্টান্তে এ তত্ত্ব বিশদীকৃত হইতে পারে। কৃষক একই দিনে একই ক্ষেত্রে বীজবপন করে; কিন্তু সকল বীজে একই দিনে একই মুহূর্ত্তে অঙ্কুর উদ্গম হয় কি ? একই বৃক্ষের একই শাখার একই মুকুলগুচ্ছে দুইটী ফল ফলিয়াছে; একটী আজ পাকিল, অপরটী দশ দিন পরে পাকিল;—সচরাচরই এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাই না কি ? এক সঙ্গে যোগভ্রষ্ট হইয়াও আমরা যে অগ্র-পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাও ঐরূপ বুঝিবেন। অদৃষ্ট যাহাকে যে ভাবে লইয়া যাইবে, তাহাকে সেই ভাবেই চলিতে হইবে।"

রামকৃষ্ণ।—"অদৃষ্টই তো কর্ম্মফল।"

শ্রীশ্রী।—"কর্ম্মফলই অদৃষ্ট। অদৃষ্টই কর্ম্মফল। একই বিষয়—সংজ্ঞার পার্থক্য মাত্র। কর্ম্মফল যখন সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষীভূত হয় না, তখন তাহা অ-দৃষ্ট। কর্ম্মফলের—অদৃষ্ট সংজ্ঞার ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে যে বীজ ও অঙ্কুরের কথা কহিয়াছি, সেই দৃষ্টান্তেই এ তত্ত্ব বিশদীকৃত হইতে পারে। বীজ যখন মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করা হইল, বীজ-রূপ কর্ম্ম তখন অ-দৃষ্ট রহিল। মৃত্তিকায় বীজ রহিল কিনা, সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা

প্রত্যক্ষীভূত হইল না; তাহাই অদৃষ্ট। সেই বীজে আবার যখন অঙ্কুরোদ্গম হইল, তখনই তাহাকে কর্ম্ম-ফল বলিয়া বুঝিতে পারা গেল। পূর্ব্ব-জন্ম ও পর-জন্ম সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম, মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজের ন্যায়, অ-দৃষ্ট থাকিয়া, পরজন্মে ফল প্রদান করে। কর্ম্ম আবৃত থাকে বলিয়াই সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদেরও এই জন্মগ্রহণ—সেই কর্ম্মের ফল মাত্র। একটু অনুধাবন করিলেই এ বিষয় বুঝিতে পারা যায়।"

রামকৃষ্ণ।—"অনেক দূর-ব্যবধানে পড়িয়া গিয়াছি, তাই বুঝিতে কষ্ট হইতেছে।"

সন্ন্যাসী।—"দূর? তুলনায় কতটুকু দূর? তিন দিনে যে বীজের অঙ্কুর উদ্গম সম্ভবপর, সে বীজের কতকগুলি যদি সপ্তাহ পরে অঙ্কুরিত হয়, সামান্য বৃক্ষ-তৃণাদির গতাগতির পথে যদি এত অন্তরায় ঘটে, জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের পথে বহু অন্তরায় সম্ভবপর নহে কি? মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাহা যুগ-যুগান্ত, ভগবানের নিকট তাহা নিমেষ মুহূর্ত্ত মাত্র। তাঁহার এক নিমেষ—এক মুহূর্ত্ত অগ্র-পশ্চাতে পড়িলে, কত যুগ-যুগান্তের—কত কল্প-কল্পান্তের—পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হয়!"

রামকৃষ্ণ।—"আমার অল্পবুদ্ধি; তাই ধারণায় আনিতে পারি না।"

সন্ন্যাসী।—"এখন আমার আকৃতি-প্রকৃতির নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আপনার যে সংশয় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দুই এক কথা কহিতেছি। আপনি কর্ম্মফলে নিশ্চয়ই বিশ্বাসবান্। যোগ-রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যদৃচ্ছা কার্য্য সাধিত হয়। যোগ-প্রভাবে যোগিগণ অনন্ত-

কাল অনাহারে জীবন-ধারণ করিতে পারেন। শাস্ত্রে, পুরাণে, সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন,—যোগমগ্ন যোগী, কোথাও বল্মীক-স্তূপে পর্য্যবসিত হইয়া আছেন, কোথাও মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত রহিয়াছেন, কোথাও পশ্বাদির উদর-মধ্যে বসতি করিতেছেন। যোগবলে অসাধ্য কিছুই নাই। আমার এই যে শরীর আজিও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, ইহাও সেই যোগ-প্রভাবে। যেদিন আমি যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলাম, সেই দিন আমার আকৃতির প্রথম পরিবর্ত্তন হয়, সেই দিন বুন্দিরাজ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবন প্রভৃতির পরিবর্ত্তন-প্রবাহে ভাসমান হই। তার পর, বৈরাগ্যোদয়ে, যেদিন রাজ-সংসার পরিত্যাগ করি, সন্ন্যাস-ব্রত-অবলম্বনে আবার যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, দেহের আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না। তাই আপনার শৈশবেও আমার যে স্বরূপ দেখিয়াছিলেন, আজিও সেই রূপ—সেই সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"

রামকৃষ্ণ।—"আপনাকে সংসারেই—"

সন্ন্যাসী বাধা দিয়া কহিলেন,—"আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—আমাকে সংসারেই দেখিতে পান; আমি যোগানুষ্ঠানে কখন প্রবৃত্ত হই! সে কথা আপনাকে কি আর বুঝাইব? আপনি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিলে, আমার শরীরে একটু সামান্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। এ পরিবর্ত্তনটুকু সেই জন্যই সংঘটিত হইয়াছে। বলিতে পারেন,—তবে কেন আসি?—সংসারে কেন দেখা দিতে আসি?"

সন্ন্যাসীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী আবেগভরে কহিলেন,—"রামকৃষ্ণ! তোমায় কি বুঝাইব—কেন আসি! যদি

বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত দিন কোন্ কালে আমার মুক্তি হইত। কিন্তু কি বন্ধুত্ব-বন্ধনের দৃঢ়-ডোরে তুমি আমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছ. তোমায় ছাড়িয়া আমি যোগানুষ্ঠানেও তন্ময়-চিত্ত হইতে পারিতেছি না। রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, যোগানুষ্ঠানে ভঙ্গ দিয়া, আমি যে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, রামকৃষ্ণ, তুমি নিশ্চয় জেন—সেও এক মায়ার বন্ধন। এই বন্ধনের ডোরে বাঁধা পড়িয়াই আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তোমায় যদি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে পারি, তবেই আমার যোগ-সাধনা সফল হয়। আর সেই জন্যই আমি মাঝে মাঝে আসিয়া তোমায় আহ্বান করি। মনে পড়ে কি রামকৃষ্ণ !—তোমায় আমায় প্রথম মিলনের কথা! মনে পড়ে কি ভাই !—কি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া আমরা যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম! যদি মনে পড়ে সে কথা, আর বিলম্ব করিও না, অবিলম্বে সংসারের কার্য্য সমাধা করিয়া লও।"

এই বলিয়া, সন্ন্যাসী সহসা দ্রুতপদ-বিক্ষেপে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। মহারাজ একমনে সন্ন্যাসীর কথা শুনিতে-ছিলেন, আর সেই ভাবনায় বিভোর হইয়া ছিলেন; এমনই সময়, সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর বাক্য আর শুনিতে না পাইয়া, সংজ্ঞালাভে, মহারাজ রামকৃষ্ণ যেমন সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া দেখিতে গেলেন, দেখিলেন—সন্ন্যাসী নাই। ব্যগ্র-ভাবে চারি-দিকে সন্ধান লইলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কোন্ পথ দিয়া সন্ন্যাসী কোথায় চলিয়া গেলেন, দৌবারিকগণও তাহা বলিতে পারিল না।

* * *

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### দিব্যজ্ঞান।

"অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥"
——বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

"আয়ু, উচ্চ-পাদপের কম্পিত-পত্র-বিলম্বিত জলবিন্দুর ন্যায় পতনোন্মুখ; শরীর, হরচূড়ামণি শশিকলার ন্যায় দেখিতেই পাওয়া যায় না; ভোগমাত্রই, মেঘপটলমধ্যস্ফূরিত সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল; জীবের সুহৃৎ-সজ্জন-সমাগম, বাগুরা-বেষ্টন-সদৃশ; ক্রূর কৃতান্ত-মার্জ্জার, সর্ব্বভূতরূপী মূষিককুল-ভক্ষণে ব্যগ্র; পতনের প্রাচুর্য্য প্রতিপদে। এমন অবস্থায়, আমার উপায় কি? গতি কি?—আশ্রয় কি?"

ভগবান রামচন্দ্র, কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবকে এক দিন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কাম-ক্রোধাদি-রিপু-নক্র-সঙ্কুল মহাবর্ত্ত-চঞ্চল সংসার-সমুদ্রের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া, শিক্ষার্থীর ন্যায়, শিষ্যের ন্যায়, মুমুক্ষুর ন্যায়, তিনি এক দিন মহর্ষি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! আমার উপায় কি? আমার গতি কি? রসরূপী রসপ্রদ পারদ—অনলে পতিত হইলেও যেমন দগ্ধ হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানরস-সম্পন্ন সংসারী সংসারানলে পতিত হইলেও কিরূপে দাহ হইতে অব্যাহতি পায়;—হে ব্রাহ্মণ!—সেই উপায় আমায় বলিয়া দেন।"

মহামতি বশিষ্ঠ-দেব, শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন,—"গতি-মুক্তির পথ-প্রার্থী হইলে, প্রথমে মুমুক্ষুর ন্যায় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইতে হইবে; তৎপরে সদ্‌গুরুর নিকট শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রানুগত সদাচারী ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইতে হইবে; সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সৎকর্ম্ম-পরম্পরা—মনুষ্যের গতি-মুক্তির পথ-স্বরূপ। যিনি সংসারে স্পৃহাশূন্য হইয়া চিত্ত-স্থৈর্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভের অধিকারী হন।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে, রামকৃষ্ণের মনে শ্রীরামচন্দ্র-বশিষ্ঠের সেই প্রশ্নোত্তরের কথা উদয় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আমার গতি কি? আমার উপায় কি?" মনে মনে কহিলেন, —"শাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, গুরুমুখে পুনঃপুনঃ শুনিয়াছি, গতি-মুক্তির প্রার্থী হইলে, চিত্তস্থৈর্য্য প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু আমার এই চঞ্চল-চিত্ত একবারও তো স্থির হইতে পারিল না;— বাত্যাবিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় নিয়ত উদ্বেলিত উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে রহিয়া গেল! আমার বিত্ত, আমার পুত্র, আমার পরিজন, আমার সংসার,—এই দুশ্চিন্তা-ঝটিকা প্রচণ্ড প্রবহমান; চিত্ত কিরূপে প্রশান্ত হইবে!"

রামকৃষ্ণ আপনা-আপনিই কহিলেন,—"শাস্ত্র পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, যিনি বিষয়-বাসনা ও মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই প্রশান্ত। কিন্তু আমি বিষয়-বাসনা-মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম কৈ? আমার চিত্ত কিরূপে প্রশান্ত হইবে?"

ভাবিয়া ভাবিয়া মহারাজ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

মনে হইল,—"শাস্ত্র বলিয়াছেন, সংশয়-স্থলে সদ্‌গুরুর উপদেশ সর্ব্বদা গ্রহণীয়।"

সেই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া, মহারাজ রামকৃষ্ণ, ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গমন করিলেন।

ঠাকুর মহাশয়, মহারাজের চিত্তের অবস্থা সম্যক অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রশ্ন শুনিবা মাত্র সকল কথাই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বুঝিলেন—'মহারাজ রামকৃষ্ণের মন এখন যে অবস্থায় উপনীত, তাহাতে সংসারের প্রতি তাঁহার আর আসক্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এ অবস্থায় উপযোগী উপদেশ প্রদান করাই বিধেয়।'

ঠাকুর মহাশয় কহিলেন,—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই সত্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন, শাস্ত্র পথ দেখাইয়া দিয়াছেন,—যিনি বিষয়-বাসনা-মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই প্রশান্ত। শাস্ত্র উদাহরণ দ্বারাও এ তত্ত্ব বিশদীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সমুদ্রে কতই তরঙ্গ উঠে; কিন্তু তাহারা তো সেই জলময় জলধির রাশি রাশি জল ভিন্ন আর কিছুই নহে! তদ্রূপ এই অখিল-সংসার-বাসনা-ভূত কল্পনাময় জগৎ-প্রপঞ্চ কল্পনা-কুশল চিত্তেই উদ্ভূত হয়। ভাবিয়া দেখিতে পারিলে, সংসার-ভাবনা ছাড়িতে পারিলে, কেবলমাত্র সেই অদ্বিতীয়ের সত্ত্বাবোধে অপরাপর অলীক-[illegible] অস্তি-নাস্তি বোধ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিলে, সংসার-[illegible]নয়িতা বাসনাদি চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়, তাহাদের নামও আর থাকে না। সংসারই তরঙ্গ। প্রশান্ত চিত্তে সংসার নাই; প্রশান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ নাই। তাহা কি সুন্দর!"

রামকৃষ্ণ।—"এই যে নানাত্ব-বোধ, তাহাও তো তিনি!"

ঠাকুর মহাশয়।—"তাহা তো বটেই! সকল চিন্তার মূলেই সেই চিন্ময়ের অধিষ্ঠান। এই যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার ইন্দ্রিয়-নিচয় এবং এই যে জীবগণ, ইহারা সেই চিন্ময়কে অতিক্রম করিয়া কোথায় থাকিতে পারে? এই যে নানাত্ব—এই যে নানা-বস্তুময় সংসার—ইহা কি? যেমন নেত্ররোগ জন্মিলে বা দর্পণে দেখিতে যাইলে, এক চন্দ্রকে অনেক আকারে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আমরা ভ্রমে পড়িয়া তাঁহাকেই নানা-বস্তুরূপে সংসারে দেখিতেছি।"

রামকৃষ্ণ।—"কবে তাঁহাকে সেই সর্ব্বময়-ভাবে দেখিতে শিখিব? কবে এই চঞ্চল-চিত্ত প্রশান্ত-ভাব ধারণ করিবে?"

ঠাকুর মহাশয়।—"শাস্ত্র তাহারও পথ দেখাইয়াছেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—জ্ঞান—অগ্নি; চিত্ত—তৃণ। এ তৃণকে সে অগ্নি দ্বারা এমন করিয়া পুড়াইতে হইবে, যেন তাহার মূল না থাকে। আমার বিত্ত, আমার পুত্র, আমার পরিজন,—ইহাই ঈষণা দুরাকাঙ্ক্ষা; এই দুরাকাঙ্ক্ষাই চিত্তের মূল; এই মূল-সহ ইহাকে পুড়াইতে পারিলে, আর কদাচ তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। নতুবা, অনুৎপাটিত পরিচ্ছিন্ন তৃণ যেমন দগ্ধ হইলেও আবার অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ইহারও পুনর্ব্বিকাশ অনিবার্য্য। চিত্তের চিত্ত-রূপ বিকাশই—জগতের বিকাশ। চিত্ত দগ্ধ কর; তখন আর তোমার কাছে জগৎ থাকিবে না। তখন—যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জগৎ।"

রামকৃষ্ণ।—"জ্ঞানাগ্নি দ্বারা চিত্ত-তৃণ কিরূপে দগ্ধ হইতে পারে?"

ঠাকুর মহাশয়।—"যে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছ, সেই মন্ত্র সাধনার

ফলেই—মার নামের প্রভাবেই, সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মার 'তারা' নাম—সংসারবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য। তারা-নাম জপ কর, তারা-রূপ ধ্যান কর; তাঁহার কৃপায় সংসার-পারাবার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মা-জগজ্জননীর কৃপা হইলেই আর বিচার-বিতর্কের আবশ্যক হইবে না। মুক্তির পথে মা আপনিই লইয়া যাইবেন। তারা-মার পাদপদ্ম ধ্যান ভিন্ন, আমাদের আর অন্য যোগানুষ্ঠান কি আছে? জগজ্জননী—জ্ঞানস্বরূপিণী। তাঁহার অনুকম্পা-লাভেই দিব্য-জ্ঞান লাভ হইবে। দিব্যজ্ঞানই মুক্তি।"

মহারাজ রামকৃষ্ণ বুঝিলেন,—মা-জগজ্জননী তারা মা-ই সংসার-পারাবারের তরণী-স্বরূপিণী। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন,—"আজ হইতে সর্ব্বস্ব ভুলিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, তারা-মার চরণেই আশ্রয় গ্রহণ করিব। মাতৃমন্ত্র জপ ভিন্ন অন্য যোগানুষ্ঠান আর কি আছে?"

সেই দিন হইতেই মহারাজ রামকৃষ্ণ ভবানীপুরে গমন করিয়া মায়ের যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন; সেই দিন হইতেই চিরতরে রাজৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, সম্পূর্ণরূপে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে মনস্থ করিয়া, মাতৃমন্ত্র-সাধনায় মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

* * *

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### পূর্ব্বানুষ্ঠান।

"What shall I render thee, Father Supreme,
For Thy rich gifts, and this the best of all."

—*Mrs. Sigourney.*

মহারাজ রামকৃষ্ণ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিবেন। রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট কাল ভবানী-মন্দিরে ভবানীর উপাসনায় অতিবাহিত করিবেন,—মনে মনে মহারাজ এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পের বিষয় আপনিই চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মহারাজ মাঝে মাঝে ভবানীপুরে যাইতেন, দুই এক মাস সেখানে অপেক্ষা করিতেন; তার পর, আবার ফিরিয়া আসিতেন; কিন্তু এবার তাঁহার ভবানীপুর-যাত্রায় এতটা উদ্যোগ-আয়োজন কেন? কি উদ্দেশ্যে, কত দিনের জন্য, মহারাজ ভবানীপুরে যাইতেছেন,—যদিও মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না; কিন্তু তাঁহার কার্য্য-কলাপেই যেন সকল কথা ব্যক্ত করিয়া দিল।

ভবানীপুর যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিন মহারাজ দান-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ সেদিন যেন দ্বিতীয় বলিরাজ বা দ্বিতীয় দাতাকর্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেদিন আর শত্রু-মিত্রের বিচার রহিল না,—যাহারই কোনরূপ অভাবের বিষয় জানিতে পারিলেন, সকলকেই আহ্বান করিয়া

আনিয়া, প্রত্যেকেরই আবশ্যকানুরূপ অর্থ-সম্পৎ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ভূতনাথের ষড়যন্ত্রে শঙ্কর দস্যু ধরা পড়িয়াছিল। তাহাকে ধরাইয়া দিতে গিয়া, শঙ্করের অস্ত্রাঘাতে ভূতনাথ নিহত হইয়াছিল। মহারাজ রামকৃষ্ণ, ভূতনাথের সন্তান-সন্ততির জন্য এবং রাখালের পুত্র-পরিজনের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত যথেষ্ট অর্থ-সম্পত্তি দান করিলেন। শঙ্কর দস্যু ধরা পড়িয়াছে সংবাদ পাইয়া, দস্যুদলপতি পণ্ডিতা, শঙ্করের উদ্ধারের জন্য রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়। রামকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করিয়াও শঙ্কর-রূপী রাখালের উদ্ধার-সাধন করিতে পারেন নাই। বিচারে, শঙ্কর-দস্যুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাস-দণ্ড বিহিত হইলে, পণ্ডিতা স্ত্রী-পুত্র-সহ রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়; পরিশেষে, মহারাজের উপদেশে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, পর-সেবা-ব্রত-গ্রহণে, কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে, জীবন উৎসর্গ করে। মহারাজের ভবানীপুর-গমন-উপলক্ষে, পণ্ডিতার পরিবার-বর্গ মহারাজের বৃত্তিভোগী হয়। পণ্ডিতা, মহারাজের ভৃত্যত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে ভবানীপুরে গমন করে।

আটগ্রামে মহারাজ রামকৃষ্ণের জনক-জননী ছিলেন। অনেক দিন হইল, তাঁহারা লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। পিতা হরিদেব রায়ের সঙ্গে হলধর মৈত্র প্রভৃতির বিরোধ বহুকাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কিন্তু নাটোর-রাজের সহায়তায় সে সকল বিপদ হইতে তিনি উদ্ধার-লাভ করেন। আটগ্রামে এখন মহারাজ রামকৃষ্ণের সহোদরগণ বাস করিতেছিলেন। ভবানীপুর-যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে সাধ্যমত বন্দোবস্ত করিতেও মহারাজ ত্রুটি করিলেন না।

এই উপলক্ষে এবং মহারাজ রামকৃষ্ণের নানারূপ ব্যয়-বাহুল্যে, নাটোর-রাজ্যের আয়-পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছিল। মহারাণী ভবানী যখন রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন, তখন গবরমেণ্টে রাজস্ব দিতে হইত—অন্যূন পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। কিন্তু মহারাজ যখন রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করেন, তখন সে রাজস্বের-হার কমিয়া গিয়া বত্রিশ লক্ষে পরিণত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণের রাজত্ব-কালে, বহু লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়, বহু লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি কর্ম্মচারীরা আত্মসাৎ করিয়া লয়, বহু লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি মহারাজ দান করিয়া যান। মহারাজ রামকৃষ্ণের সেই দানের ফলে, রাজ-সংসারের সামান্য কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত—তহশীলদার, চোপদার, জমাদার প্রভৃতির বংশধরগণও—আজিও নাটোর-রাজের দান-দত্ত ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছে। দেশের বহু দরিদ্র ব্যক্তিও এই উপলক্ষে ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল। এদিকে আবার, নাটোর-রাজ্যের অংশ গ্রহণ করিয়া, বাঙ্গালার নানা স্থানে নানা জমিদার-বংশের অভ্যুদয় হয়। যশোহরে ঐ যে নড়াইলের জমিদার-বংশ দেখিতেছেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের ভূ-সম্পত্তির অংশ-মাত্র প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহারা প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। অধুনা বগুড়া-জেলার অন্তর্গত সেরপুরের যে জমিদারগণের পরিচয় পাওয়া যায়, মহারাজ রামকৃষ্ণের জমিদারীর কণামাত্র লাভ করিয়াই তাঁহারা জমীদার-মধ্যে পরিগণিত। মহারাজের পার্শ্বচর কালীশঙ্কর ও অনুপনারায়ণ হইতেই যথাক্রমে ঐ দুই জমিদার-বংশের উৎপত্তি হয়। তার পর, পুখুরিয়া-পরগণা লাভ করিয়া ময়মনসিংহের চৌধুরী-

জমিদারগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ডিহি আড়পাড়া-পরগণা প্রাপ্ত হইয়া গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই-রূপে, মহারাজ রামকৃষ্ণের বিষয়-বিতৃষ্ণার ফলে, বাঙ্গালায় কতই নূতন নূতন ভূম্যধিকারীর উৎপত্তি হইয়াছিল।

মহারাজ ভবানীপুরে যাইতেছেন শুনিয়া, সুন্দরী মহারাজের সঙ্গে যাইতে চাহিলেন; কিন্তু মহারাজ তাহাতে আপত্তি জানাইলেন। সুন্দরীকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"আমি তো নিকটেই রহিলাম। যখনই প্রয়োজন বোধ করিব, তখনই আসিব। তুমিও যদি ভবানীপুরে যাও, বিশ্বনাথ ও শিবনাথের মুখের পানে কে চাহিবে? কুমারদ্বয় এখনও শৈশব অতিক্রম করে নাই। এ অবস্থায় তাহাদিগকে একাকী রাখিয়া স্থানান্তরে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। রাজপুরীর চারিদিকেই ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইয়া আছে। ষড়যন্ত্রকারীরা নিয়ত 'ওৎ' পাতিয়া রহিয়াছে। কোন্ সময় কি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, কে বলিতে পারে? সুতরাং আরও কিছু দিন তোমায় এখানে থাকিতে হইবে। সময় বুঝিলে, আমি আপনিই তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব।"

পতির আদেশে, পুত্রস্নেহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সুন্দরী আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল,—"পতির অনুজ্ঞা-পালন জন্যও রাজধানীতে তাঁহার থাকা আবশ্যক। আবার শিশু-দুইটীর মঙ্গল-কামনা করিতে গেলেও, তাঁহার ভবানীপুর যাওয়া অবিধেয়।" সুতরাং হৃদয় নিতান্ত উদ্বেলিত হইলেও, সুন্দরী ধৈর্য্য-ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন।

* * *

## নবম পরিচ্ছেদ।

### কে উহাঁরা ?

"Thus to relieve the wretched was his pride,
And even his failings leaned to virtue's side."

—*Goldsmith.*

মহারাজ রামকৃষ্ণ ভবানীপুরে গমন করিবেন; সহধর্ম্মিণী সুন্দরীকে পর্য্যাপ্ত বুঝাইয়া সঙ্গে যাইতে নিরস্ত করিলেন।

কিন্তু কে উহাঁরা ?—উহাঁরা কেন সঙ্গে যাইতে চান ?

মহারাজের ভবানীপুর-যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী রমণী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাজ-বাড়ীর সন্নিকটেই তাঁহাদের বসতি ছিল। রাজবাটীতে যাহাতে তাঁহারা অবাধে গতিবিধি করিতে পারেন, মহারাজ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ ভবানীপুর যাইতেছেন শুনিয়া, সেই রমণী মহারাজের নিকট আসিয়া, ভবানীপুর-যাত্রার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

তিনি কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি যখন যাইতেছেন, আমরা আর কাহার আশ্রয়ে থাকিব ? আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলুন।"

মহারাজ।—"কেন!—আমি তো আপনাদের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের সকল বন্দোবস্তই ঠিক করিয়া দিয়াছি। এখানে বসবাসে আপনাদের যদি কোনরূপ কষ্ট হয়, সংবাদ পাইবা

মাত্র, আমি বিহিত ব্যবস্থা করিব।' তবে কেন সেখানে যাইতে চাহেন ?"

মহারাজের সঙ্গে ভবানীপুর-যাত্রায় মহারাজের আপত্তি আছে বুঝিয়া, রমণী-হৃদয়ে কি-যেন-কি শোক-সাগর উথলিয়া উঠিল। রমণী অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"মহারাজ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কেন সঙ্গে যাইতে চাই? আপনার ঐ স্নেহমাখা মুখ দেখিয়া, আপনার ঐ করুণাপূর্ণ স্বর শুনিয়া, আমরা যে পিতামাতার শোক পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া আছি! কত দিন—কত দিন হইল—পিতামাতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি! এ জীবনে আর যে কখনও তাঁহাদিগের দর্শন-লাভ করিব, স্বপ্নেও তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এখন আপনিই আমাদের পিতামাতা-রূপে সম্মুখে বিদ্যমান আছেন। আপনিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন!"

মহারাজ।—"কেন মা! অত উতলা হইতেছেন কেন? আমি আর কোথায় যাইতেছি? ভবানীপুর আর কত দূর?"

রমণী।—"যত নিকটেই হউক, মন যে নিকট বলিয়া প্রত্যয় মানিতেছে না। জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছেন—আমাদের পিতামাতা জীবিত আছেন, নিকটেই অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু মহারাজ!—কোথায়—কৈ তাঁহারা? এত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও, দাদা তো কৈ তাঁহাদের কোনও অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না! নিকটই বা কি, দূরই বা কি,—কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা এখন বুঝিতেছি,—আপনিই আমাদের পিতামাতা। আপনি এখানেই থাকুন, আর অন্যত্রই যাউন;—আমরা আমার সঙ্গছাড়া হইব না।"

মহারাজ।—"মা! অনেক করিয়া আপনার দাদাকে আমি বুঝাইয়া নিরস্ত করিয়াছি; আপনি কেন প্রবোধ মানিতেছেন না?"

রমণী।—"দাদা বুঝিয়াছেন, তিনি থাকুন; বৌ-ঠাকরুণ থাকিতে চান, তিনিও থাকুন। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাইবই যাইব।"

মহারাজ।—"আপনি কোথায় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া রাখিবেন, না—আপনিই এতদূর উতলা হইলেন?"

রমণী।—"কেবল আমি উতলা হই নাই। দাদা ও বৌ-ঠাকরুণ ভবানীপুর যাইবার জন্য বিশেষরূপ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। দাদা বলেন,—অন্ততঃ দিন-কয়েকের জন্যও তাঁহার ভবানীপুর যাওয়ার ইচ্ছা। আমাদিগকে অনুমতি দেন, আমরা আপনার সঙ্গে যাই।"

মহারাজ।—"এখানে আপনাদিগকে স্থায়ী করিবার জন্য আমি নানারূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি। আপনাদের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। তবে আপনারা কেন এত ব্যাকুল হইতেছেন?"

রমণী।—"আমাদের বিষয়-সম্পত্তিতে কাজ নাই। আপনি আমাদিগকে ভবানীপুরে লইয়া চলুন। দাদা বলেন,—জীবনের শেষ-কয়টা দিন আপনার অনুগ্রহে যদি মায়ের পাদপদ্মে আশ্রয় পাই, তাহাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। প্রার্থনা করি, আপনি অন্যমত করিবেন না। আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলুন।"

মহারাজ রামকৃষ্ণ কত করিয়া বুঝাইয়াও শ্যামাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। প্রথমে শিবনাথকে আশ্রয় দিয়া কত

সন্ধানের পর তিনি তারা ও শ্যামাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বসবাসের জন্য নাটোরের রাজবাটীর পার্শ্বে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। শম্ভুনাথের সঙ্গেও তাঁহাদের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। কেবল কৃষ্ণনাথ ও মহামায়ার কোনই সন্ধান করিতে পারেন নাই। পুনঃপুনঃ সন্ধান লইয়াও অকৃতকার্য্য হওয়ায়, সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জীবিত নাই স্থির করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, রূপনগরের রায়-পরিবারের অবশিষ্ট কয়েকটী প্রাণী মহারাজ রামকৃষ্ণের আশ্রয় পাইয়া যখন এইরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, ধীরে ধীরে অতীতের স্মৃতি-রাশি বিস্মৃতির গর্ত্তে ডুবাইয়া রাখিতেছিলেন, এমন সময় মহারাজ রামকৃষ্ণের ভবানীপুর-গমনোদ্যোগে আবার তাঁহাদের মনে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল।

তাঁহারা কোনক্রমেই মহারাজকে ছাড়িয়া নাটোর রাজধানীতে থাকিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা মহারাজ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

* * *

রূপনগরের রায়েদের বাড়ীর তারা ও শ্যামা কি করিয়া মহারাজ রামকৃষ্ণের আশ্রয় প্রাপ্ত হইল? তাহারা কালাদীঘিতে ঝম্পপ্রদান করিয়া, মুসলমান সৈনিকদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু তাহাতেও তাহাদের বিপদের অবসান হয় না। কালাদীঘি হইতে উঠিয়া তাহারা দস্যু-হস্তে নিপতিত হয়। তাহাদিগকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার ভার প্রাপ্ত হইয়া এক জন দস্যু তাহাদিগের অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ করে, এবং গভীর

নিশীথে বন-মধ্যবর্ত্তী পথে অসহায় অবস্থায় তাহাদিগকে ফেলিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে রাত্রি শেষ হইয়া আসে। তখন তাহারা লক্ষ্যহীন হইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিতে থাকে। এইরূপে চলিতে চলিতে পর দিন এক প্রহরের মধ্যে ভাগীরথীর তীরে উপনীত হয়। সেখান হইতে গঙ্গার পরপারে একটী অট্টালিকা দেখিতে পায়। সেই অট্টালিকা—মহারাণী ভবানীর বড়নগরের প্রাসাদ। সম্মুখে মহারাণী ভবানীর প্রাসাদ দেখিতে পাইয়া, তাহাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। ঘাটে পারাপারের জন্য নৌকা ছিল;—সে নৌকায় পারাপারে কাহারও পয়সা লাগিত না। অনেক স্ত্রী-পুরুষ সেই নৌকায় পার হইয়া মহারাণী ভবানীর অন্নসত্রে গমন করিতেছে দেখিয়া, তারা ও শ্যামা সেই পারের নৌকায় আরোহণ করে। পারে উপনীত হইলে, মহারাণী ভবানীর অন্নসত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। মহারাণী ভবানী তখন কয়েক দিনের জন্য কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন; সুতরাং তারার ও শ্যামার বিপদের কোন কথাই মহারাণীকে জানাইবার সুযোগ হয় নাই। এদিকে সেই সময় মহারাণীর আশ্রয়-প্রাপ্ত কতকগুলি স্ত্রীলোককে শ্রীশ্রী৺কাশীধামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল। সেই সঙ্গে তারা ও শ্যামা কাশীধামে চলিয়া যায়। অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বরের দর্শন লাভ হইবে,—সেও এক উদ্দেশ্য বটে; অধিকন্তু, মহারাণী ভবানীর নিকট সকল বিপদের কথা অপকটে জানাইতে পারিলে, বিপদোদ্ধারের সম্ভাবনা আছে বলিয়াও তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যখন তাহারা কাশী-ধামে উপনীত হয়, তাহার দুই তিন দিন পূর্ব্বেই, মহারাণী

ভবানী, কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া, নানা-তীর্থ-পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। মহারাণীর মাতুল-পুত্র নীলমণি ঠাকুর তখন কাশীধামে মহারাণীর প্রতিনিধি-রূপে সকল কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। তারা ও শ্যামা কাশীধামে উপনীত হইয়া, তাঁহার নিকট আপনাদের দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিয়াছিল। তাহাদের কথা শুনিয়া নীলমণি ঠাকুর রূপনগরের রায়েদের বিষয় সন্ধান লইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় বঙ্গদেশে নানা-রূপ বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং রূপনগর হইতে সন্ধান লইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। অবশেষে নীলমণি ঠাকুর যখন রূপনগরের সংবাদ প্রাপ্ত হন, রূপনগরের তখন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। কাজেই তারা ও শ্যামাকে সেই অবস্থায় কাশীধামে অবস্থিতি করিতে হয়।

কিছুকাল পরে শিবনাথের উত্তেজনায় মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন তারার ও শ্যামার সন্ধান লইবার জন্য মুর্শিদাবাদ-যাত্রায় প্রস্তুত হন, তাহাদের বিষয় লইয়া তখন বড়নগরের প্রাসাদে আন্দোলন উপস্থিত হয়। নীলমণি ঠাকুর তখন কয়েক দিনের জন্য বড়নগরে আসিয়াছিলেন। ঐ আন্দোলন তাঁহার কর্ণে উপস্থিত হইলে, কথায় কথায় চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের নিকট তিনি তারা ও শ্যামার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তখন শ্রীশ্রী৺ কাশীধামে তারার ও শ্যামার অবস্থিতির সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর নাটোরে পত্র লেখেন। সে পত্রে, তাহাদের সন্ধান লওয়া হইতেছে,—এই মাত্র লিখিত ছিল বটে; কিন্তু সেই পত্রানুসারেই মহারাজ রামকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদ-যাত্রা স্থগিত করেন; এবং তাহার অল্প দিন পরেই কাশীধাম হইতে তারা ও শ্যামা

নাটোর-রাজধানীতে আনীত হয়। রাজধানীতে আসিলে, শিবনাথের সহিত তাহাদের মিলন হইয়াছিল। মহারাজ রামকৃষ্ণ নাটোরেই তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শম্ভুনাথের সহিত তাহাদের মিলনও সেই সময় সংঘটিত হইয়াছিল। মহারাজ রামকৃষ্ণের নিকট আশ্রয় পাইয়া, তাঁহার করুণায় মুগ্ধ হইয়া, তারা ও শ্যামা উভয়েই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। শিবনাথও মহারাজকে ছাড়িয়া এক দণ্ড অন্যত্র থাকিতে পারিতেন না।

পর হইলেও, মহারাজ রামকৃষ্ণকে তাঁহারা এতই আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহারাজ তাঁহাদের সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা যে মহারাজের সঙ্গে ভবানীপুরে যাইতে চাহেন, সে কেবল প্রবল স্নেহের ও অনুরাগের আকর্ষণ।

* * *

## দশম পরিচ্ছেদ।

### মিলনে।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং।"
—মহাভারতম্।

ভবানীপুরে ভবানী-মন্দিরে বাসন্তী-পূজার মহামহোৎসব। পূজার সপ্তাহ পূর্ব্বে ভবানীপুরে যাত্রী সমাগম আরম্ভ হয়;—পূজার সময় একটী প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া যায়। রামনবমীর দিন সেই মেলার পূর্ণতা-প্রাপ্তি। সেই জন্য ঐ মেলাকে রামনবমীর মেলা বলিয়া থাকে। ঐ দিন ভবানীপুরে লক্ষ লক্ষ যাত্রী পূজা দিতে আসে। ঐ দিন বহু দোকান-পাট ও হাট-বাজার বসিয়া পুরীর অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করে।

এই মেলার কয় দিন নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতিতে পুরী মুখরিত হইয়া উঠে। কোথাও যাত্রার বৈঠক বসে, কোথাও নাচ হয়, কোথাও সঙের রঙ্-তামাসা চলে। বাসন্তী-পূজার তিন দিনে মায়ের সম্মুখে তিনটী মহিষ বলি হয়। তদ্ভিন্ন, বলিদানে কত ছাগ ও মেষ উৎসর্গীকৃত হয়, তাহার হিসাব করিতে পারা যায় না।

মহারাজ রামকৃষ্ণ হোমের জন্য যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। বাসন্তী-পূজার কয় দিন প্রত্যহ দুই সহস্র পরিমিত বিল্বপত্র সেই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভোগের ব্যবস্থাই বা কত প্রকার! প্রাতে বাল্য-ভোগ, মধ্যাহ্নে

মিঠাই-মিষ্টান্নের ভোগ! রাত্রিতে বিবিধ উপকরণের সহিত অন্ন-ভোগের ব্যবস্থা। যাত্রিগণ যিনিই ইচ্ছা করেন, মায়ের প্রসাদ অনায়াসেই পাইতে পারেন।

এই বাসন্তী-উৎসব উপলক্ষে, রামনবমীর মেলার সময়, মহারাজ রামকৃষ্ণ, রাজধানীর নিকট মনে মনে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়া, ভবানীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অনুচর-পার্শ্বচরগণ অনেকেই তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। আত্মীয়-অন্তরঙ্গগণও দুই চারি জন মেলা-দর্শন-ছলে সঙ্গে আসিতে ত্রুটি করেন নাই। তারা, শ্যামা, শিবনাথ, শম্ভুনাথ প্রভৃতিও মহারাজের সঙ্গে ভবানীধামে আগমন করিয়াছেন।

দলবল-সহ মহারাজ যেদিন ভবানীপুরে উপস্থিত হন, সে দিন ভবানীপুর লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। একে মেলায় লোক-সমাগম; তাহাতে আবার মহারাজ রামকৃষ্ণ ভবানীপুরে আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্যও অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজের নিকট ভিক্ষা-লাভের আশায়ও ভবানীপুরে সে দিন কাঙ্গালী-ভিখারীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন—সপ্তমী-পূজা। করতোয়ায় প্রাতঃস্নান করিয়া, একে একে সকলেই মন্দির-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তারা, শ্যামা প্রভৃতিও মন্দিরে পূজা দর্শন করিতে গেল।

পূজা দেখিতে দেখিতে, মন্দির-প্রদক্ষিণ-কালে, মন্দিরের পূর্ব্ব-পার্শ্বস্থিত বিল্ববৃক্ষের প্রতি সহসা তাঁহাদের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। সেই বিল্ব-বৃক্ষ-মূলে জগন্মাতার দেহাবশেষ প্রোথিত। সুতরাং সেই বিল্ববৃক্ষমূল অতি পবিত্র স্থান মধ্যে পরিগণিত। সেই বিল্ববৃক্ষের তলদেশ মহারাণী ভবানী ইষ্টক দ্বারা বাঁধাইয়া

দিয়াছিলেন। বিল্ববৃক্ষ অনেক দূর পর্য্যন্ত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ছিল। বহু সাধু-সন্ন্যাসী আসিয়া এই বিল্ববৃক্ষ-মূলে সর্ব্বদা বসবাস করিতেন।

সেই বিল্ববৃক্ষ-মূলে দৃষ্টি পড়িবা মাত্র, শ্যামা চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্যামার চীৎকার শুনিয়া, শিবনাথ ও তারাসুন্দরী বিল্ববৃক্ষের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন।

কিন্তু কি দেখিলেন? দেখিলেন—শ্যামাসুন্দরী চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গিয়া যাঁহার চরণতলে নিপতিত হইল, তিনি তাঁহাদের পূজনীয় পিতৃদেব। শিবনাথ ও তারাসুন্দরী শ্যামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু পিতার চরণ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—পিতার পার্শ্বে জননী বসিয়া আছেন। পিতামাতা উভয়েই সন্ন্যাস-ব্রতধারী। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা উভয়েই যোগি-যোগিনী-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

শিবনাথ ও শ্যামাসুন্দরী যখন পিতামাতার চরণতলে নিপতিত হইলেন, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পিতামাতাও কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। পুত্র-কন্যার মুখেও কথা ফুটিল না। এত দিন পরে এই মধুর মিলনে পরস্পরের প্রাণে যে কি আনন্দের সঞ্চার হইল, বাক্যে কি তাহা কখনও ব্যক্ত হয়? পরস্পরের নয়নজলে সে আনন্দের নির্ঝর-ধারা প্রবাহিত হইল।

যথাসময়ে এই সংবাদ মহারাজ রামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল। সংবাদ পাইবা মাত্র, ত্বরিত-পদে মহারাজ সেই বিল্ববৃক্ষ-মূলে আগমন করিলেন। দেখিলেন,—অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন,—পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্র-কন্যা বসিয়া আছেন।

যে দেখিল, সেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগিনী যোগিনী, এত দিন পরে, সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইলেন,—ইহাতে সকলেরই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মহারাজ রামকৃষ্ণ নিকটে আসিয়াই সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন।

ইনিই সেই ব্রহ্মচারী!—এক দিন যিনি মহারাজ রামকৃষ্ণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহারাজ! আপনার রাজ্য হইতে আপনি কি পাপকে দূরীভূত করিতে পারিয়াছেন?"

মহারাজ রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর! আপনি না আমার রাজ্যে পাপ আছে কিনা জানিতে গিয়াছিলেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন,—"হাঁ, আমিই সেই ব্রহ্মচারী। আপনাদের আদেশ-ক্রমেই আমি এই বিল্ববৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়াছি।"

মহারাজ বিস্মিত হইলেন। তিনি তো কৈ সন্ন্যাসীকে ভবানীপুরে আসিয়া বাস করিবার কথা কিছু বলেন নাই!

মহারাজকে বিস্মিত দেখিয়া, সন্ন্যাসী কহিলেন,—"মহারাজ! বিস্মিত হইতেছেন কেন? সে সময় রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর মহাশয় আমাকে কি বলিয়াছিলেন, আপনার স্মরণ হয় কি? তিনি বলিয়াছিলেন,—'ব্রহ্মচারি! নিষ্পাপ স্থান অন্বেষণ করিতেছেন? যে-কোনও বিল্ববৃক্ষ-মূলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন।' মহারাজ! তাঁহারই নিদেশ-ক্রমে আমি এই ভবানী-মন্দিরে আসিয়া বিল্ববৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ইহার ন্যায় পবিত্র স্থান সংসারে কি আর দ্বিতীয় আছে? মহারাজ! স্থান-মাহাত্ম্য সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ করুন। এই দেখুন,—আমি আমার সব ফিরাইয়া পাইয়াছি। এই দেখুন,—পার্শ্বে আমার সহধর্ম্মিণী। এই দেখুন,—

ক্রোড়ে আমাদের পুত্র-কন্যা ও পুত্রবধূ। যাহাদের জন্য সংসার-ত্যাগী হইয়াছিলাম. দেখুন মহারাজ!—স্থান-মাহাত্ম্যে অনায়াসেই তাহাদিগকে লাভ করিলাম।”

ইহার পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের কত কথাই আলোচনা হইল। যতই পরস্পর পরস্পরের বিপদ-পরম্পরার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন, আর যতই সে বিপদে ভগবৎ-নির্ভরতায় ভগবানের করুণার বিষয় মনে হইতে লাগিল, ততই ভগবদ্ভক্তিতে সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের সেই পরীক্ষা-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, পরীক্ষায় অবিচলিত ভাব বুঝিতে পারিয়া, মহারাজ রামকৃষ্ণের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি উথলিয়া উঠিল। মহারাজ রামকৃষ্ণ উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—“মা মঙ্গলময়ি! মাগো! নির্ভরতা শিক্ষা দাও মা! অধম সন্তানের প্রতি মুখ তুলিয়া চাও মা!”

অতঃপর মহারাজ রামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নাটোরে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই আর ফিরিতে চাহিলেন না। সন্ন্যাসী-বেশী কৃষ্ণনাথ কহিলেন,—“মহারাজ! অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অনেক অনুসন্ধানের পর, পাপশূন্য স্থানে উপনীত হইয়াছি। আর কেন এ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলেন? জীবনের শেষ কয়টা দিন এই পুণ্যধামে অতিবাহিত করিতে দেন,—ইহাই প্রার্থনা।”

সেই হইতে রায়-পরিবারের সকলে, মহারাজ রামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে, তান্ত্রিক-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে ভবানী-মন্দিরের সন্নিকটেই তাঁহাদের অবস্থানের ব্যবস্থা হইল। সেই হইতেই ব্রহ্মচারী, মহারাজের সাধনার সঙ্গী হইলেন।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### সাধনা।

"Who never ate with tears his bread,
And through the long-drawn midnight hours
Sat weeping on his lonely bed,
He knows you not, ye heavenly Powers!"

—*Robert Burns.*

"মা!——মা!——মা!"

রামকৃষ্ণ দেখিতেছেন—চারিদিকেই 'মা'। প্রতি পত্র-মর্ম্মরে, প্রতি বাত-হিল্লোলে, প্রতি পতত্রীর স্বরে,—সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে—'মা'! ধরাতলে, নভঃস্থলে, অনিলে, সলিলে, অন্তরে, বাহিরে,—সর্ব্বত্র দেখিতেছেন—'মা'।

দিগন্ত ব্যাপিয়া সুষমা-ছটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রতি তরুশিরে, প্রতি নব-মুঞ্জরিত নবীন পত্রদলে, প্রতি সরোবরের কৃষ্ণকাদম্বিনী-তুল্য সুনীল-স্বচ্ছ সলিলে,—কোথায় মায়ের অনুপম রূপপ্রভা উদ্ভাসিত নহে! ঐ বালার্ক-সমুদ্ভাসিত মেঘখণ্ডের মধ্যে, দিব্যালঙ্কারভূষিতা রক্তাম্বরা মা-আমার প্রত্যক্ষীভূতা; ঐ কেতকী-কুমুদ-কহ্লারের ফেনিল বীচিবল্লরী মধ্যে, স্নেহময়ী জননীর কমল-কান্তি উদ্ভাসিত; ঐ নির্ঝরিণীর নবীন বারিধারা, ঐ নববিকশিত নলিনীর নলিন-দাম, ঐ শারদ-শশধরের স্নিগ্ধ চন্দ্রমা,—জননীর স্নেহ-মমতাদি মাতৃত্ব-গুণের পরিচায়ক নহে কি?

মহারাজ রামকৃষ্ণ মাতৃমন্ত্রে তন্ময় হইয়া মাতৃমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর মনে মনে কহিতেছেন,—"আহা!—মা-আমার কি অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী! আহা!—মা-আমার কি জগন্মনোমোহিনী! আহা—মা-আমার কি সর্ব্ব-কল্যাণ-বিধায়িনী! আহা!—মা-আমার কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী!

"রক্তজবা রক্তকমলে মায়ের রাঙ্গা-চরণ প্রকটিত; শারদ-চন্দ্রিকার কৌমুদী-রশ্মি মায়ের মোহন মুখে মধুর হাসি; সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-দ্যুতি—মায়ের ত্রি-নয়নের রোষ-স্নেহ-মাধুর্য্য-দীপ্তি; উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম-অগ্নি-বায়ু-নৈর্ঋত-ঈশাণ-উর্দ্ধ-অধঃ দশ-দিশি—মায়ের জনন-মরণ-পালন-শত্রুক্ষয়-জয়প্রদ দশবাহু। আর ঐ যে—নীলাম্বরে নক্ষত্রমালার বিভূষণ, মায়ের মণি-মুক্তা-হীরক-খচিত বসনাঞ্চল ভিন্ন উহা আর কি হইতে পারে? বিশ্বস্বরূপিনী ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী মা—ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে কেন্দ্রে অবস্থিত—বিশ্বের অণু-পরমাণু ক্রমে পরিব্যাপ্ত।"

রামকৃষ্ণ কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছেন,—

"ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্বে শত্রুক্ষয়-জয়প্রদে।
আগচ্ছ মদ্‌হৃদে দেবি সর্ব্বকল্যাণ-হেতবে॥"

ডাকিয়া ডাকিয়া, নতজানু হইয়া, যুক্তকরে ভক্তিভরে প্রার্থনা জানাইতেছেন,—

"ওঁ হরপাপং হরক্লেশং হরশোকং হরাশুভাং।
হরদুঃখং হরক্ষোভং হরদেবি হরপ্রিয়ে॥"

বলিতেছেন,—"মা!—একবার দেখাও তোমার সেই মূর্ত্তি। সেই বরাভয়-প্রদায়িনী, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী, দৈত্য-দানবদর্প-হারিণী, শত্রুভয়-ক্ষয়কারিণী, সর্ব্ব-কল্যাণ-বিধায়িনী মূর্ত্তি! সেই

শঙ্খ-চক্র-ত্রিশূলাদি বিবিধায়ুধসুশোভিত মৃণালায়ত-সংস্পর্শ দশবাহু-সমন্বিত মূর্ত্তি—সেই লোচনত্রয়সংযুক্ত পূর্ণেন্দু-সদৃশ প্রসন্নানন—সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ সর্ব্বাভরণ-ভূষিত নবযৌবন-সম্পন্ন রূপ—একবার দেখাও মা! বামে সৌভাগ্যরূপিণী কমল-দল-বিহারিণী লক্ষ্মী, দক্ষিণে বাণী বিদ্যাপ্রদায়িনী শ্বেতবরণী সরোজবাসিনী সরস্বতী, সঙ্গে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতি, ময়ূরারোহণে বলবীর্য্যাবতার দেবসেনাপতি তারকারি কুমার কার্ত্তিকেয়!—মা! তোমার সেই সর্ব্বকামফলপ্রদ চারুমূর্ত্তি একবার দেখাও মা!"

সাধকের হৃদয়ে মায়ের আবির্ভাব—কি অনুপম আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেয়! সাধক যখন রক্তপদ্মের রক্তিমদলে মায়ের চরণ-পদ্ম প্রকটিত দেখেন; সাধক যখন উষার রাগরঞ্জিত বালভানু অবলোকনে জননীর ললাট-সিন্দূর প্রত্যক্ষ করেন; সাধক যখন বীণাবিনিন্দী বিহগকণ্ঠসুধাতরঙ্গে মায়ের মোহন কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করেন; সাধক যখন ঘননীলনীরদমূর্ত্তি দেখিয়া জননীর [illegible]কুণ্ডল কেশদামের তুলনা করেন;—তখন আর তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না। সাধক, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ-সুন্দর রূপ-গুণে বিভূষিত করিয়া, স্ব-করে মাতৃমূর্ত্তি গঠন করিয়া লন। সাধকের হৃদয়ে—ভক্তের প্রাণে, মা বিশ্বরূপিণী বিশ্বরূপেই বিকশিত। রামকৃষ্ণ এখন বিশ্বময় মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

রূপ দেখিতেছেন; বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে; আর স্তোত্রমালা আবৃত্তি করিতেছেন,—

"ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন দাতা ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।

ভবাব্ধিপারে মহাদুঃখভীরুঃ পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
সংসার-পাশ-প্রবদ্ধঃ সদাহং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগম্ ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগম্ গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থম্ ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাহম্ গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশম্ দীনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যৎ সদাহং শরণ্যে গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহম্ গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী॥"

ভবানীপুরে, ভবানী মন্দিরে, মা ভবানীর সম্মুখে বসিয়া, গভীর নিশীথে মহারাজ রামকৃষ্ণ একমনে ডাকিতেছেন,—"মা! আমি ধর্ম্ম জানি না, কর্ম্ম জানি না, দান জানি না, স্তবস্তুতি জানি না, ব্রত জানি না; জানি কেবল—তুমিই আমার গতি-মুক্তি। আমি অনাথ, আমি নির্ধন, আমি জরাগ্রস্ত; আমি কাতর-কণ্ঠে তোমায় ডাকিতেছি, তুমি আমার গতি-মুক্তির উপায় করিয়া দাও!"

ডাকিতে ডাকিতে দেখিলেন,—

'প্রাবৃটের ঘনধারা অপসৃত হইল। ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন বিদ্যুচ্চকিত সন্ত্রাসিত ধরণীর বিষাদখিন্ন বদনে হাস্যচ্ছটা উদ্ভাসিত হইল। শারদচন্দ্রমাবিধৌত প্রকৃতির প্রফুল্ল মূর্ত্তি ধীরে ধীরে প্রকাশিত

হইল। ধরণী নবমনোহর বেশে সুসজ্জিতা হইলেন। শুভ্র শেফালিকার সুকোমল আসন বিস্তৃত হইল। কুমুদ-কহ্লার সরোবর-বক্ষে প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার সঞ্চার করিল। বিন্দু বিন্দু স্বচ্ছ-শিশির-সম্পাতে দিশীথিনী যেন মুক্তার হারে সজ্জিতা হইলেন। তৃণশষ্পসমন্বিত হরিৎ-ক্ষেত্রে ধান্যশীর্ষ-সমূহ বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া, সুবর্ণচামরের ন্যায় ব্যজন করিতে লাগিল।

দিঙ্মণ্ডল আনন্দে পরিমগ্ন। বৃক্ষ-শাখায় বিহঙ্গমগণের আনন্দ-কলরব, প্রান্তরে পূর্ণোদরা গো-বৎসের আনন্দ-ক্রীড়া, ফলপুষ্প-শস্যশীর্ষে পতঙ্গ-প্রজাপতির আনন্দ-নর্ত্তন। শস্যশ্যামলা ধরণীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে কৃষকের আনন্দগীতি। মহারাজ দেখিলেন,—সর্ব্বত্রই আনন্দোৎসব! যেন প্রকৃতিরাণী আনন্দের অবরণে, উল্লাসের আস্তরণে, বিষাদের আঁধার ঢাকিয়া ফেলিয়া, চারিদিকে জ্যোতির ছটা ছড়াইয়া দিতেছেন। নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল তড়াগ, নবীন বল্লরী, নবীন মঞ্জরী, কনককমল কনক-কুসুম থরে থরে সাজান হইতেছে। মানবের প্রফুল্ল স্বর, জীবজন্তুর আনন্দ-কলরব, বিহগের কলকণ্ঠ, ললিত পঞ্চমে বাজিয়া উঠিতেছে।'

সহসা দিব্যজ্যোতিঃ-প্রভাবে মন্দির আলোকিত হইয়া উঠিল। মহারাজ দেখিলেন,—দিব্যালঙ্কার-ভূষিতা বিবিধায়ুধ-পরিশোভিতা বরাভয়প্রদায়িনী আনন্দরূপিণী মা সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মা যেন বলিতে লাগিলেন,—"বৎস রামকৃষ্ণ! তোমার আরাধনায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিতে, তোমার, এখনও একটী অন্তরায় বিদ্যমান। এ

সংসারে আমি মাতৃ-রূপে বিরাজমানা। অল্পবুদ্ধি মানুষ আমায় ধারণা করিতে পারে না; তাই আমি গৃহে গৃহে জননী-রূপে মূর্ত্তিমতী। মার পূজা করিতে করিতেই মানুষ আমার পূজার অধিকারী হয়। যে জন আপন জননীর প্রতি ভক্তিমান্ নহে, সে কখনই আমার অনুগ্রহ লাভ করে না। তুমি সাধক হইয়াও এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই,—ইহাই আমার ক্ষোভের বিষয়। তুমি আমার পরম ভক্ত, তাই আমি তোমাকে সেই উপদেশ দিতে আসিয়াছি। যদি আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে চাও, সর্ব্বাগ্রে আপন জননীর অনুগ্রহ লাভ কর। যাহার প্রতি জননী বিরূপ, সে কি কখনও আমায় পায়? আমিই যে মা-রূপে গৃহে গৃহে অধিষ্ঠিত! তুমি মাকে ভুলিয়া আমাকে ডাকিতে আসিয়াছ? মরুভূমির বারিবিন্দু তুমি!—যদি মহাসাগরে মিশিতে চাও, সম্মুখে খরস্রোতা তটিনী রহিয়াছে; তাহাতে আত্মলীন হও;—সেই তোমায় মহাসমুদ্রে মিশাইয়া দিবে!"

রামকৃষ্ণ কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"মা! আপনি কি বলিতেছেন, আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

মার বীণা-বিনিন্দী কণ্ঠে আবার ঝঙ্কার উঠিল,—"অবোধ সন্তান! আমি আর তোমার জননী ভবানী অভিন্নাত্মা। মা ভবানীকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া, তুমি আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে চাও? মূর্খ তুমি!—তাই তুমি এক অঙ্গে আঘাত করিয়া অন্য অঙ্গের সেবা করিতে প্রযত্নপর! মূর্খ তুমি!—তাই তুমি মূল কর্ত্তন করিয়া, শীর্ষদেশে জলসেচনে অভিলাষী হইয়াছ! যাও—এই রাত্রিতে এখনই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া মহারাণী ভবানীর চরণে শরণাপন্ন হও! তিনি যত দিন তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট

থাকিবেন; যত কঠোর সাধনাই কর না কেন, তোমার সাধনা নিষ্ফল হইবে। যে দিন তোমার জননী তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন; সেই দিন জানিবে—তুমি আমার অনুগ্রহ লাভ করিবে,—সেই দিনই তোমার সিদ্ধি লাভ হইবে।”

রামকৃষ্ণ আর দেখিতে পাইলেন না। দেবী চকিতের ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। রামকৃষ্ণ ডাকিলেন,—“মা—মা! কোথায় মা!” নীরব নীশিথে মন্দিরে প্রতিধ্বনি উঠিল,—“মা—মা! কোথায় মা!” নৈশ-সমীরণে প্রতিধ্বনি উঠিল,—“মা—মা! কোথায় মা!” পত্রমর্ম্মরে প্রতিধ্বনি উঠিল—“মা—মা! কোথায় মা!”

সম্মুখে দেবী ভবানীর যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, মহারাজ রামকৃষ্ণ সে মূর্ত্তি পর্য্যন্ত আর দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল,—সকলই যেন বড়নগরে মহারাণী ভবানীর দেহে মিশিয়া গেল।

রামকৃষ্ণ ডাকিলেন,—“মা—মা—একবার আয় মা!—আমার হৃদয়-শ্মশানে একবার আয় মা! মা—মা!—তোর অভাগা সন্তানকে একবার চরণে স্থান দে মা!”

* * *

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিমে।

"পরিত্যজতি যো দুঃখং সুখঞ্চাপ্যুভয়ং নরঃ
ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি সোঽত্যন্তমসঙ্গেন চ গচ্ছতি॥"

—ব্যাসবাক্যম্।

পর দিন প্রত্যুষে পাকুড়িয়ার ঠাকুর মহাশয়গণের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। ভবানীপুরের অধিবাসীরাও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

সে প্রভাতে ভবানী-মন্দিরে কেহই আর মহারাজকে দেখিতে পাইল না। দুয়ারে দুয়ারে প্রহরীর বন্দোবস্ত; চারিদিকে সাঙ্গোপাঙ্গগণ উপস্থিত;—এ অবস্থায়, মহারাজ রামকৃষ্ণ সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইলেন?

উত্তর-সাধক ভোলানাথ নিকটে ছিলেন। কৌতূহলাক্রান্ত জন-সাধারণ ভোলানাথের নিকট মহারাজের সন্ধান লইতে গেলেন; কিন্তু ভোলানাথ কোনই সন্ধান দিতে পারিলেন না। ভোলানাথ কেবল-মাত্র কহিলেন,—"মহারাজ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপাসনায় মগ্ন ছিলেন; আমিও উপাসনা করিতেছিলাম। প্রভাতে ধ্যান-ভঙ্গ হইলে, দেখিলাম—মহারাজ নাই!"

ব্রহ্মচারী সর্ব্বদাই মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তিনি বলিলেন,—"রাত্রিতে মন্দিরের মধ্যে যেন একটা প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল। সেই ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে

আমার মনে হইল,—মা ভবানী যেন মহারাজকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশে উত্থিত হইলেন। আমি শশব্যস্তে আকাশের পানে চাহিয়া, মহারাজকে ফিরিয়া আসিবার জন্য কতই মিনতি করিলাম। কিন্তু মহারাজ তাহা শুনিলেন না। মায়ের কোলে বসিয়া হাসিহাসি মুখে মহারাজ বলিয়া গেলেন,—'আর ফিরিব না। মার কাছে চলিলাম; আর ফিরিব না।' তার পরই মন্দিরে আসিয়া দেখিলাম—মহারাজ মন্দিরে নাই।"

কত জনেই কত কথা রাষ্ট করিল। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল; যতই কাণাঘুষা হইতে লাগিল;—ততই নানা রসনায় নানা কথা রাষ্ট হইয়া পড়িল। কেহ বলিল,—'তাল-বেতালে মহারাজকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।' কেহ বলিল,—'মহারাজ সশরীরে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।' কেহ বলিল,—'মা ভবানী মন্দির হইতে মহারাজকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন।' কেহ বা শোকে হাহাকার করিতে লাগিল।

এদিকে প্রভাতে পাকুড়িয়ার সেতুর নিকট ঠাকুর মহাশয়গণ একি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন? তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—মহারাজ মূর্চ্ছিতাবস্থায় ধূলিশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। গুরু-বংশীয়গণ, আত্মীয়-স্বজন, সংবাদ পাইয়া, সকলেই মহারাজের নিকট আগমন করিলেন। কি অবস্থায়, কি প্রকারে, মহারাজ পাকুড়িয়ার সেতুর নিকট আনীত হইলেন, তাহা জানিবার জন্য সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর মহাশয়গণের যত্নে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে, মহারাজ তাঁহাদিগকে কহিলেন,—"আপনারা অবিলম্বে আমাকে আমার জননীর নিকট পৌঁছাইয়া দেন।"

পাকুড়িয়ার সেতু।

ভবানীপুর হইতে রাত্রি মধ্যে এই সেতুর উপর

গুরুবংশীয় ঠাকুরমহাশয়গণ সকলে মিলিয়া, মহারাজ রামকৃষ্ণকে লইয়া বড়নগরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেই রাত্রিতে —অল্পক্ষণের মধ্যে—ভবানীপুর হইতে পাকুড়িয়া পর্য্যন্ত এতাধিক পথ মহারাজ রামকৃষ্ণ কি করিয়া অতিক্রম করিলেন,—কেহই তাহার কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাজও সে কথা কিছু প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। রাষ্ট্র হইল—"মা ভবানী মহারাজকে উত্তোলন-পূর্ব্বক, ভবানীপুর হইতে দক্ষিণ দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন; আর তাহাতেই মহারাজ পাকুড়িয়ার সেতুর নিকট আসিয়া উপনীত হইয়াছেন।"

* * *

বড়নগরে মহারাণী ভবানীর নিকট আগমন করিয়া, মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রথমেই জননীর চরণ-তলে নিপতিত হইলেন। অশ্রুপ্রবাহে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মা! অকৃতী অধম সন্তান আমি। আমায় চরণে স্থান দেন। আমি, অজ্ঞতা-নিবন্ধন, আপনাকে না চিনিয়া, আপনার আদেশ অবহেলা করিয়া, মহামায়ার শরণ লইতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনিই যে সেই মহামায়া, মা-রূপে আপনিই যে মূর্ত্তিমতী মহামায়া,—এত দিন তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। মা ভবানী আজ আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি—মা-রূপে ঘরে ঘরে মহামায়া বিরাজমানা। যাহার মা আছে, সে তো আপন মায়ের পূজা করিয়াই মহামায়ার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে। মৃগ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়; অজ্ঞতায় বুঝিতে পারে না— কস্তুরিকা তাহার নাভিতলগত। মানুষও সেইরূপ দিশাহারা হইয়া

বেড়ায়; বুঝে না--সুখ-শান্তি তাহার আত্মকরতলগত! এত দিনে আমি এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছি। মা!—এখন আপনি আমায় চরণে আশ্রয় দিলেই, আমার জীবন সার্থক হয়।"

মহারাণী ভবানী মনে করিয়াছিলেন,—রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার অবাধ্য হইয়াছে, রাজকার্য্যে অবহেলা করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন আর তিনি তাহার মুখদর্শন করিবেন না। কিন্তু মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চরণতলে নিপতিত হইলেন, তখন অভিমানের বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল,—স্নেহ-পারাবার আপনিই উথলিয়া উঠিল। মহারাণী ভবানী রামকৃষ্ণের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—"বাবা! আমার সকল অভিমান দূর হইয়াছে। তোমার ন্যায় সাধক পুত্ররত্ন লাভ করিয়া, এখন বুঝিতেছি—আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তুমি নাটোর-রাজবংশের গৌরব-স্থানীয়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার নাম স্মরণ করিয়া ভারতের নরনারী ধন্য হউক।"

ত্রিরাত্রি গঙ্গাবাসের পর, গঙ্গাজলে মাতার পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া, মহারাজ রামকৃষ্ণ দিব্যধামে গমন করিলেন।

লোকান্তরের অব্যবহিত পূর্ব্বে, আত্মীয়-স্বজন ও পার্ষদগণ পরিবৃত হইয়া, মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন গঙ্গার জলে অন্তিম-শয্যায় শায়িত হইলেন, সেই সময়ে মহামায়ার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে গাইলেন,—

"মন যদি মোর ভুলে।
(তবে) বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপুসঙ্গে চলে,
আনরে ভোলা, জপের মালা, ভাসি গঙ্গাজলে।

ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে,
( আমার ) ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট' কি আছে কপালে ॥"

গান গাইতে গাইতে মহারাজ রামকৃষ্ণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল,—এক নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িল,—'ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট' হইয়াছে। তাই আশঙ্কা হইল,—"না জানি অদৃষ্টে কি আছে।" মনে পড়িল,—'মাতা ভবানীর নিকট তিনি যে ইষ্ট-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন!' মনে পড়িল,—"দত্তক পুত্র বলিয়া মাতা ভবানীর প্রতি পাছে তিনি ভক্তিমান্ না হন, মহারাণীর গুরুদেব রঘুনাথ তর্কবাগীশ তাই মাতার নিকট হইতেই তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র লওয়াইয়াছিলেন।"

যতই মনে পড়িতে লাগিল, ততই বুঝিতে পারিলেন,—"মা-ভবানী মূর্ত্তিমতী জগত্তারিণী!" যতই মনে পড়িতে লাগিল, মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া যতই তাঁহার মুখপানে চাহিতে লাগিলেন, ততই দেখিতে পাইলেন,—'সাক্ষাৎ মহামায়া মা-রূপে সম্মুখে দণ্ডায়মানা। মায়ের কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সিংহবাহিনী দনুজদলনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী ত্রিভুবন-আলোককারিণী—মরি মরি!—মায়ের কি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! দশদিক-প্রসারিত দশায়ুধ-পরিবৃত দশবাহুসমন্বিত যুগপৎ-করুণা-ক্রোধ-পরিস্ফুরিত রোষভয়-বিজড়িত- হাস্য-কটাক্ষ-উদ্ভাসিত,—মরি মরি!—কি মধুরে-কঠোরে বিচিত্র সমাবেশ! এক দিকে, কিবা ভয়ঙ্করী বিশ্বত্রাসকারী দিগন্তগ্রাসকারী সংহারিণী মূর্ত্তি! অন্য দিকে, কিবা শান্তিস্বরূপিণী ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী বরাভয়-প্রদায়িনী সুহাসিনী মূর্ত্তি!'

একবার দেখিলেন,—দশভুজা দুর্গা-মূর্ত্তি ! আবার দেখিলেন,—কালভয়বারিণী করালী কালী-মূর্ত্তি ! সে মূর্ত্তিতেও কঠোরে-কোমলে মাতৃভাবের কি এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি ! দেখিলেন,—'মা যেন পাষণ্ড-দলনে খর্পরকরধৃতা ।' দেখিলেন,—'মা যেন সুজন-পালনে অভয়-হস্তযুতা !' মনে হইল,—'দেশ আমার ন্যায় পাষণ্ড-জনপূর্ণ ; তাই মার আমার বিভীষিকা-বাহুল্য ।' মনে হইল,—'দেশে সুধীসজ্জন-সংক্ষেপ ; তাই মার আমার এক হস্ত মাত্র অভয়প্রদ ।' মূর্ত্তিই মায়ের ভাবদ্যোতক ।

আবার গাইলেন,—

"জয় কালী জয় কালী ব'লে যদি আমার প্রাণ যায় ।
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত কাজ কি বারাণসী তায় ॥
অনন্তরূপিণী কালী কালীর অন্ত কেবা পায় ।
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায় ॥"

গাইতে গাইতে নেত্র পলকহীন হইল । সহস্রার জ্যোতিঃ সহস্রারে মিশিয়া গেল । মহামায়ার দয়ায় সজ্ঞানে সাধক গঙ্গালাভ করিলেন ।

* * *

রাজা রামকৃষ্ণ।

মহারাজ রামকৃষ্ণের স্বাক্ষর।

Printed by K. V. Seyne & Bros.
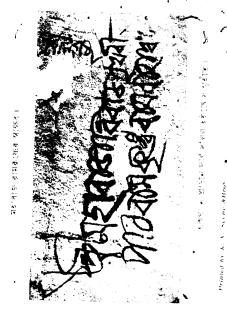
রুদ্রানন্দ (রুদ্রনারায়ণ) ঠাকুরের স্বাক্ষর।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### উপসংহার।

১২০২ সালে (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ রামকৃষ্ণ ইহলীলা সম্বরণ করেন।

পুত্রের মৃত্যুর পর, নয়ন জল মুছিতে মুছিতে, মহারাণী ভবানীকে আবার সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। পৌত্র বিশ্বনাথ ও রঘুনাথ তখনও নাবালক ছিলেন। সুতরাং কুমার-দ্বয়ের অপ্রাপ্ত-ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত মহারাণী ভবানীকে পুনরায় বিষয়-কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিতে হয়। যদিও ঠাকুর মহাশয়-গণের তত্ত্বাবধানেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত; কিন্তু কুমার-দ্বয়ের মুখ চাহিয়া, মহারাণী ভবানীও এক এক বার রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—মহারাজ রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর নাটোর-রাজ্যের আয় অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। মহারাণী ভবানী পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াও লুপ্ত-সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই; পরন্তু কয়েকটি নূতন সম্পত্তিও সেসময় হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। মহারাজ রামকৃষ্ণের শেষ জীবনে রাজস্বের অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়াছিল যে, নির্দ্দিষ্ট-সময়ের মধ্যে কোম্পানীর রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায়, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে, কয়েক দিনের জন্য তাঁহাকে গবরমেণ্টের তত্ত্বাবধানে নজর-বন্দী থাকিতে হইয়াছিল। সেই ঘটনার দুই

বৎসর পরে মহারাণী ভবানী রাজ্যভার পুনগ্রহণ করেন; সুতরাং তখন রাজ্যের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

বিশ্বনাথ ও শিবনাথ—মহারাজ রামকৃষ্ণের এই দুই পুত্র হইতে নাটোরের 'ছোট-তরফ' ও 'বড়-তরফ' দুই অংশের অভ্যুদয় হয়। বিশ্বনাথ জমিদারীর আধিপত্য লাভ করেন; শিবনাথ দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। বিশ্বনাথের তিন বিবাহ। কিন্তু কোন স্ত্রীর গর্ব্ভেই সন্তান-সন্ততি হয় নাই। বিশ্বনাথ, গুরুত্যাগ করিয়া, শক্তি-মন্ত্র উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই হইতে নাটোরের বড়-তরফ বৈষ্ণব-মন্ত্রের উপাসক। শিবনাথ নয়টী বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহারও পুত্র-সন্তান হয় নাই; কেবল একটী মাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল। শিবনাথ পরম শাক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং কনিষ্ঠ শক্তির উপাসক;—সুতরাং জ্যেষ্ঠে ও কনিষ্ঠে সময়ে সময়ে পূজা-উপাসনা-সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ শান্তিপুরের গোস্বামীগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বদা নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ও মৃদঙ্গ-বাদনে ব্রতী থাকিতেন। কনিষ্ঠ শিবনাথ প্রত্যহ শত ঢক্কা-নিনাদে সহর কম্পিত করিয়া মহামহোৎসবে জয়কালীর মন্দিরে পূজা-বলি প্রদান করিতেন।

বিশ্বনাথের বংশের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ এখন বড়-তরফের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শিবনাথের বংশের কুমার বীরেন্দ্রনাথ এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক।

* * *

# প্রথম পরিশিষ্ট।

## একখানি দলিল।

কুমার রামকৃষ্ণকে পোষ্যপুত্র-গ্রহণ-উপলক্ষে মহারাণী ভবানী, হরিদেব রায়কে কয়েকখানি তালুক দান করিয়াছিলেন। সেই তালুক-দান-সংক্রান্ত আসল দলিল-খানি এখন আর পাওয়া যায় না। তবে রাজসাহীর কালেক্টারীতে সেই দলিলখানি একবার দাখিল হইয়াছিল এবং সেই প্রাচীন দলিলের একখানি নকল আজিও কালেক্টারীতে বিদ্যমান আছে। সেই নকল-খানিতে যদিও পোষ্যপুত্র-গ্রহণ-সংক্রান্ত কোনও কথা লিখিত নাই, কিন্তু কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে এবং সাধারণেও সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন,—উহাই সেই পোষ্যপুত্র-গ্রহণ-সংক্রান্ত দলিলের নকল। যাহা হউক, দলিলের সেই নকল-খানির একটী অবিকল নকল আমরা পর-পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিতেছি। তদ্দৃষ্টে সেই সময়ের ভাষার ভাবের এবং বর্ণ-বিন্যাসাদির আভাস পাওয়া যাইবে; এবং মূল বিষয়-সম্বন্ধেও অনেকটা অভিজ্ঞতা-লাভ হইবে।

দলিল-খানি এই ঃ—

শ্রীশ্রীরাম।
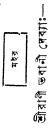
স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীহরিদেব রায় সচ্চরিত্রেষু

তালুক পত্র মিদং সন ১১৬৮ এগারো সত্ত আটসট্ট সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে মৌজে আটগ্রাম ও কালিকাপুর ও ক্ষিদ্র-কালিকাপুর পরগণে আমরৌল ও মৌজে দক্ষিণ পুর পরগণে মুজানগর সরকার বার্ব্বকাবাদ মৌজা হায় মজকুর সেওায় দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর ও নাখিরাজ ও পিরপাল স্বজন স্থলে সজন পদে সবৃক্ষাকাননে চতুঃসিমা বিচ্ছন্নে তোমার স্থানে মবলগে সিক্কা ৩৪২ তিন সত্ত ব্যাল্লীষ রূপৈয়া দস্ত বদস্ত লইয়া নূর্ভাধে তোমাকে তালুক করিয়া দিলাম জমা মালগুজারি মোফিক তপসিম সরহ মজকুরি মাহে জলকর ৩৫৪৷৶১৯ তিন সত্ত চৌয়ান্ন রূপৈয়া তেরো আনা উনিশ গণ্ডা তপসিল জয়েন।

| | মৌজে আটগ্রাম কালিকাপুর ক্ষিদ্র কালিকাপুর পঃ আমরোল | মৌজে দক্ষিণপুর পঃ যুজানগর। |
|---|---|---|
| তকসীম<br>১১০৸৵১৭ | ৯৬।১৭ | ১৪॥৵০ |
| ফিরাণী ভাল্লুকগাছি<br>।১৬॥ | | ।১৬॥ |
| ১১১ ৶১৩॥ | ৯৬।১৭॥ | ১৪৸৵১৬॥ |
| ইদোফা ১০॥ কাত<br>৩॥৵৭৸ | ৩৵১১৸ | ।৶১৬ |
| ১১৪৸৵ ১। | ৯৯।৶৮৸ | ১৫।৵১২॥ |
| সরফ<br>৵০ কাত ১৪।/১৫॥ | ১২।৵১৮॥ | ১৸৵১৭ |
| ১২৯ ৶১৬৸ | ১১১৸৵৭। | ১৭।/ ৯॥ |
| খরচা<br>১০ মাহা ৩২।১৯॥ | ২০৸৶১২ | ৪।/ ৭॥ |
| ১৬১॥১৬। | ১৩[illegible]/১৯। | ২১॥৵১৭ |
| আছয়ার<br>৬৮৸/৪॥ | ৫৯।৵৫ | ৯।৵১৯॥ |
| পরগণাতি যুদ্ধ খরচ<br>ওগয়রহ ১৭/৫। | ২৩।/ | ৩।/ ৫। |
| ২৫৭৶৬ | ২২২॥/ ৪। | ৩৪৸৵১৸ |
| চৌথ<br>৵১৫ কাত ১৯৸/৮ | ১৭ ৵১৭ | ২॥৵১১ |
| নাগাই ফীরাণী<br>৪ মাহা ৫৩৸/১২। | ৪৬॥৵ | ৭৶১২। |
| ৩৩১ ৵ ৬। | ২৮৬৵১। | ৪৪৸ |
| গুজারি মারা<br>জলকর জমা<br>২৩॥৶১২৸ | ২৩॥৶১২৸ | |
| ৩৫৪৸/১৯ | ৩১০ /১৪ | |
| মবলগে তিন সত্ত চৌয়ান্ন রূপৈয়া তেরো আনা উনিস গণ্ডা ইতি। | তিন সত্ত দষ রূপৈয়া এক আনা চৌদ্দ গণ্ডা— | চৌয়াল্লিষ রূপৈয়া সওা বার আনা। |

মবলগে তিন সত্ত চৌয়ান্ন রূপৈয়া তেঁরো আনা উনিস গণ্ডা সহি সিক্কা এই মত সনবসন মাহাব মাহা মালগুজারি করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করহ দান বিক্রীর স্বত্তাধিকার তোমায় ইহার পর আর কোন অঙ্ক কখনও লাগিবেক না এতদর্থে তালুক পত্র দিলাও ইতি সন সদর তাং ২১ জ্যৈষ্ঠ।

মন্তব্য।
আসল পাট্টা এক্ষণ নাই। সং ১৮৩০ সালের ১৩ই জানুয়ারী রাজশাহী
১২৩৬ সালের ১৩৫ নং আসলী পাট্টা আদালতে দাখিল করিয়া যে
জাবেদা নকল লওয়া হইয়াছে, উক্ত নকলও বার বার আদালতে
দাখিল করা জন্য অতি জরাজীর্ণ হইয়াছে। অতি কষ্টে
তাহা হইতে এই নকল করা হইল। নকলের
ষ্ট্যাম্প মূল্য ৪৷৷০ টাকা।
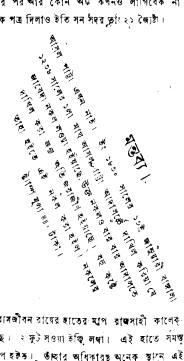
[ রাজা রামজীবন রায়ের হাতের মাপ রাজসাহী কালেক্টারীতে আছে। ২ ফুট সওয়া ইঞ্চি লম্বা। এই হাতে সমস্ত পরগণায় মাপ হইত। তাঁহার অধিকারস্থ অনেক স্থানে এই হাতের মাপেই ব্রাহ্মোত্তর জমি দৃষ্ট হয়। ]

পূর্ব্বোদ্ধৃত দলিলে যে সালাব্দ লিখিত আছে, তাহাতে ১১৬৮ সালে অর্থাৎ ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ঐ দলিল লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অপিচ, উহাতে কিছু মালগুজারির কথাও লিখিত আছে। আমরা লিখিয়াছি (এই গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)—"পলাশী যুদ্ধের পরই মহারাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র-গ্রহণের উৎসব-সমারোহে নাটোর-রাজধানী মুখরিত হইয়াছিল।" সে হিসাবে, আরও বৎসর-তিনেক পূর্ব্বে ঐ তালুক-দান-সংক্রান্ত দলিল লিখিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দলিলে ১১৬৮ সালাব্দ লিখিত থাকায়. দুইটী কথা মনে আসিতে পারে। প্রথমতঃ, ১১৬৮ সালে বা তাহার সম-সময়ে পোষ্যপুত্র গ্রহণ সম্ভবপর; পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে পোষ্যপুত্র-গ্রহণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, হয় তো পূর্ব্বে—পোষ্যপুত্র-গ্রহণ-সময়ে—তালুক-দান-সংক্রান্ত কথা-বার্ত্তা স্থির হইয়া ছিল; কিন্তু লেখাপড়া পরে সম্পন্ন হয়। অনেকে শেষোক্ত সিদ্ধান্তেই আস্থাবান্। সকল দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া পোষ্যপুত্র-গ্রহণের সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, ঐ সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয়।

* * *

# দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

## কয়েকটী ঐতিহাসিক তথ্য।

১। এই গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"ফলে, মণি বেগমের তহবিল হইতে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড (এখনকার হিসাবে প্রায় একুশ লক্ষ টাকা) বাহির হইয়া গেল। কাউন্সিলের সদস্যগণ পরস্পর সেই টাকা বণ্টন করিয়া লইলেন।"

প্রমাণ।—Letter to the Court from Calcutta Council, September, 1765.

২। এই গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মীরজাফর মুসলমান হইয়াও মা কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন।

প্রমাণ।—'বাঙ্গালার ইতিহাস' (নবাবী আমল) গ্রন্থ ৪৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যথাঃ—"মীরজাফর নিদানের মহোষধি কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিয়াছিলেন।"

৩। এই গ্রন্থের ২০২ পৃষ্ঠায় আছে,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া, নবাবের দুই কোটী ছাপান্ন লক্ষ টাকা রাজস্বের এবং তিন কোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি গ্রহণ করেন; এবং নবাব নাজম-উদ্দৌলা তাহাতে ক্লাইবকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন,—"এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। যত ইচ্ছা নর্ত্তকী লইয়া এখন অনায়াসে নৃত্য-গীত করিতে পারিব।"

প্রমাণ।—He (Najmuddowla) accepted Clive's proposal with 'joy' and exclaimed—"I thank you, I shall now have as many dancing girls as I like." *Vide*. The Musnud of Murshidabad (1704-1904) by Purna Chandra Majumder.

সম্পূর্ণ।